বঙ্কিমচন্দ্রের—

কৃষ্ণকান্তের উইল

(ভূমিকা ও টীকা সম্বলিত)

অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী

সম্পাদিত

ডঃ ভবানীগোপাল সান্যাল,

কর্তৃক ভূমিকা লিখিত ও সংবর্ধিত

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

ভূমিকা

সামাজিক উপন্যাস

কৃষ্ণকান্তের উইল পরিবার-কেন্দ্রিক কাহিনী লইয়া রচিত হইলেও ইহার প্রতিক্রিয়া সমাজ-জীবনে যে চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে ইহাকে সামাজিক উপন্যাস বলা সঙ্গত। যাহা খাঁটি পারিবারিক উপন্যাস তাহার কাহিনী-আশ্রিত ফলাফল পরিবারের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, বাহিরের জগতে সংঘাতের তরঙ্গ প্রসারিত হইয়া জটিল আবর্ত রচনা করে না।) ইহার প্রসারের সীমাবদ্ধতাহেতু কাহিনীর ধারা বহু শাখায়িত বিস্তার লাভ করিয়া সমাজ-জীবনের গভীরে প্রবেশের সুযোগ পায় না। উপরন্তু আখ্যায়িকার প্রাণরস বাহির হইতে শক্তি সঞ্চয় না করিয়া পারিবারিক বৃত্তের মধ্যে পরিক্রমা করে ও তথাকার আপেক্ষিক নিস্তরঙ্গ জীবন-প্রবাহ হইতে রস আকর্ষণ করে। জটিলতা ও ব্যাপ্তি অপেক্ষা জীবনের নিবিড়তার দিকে ইহার আকর্ষণ বেশী। জেন অস্টেন খাঁটি পারিবারিক উপন্যাস রচনা করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ, গ্রাম্য সমাবেশ, বিবাহ, পল্লীর নানা চিত্তাকর্ষক কাহিনী ছিল তাঁহার উপন্যাসের বিষয়। তাঁহার বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী ও সরস মানবিকতার গুণে অতি সাধারণ ঘটনাবলী মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের জটিল রহস্য উন্মোচন না করিতে যাইয়া তিনি পারিবারিক জীবনের সাধারণ ঘটনাবলী হইতে রস আকর্ষণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণলতা উপন্যাসে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবন লইয়া করুণ রসাশ্রিত উপন্যাস লিখিয়াছেন। ভ্রাতৃবিরোধ ও দাম্পত্যজীবনের বিপরীতমুখী ধারা তাঁহার উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তারকনাথও জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর না হইয়া কাহিনীকে নানা আকস্মিক ঘটনাবলীর অভিঘাতে চিত্তাকর্ষক করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। এই উপন্যাসের সংঘাতজনিত বিক্ষোভ জটিলতা সৃষ্টি করিয়া সমাজ-জীবনের গভীরে মূল প্রসারিত করিবার প্রয়াস করে নাই।

(কৃষ্ণকান্তের উইল স্বতন্ত্র শ্রেণীর রচনা। গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের কাহিনী একটি বিশেষ পরিবারের করুণ আখ্যায়িকা হইলেও ইহা মানব জীবনের শাশ্বত বেদনার ইতিহাস। এই ইতিহাস বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার সহিত যুক্ত হইয়া এক সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে। জমিদার কৃষ্ণকান্তের উইল রচনা লইয়া হরলালের ক্ষোভ ও পিতাকে বিধবা-বিবাহের ভীতি প্রদর্শন, কৃষ্ণকান্তের উইল পরিবর্তনহেতু হরলালের নিশ্চিত ক্ষতির সম্ভাবনা, বিধবা-বিবাহের আশ্বাসদানে

হরলাল কর্তৃক রোহিণীর সাহায্য লাভ, উইল চুরি ও পরে তাহাকে প্রত্যাখ্যান, গোবিন্দলালের সহানুভূতি প্রাপ্তিতে রোহিণীর মনে পরিবর্তন ও আত্মানুশোচনা, উইল পরিবর্তন করিতে যাইয়া কৃষ্ণকান্ত কর্তৃক তাহার ধরা পড়া, গোবিন্দলালের নিকটে তাহার মনোভাবের স্বীকৃতি, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ সেই একই মন্ত্রে রোহিণী বশীভূত হইয়াছে জানিয়া গোবিন্দলালের মনে দয়ার উচ্ছ্বাস, রেহিণীর দেশত্যাগে অস্বীকার ও অসহ্য প্রেমবহ্নি নির্বাপণ করাইবার জন্য তাহার ঈশ্বরের নিকটে আবেদন, জলমগ্না রোহিণীর উদ্ধার ও রোহিণী-গোবিন্দলালকে লইয়া পল্লী রমণীগণের মধ্যে জটলা ও কুৎসা রটনা, মৃত্যুর পূর্বে কৃষ্ণকান্ত কর্তৃক শেষবারের মত উইল পরিবর্তন, ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া প্রসাদপুরে রোহিণীকে লইয়া গোবিন্দলালের ভোগ-পঙ্কিল-জীবনযাত্রা, রোহিণীর হত্যা, গোবিন্দলালের বিচার ও মুক্তি এবং ভ্রমরের মৃত্যু,—এই সকল ঘটনায় বৃহত্তর সমাজ-জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। পারিবারিক জীবনের কাহিনী তাহার সঙ্কীর্ণ ও অনতিউচ্চ তটভূমি অতিক্রম করিয়া সমাজ-জীবনের দুর্বার গতিতে প্রবেশ করিয়া প্রবল তরঙ্গবিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছে। যেখানে পরিবারের কাহিনী সমাজ-জীবনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া ইহার ভারসাম্যকে বিচলিত করিয়া তোলে তাহাকে তখন সমাজের আখ্যায়িকা বলা সঙ্গত।

১৮৭৩—১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চারিটি পারিবারিক তথা সামাজিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। যথাক্রমে ইহারা বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইল। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল প্রকৃতপক্ষে খাঁটি, পূর্ণাঙ্গ, বস্তুনিষ্ঠ ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ নির্ভর সামাজিক উপন্যাস। ইন্দিরা ও রজনী পূর্ণ আকৃতির উপন্যাস নহে। উপরন্তু, এই দুইটি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণ অপেক্ষা ঘটনাবিন্যাসের উপরে অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন।

ইন্দিরার অবয়ব এত ক্ষুদ্র যে, ইহার মধ্যে ঘটনাবৈচিত্র্যের অবকাশ বড় সীমাবদ্ধ। সেই হেতু এখানে কোন জটিল সমস্যা অবতারণার উপায় নাই। তথাপি ইহার মধ্যে স্বাভাবিকতার ধরণ অনুসরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বৈচিত্র্য আনিয়াছেন ও প্রাণরসের প্রবাহ ঢালিয়া দিয়াছেন।

ইন্দিরা যেমন নিজের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছে, রজনীতে চারিটি চরিত্র এক একটি সন্ধিস্থল হইতে কাহিনী বর্ণনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। যেখানে যাহার চরিত্র পরিবর্তনের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অথবা আখ্যায়িকার জটিল আবর্ত এক বেগোচ্ছল প্রবাহ রচনা করিয়াছে, সেখানে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত মনোভাব লইয়া সদ্যঃ অনুষ্ঠিত অতীতের কাহিনী ও সম্ভাব্য পরিণাম প্রত্যেকে বর্ণনা করিয়াছে।

স্বভাবতঃ দৃষ্টি তাহার অতীতের ক্ষেত্র হইতে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। তবে বর্তমানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া ভবিষ্যতের পরিণামের ইঙ্গিত কোন চরিত্র দিলে কাহিনীর মধ্যে অবাস্তবতার সুর আসিয়া যায়। আবার কাহিনীর বিন্যাসের জন্য ইহাকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত না করিলেও চলে না।

ইন্দিরার কাহিনীর মধ্যে কোন জটিলতা নাই। ইহার আখ্যায়িকা সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে আবর্তিত হইয়াছে। স্বভাবতঃ এখানে বিশ্লেষণের অবকাশও সীমাবদ্ধ। এই গ্রন্থটি স্বাভাবিক জীবনধারার অনুসরণের ফলে বর্ণনার দীপ্তিতে ও চরিত্রসমূহের সহজ পরিচয়ে সরস হইয়াছে। 'রজনীতে' বঙ্কিমচন্দ্র দুই একটি স্থানে রোমান্সের মাধুর্য সৃষ্টি করিয়া উপন্যাসের বস্তুধর্ম কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের অনুরাগ, রজনীর দৃষ্টিলাভ যেমন রোমান্স সৃষ্টির পরিচয় দেয়, তেমনি লবঙ্গলতা ও অমরনাথের প্রেমের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ আদর্শবাদ অনুসরণ করায় বাস্তব জীবনের উপরে কল্পলোকের ছায়াপাত হইয়াছে। 'আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের'—লবঙ্গলতার মধ্যে প্রেমের এই মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহা যে বাস্তব জীবনে স্বীকৃত হয় না, নগেন্দ্র-গোবিন্দলালের আচরণে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। রোমান্স কল্পনায় জীবনের সমন্বয়ের সুর খুঁজিয়া পাওয়া সহজ, কিন্তু বাস্তবে সেই আদর্শকে স্থাপন করিতে গেলে বিরোধ দেখা যায়। লবঙ্গলতার ন্যায় ভ্রমরও বাস্তব জীবনে আদর্শ প্রেমের স্বপ্ন দেখিয়াছিল। কিন্তু তাহার কঠিন তপস্যা নিজের জীবনে সার্থক হয় নাই, যদিও পরোক্ষভাবে তাহা গোবিন্দলালকে নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়াছিল। অপরিসীম দুঃখ ভোগের মধ্যে প্রেমের যে সার্থকতা ঘটে যাহা বৈষ্ণবীয় আদর্শে দীক্ষিতা শ্রীকান্তের কমললতা উপলব্ধি করিয়াছিল, তাহা লৌকিক প্রেমের বিষয় নহে। পার্থিব জীবনে প্রেম দান—প্রতিদানের মাধ্যমে সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে।

সূর্যমুখী ও ভ্রমর উভয়ে প্রেমের ধ্যান করিয়াছিলেন। তাঁহারা দাম্পত্য জীবনকে সুখী ও সার্থক করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; নগেন্দ্রনাথ রূপ-তৃষ্ণায় আত্মসংযম হারাইয়া কুন্দনন্দিনীকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহা প্রথমে ছিল তাঁহার নিকটে অপার্থিব সৌন্দর্যের আরতি তাহাই শেষ পর্যন্ত অনিবার্য রূপতৃষ্ণায় পরিণত হইয়াছিল। সূর্যমুখী স্বপ্নভঙ্গের দুঃখে দগ্ধ হইলেও স্বামি-প্রেমের ঔদার্যে নগেন্দ্রের সহিত বিধবা কুন্দনন্দিনীর বিবাহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দিয়াছিলেন এবং পরে আত্মানুশোচনায় পীড়িতা হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীর মনের পরিচয় জানিতেন বলিয়া তাঁহার প্রত্যাবর্তনে

কোন বাধা সৃষ্ট হয় নাই। পতি-প্রেম ও তাঁহার হৃদয়ের ঔদার্য তাঁহার মনকে ক্ষমাশীল করিয়া তুলিয়াছিল। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু তাঁহাদের মধ্যে হয়ত ক্ষণকালীন কৃষ্ণ-যবনিকা টানিয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ইহাতে আত্মিক আকর্ষণের কোন বিঘ্ন সৃষ্ট হয় নাই। বিচ্ছেদের পরে অনুশোচনা ও আত্মসমীক্ষায় যে মিলন সংঘটিত হইল তাহা তাঁহাদের মনের বন্ধনকে আরও দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু ভ্রমর ও গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে। ভ্রমর সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা। তাহার প্রেমানুরাগ বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার দরুণ পরিপুষ্ট নহে, এক প্রকারের পৌরাণিক মহিমার দ্বারা অনুপ্রাণিত। সে তাহার স্বামীকে এক আদর্শলোকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাই আসন্ন বিচ্ছেদের কালে সে আদর্শ-বিশ্বাসজাত প্রত্যয়ের সুরে বলিয়াছে 'কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আমার জন্য কাঁদিবে। যদি একথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী'। ভ্রমরের মধ্যে ভালবাসা ছিল কিন্তু উদারতা ও ক্ষমা ছিল না। সে তাহার পরস্ত্রীতে আসক্ত স্বামীকে কদাচ প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিবে না, ইহা গোবিন্দলালও জানিতেন। তাই প্রসাদপুরে নিশাকরের মুখে বিচ্ছেদের প্রায় দুই বৎসর পরে ভ্রমরের নাম শুনিয়া তিনি একাকী কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে, হরিদ্রাগ্রামের পথে কাঁটা পড়িয়াছে। আদালতে হত্যা অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি কলিকাতায় সামান্য অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। পরে বাধ্য হইয়া তিনি ভ্রমরের নিকটে অর্থ সাহায্য চাহিলেন। কিন্তু ভ্রমরের প্রত্যুত্তরে কোন প্রীতি ছিল না, কোমলতার স্পর্শ ছিল না। তাহার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, কেননা স্ত্রী হত্যা-কারীকে সে কদাপি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিবে না, ক্ষমাও করিবে না।

নগেন্দ্রনাথ সর্বগুণাধার, শিক্ষিত ও মার্জিতমনা ব্যক্তি। সূর্যমুখীও বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহাদের ক্ষেত্রে মানসিক রুচির সমতা ঘটিয়াছিল। গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ ও উপন্যাস পাঠ ব্যতীত অপর কোন কলাবিদ্যায় অনুরাগ ছিল কিনা তাহা জানা যায় না। কুন্দনন্দিনীর প্রতি রূপাকর্ষণকে কেন্দ্র করিয়া নগেন্দ্রের মনে যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায়, রোহিণীকে লইয়া সেইরূপ গভীর সংঘাত গোবিন্দলালের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। ভ্রমরের অভিমানপ্রসূত ব্যথায় পিত্রালয়ে গমন তাঁহার জীবনে রোহিণীকে গ্রহণের পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিল। ভ্রমরের অনুপস্থিতি হেতু রোহিণীর প্রতি দুঃখবোধ স্মৃতি-রসে পুষ্ট হইয়া বাসনায় পরিণত হইল। কৃষ্ণকান্ত রায়ের মৃত্যুর পরে স্ত্রীর অন্নে প্রতিপালিত না হইবার অজুহাতে যেভাবে তিনি অশ্রুবিপ্লুতা, আলুলায়িতকুন্তলা

পতিগতপ্রাণা ভ্রমরকে রূঢ়ভাবে ত্যাগ করিলেন তাহাতে তাঁহার বিচারবুদ্ধিহীন ও প্রবৃত্তিতাড়িত মনটি অনাবৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। নগেন্দ্রের পক্ষে এই জাতীয় আচরণ সম্ভব ছিল না। তিনি রূপমুগ্ধ হইয়া অন্তর্সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন। (স্বামীর গৃহত্যাগের ইচ্ছাজনিত মানসিক দুঃখকে উপলব্ধি করিয়া সূর্যমুখী নিজে কুন্দের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন। ভ্রমরের পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল না। গোবিন্দলালের চিত্তে সমাজ সংস্কারের প্রভাব হেতু তিনিও রোহিণীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতেন না। আভিজাত্যের কারণে হরলাল রোহিণীকে বিবাহ করিতে চান নাই। ইহার গূঢ় সঙ্কেত হইল যে, তিনি রোহিণীর ন্যায় ব্যাপিকাকে গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। একই কারণে গোবিন্দলালও তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতেন না। গুণের সেবা করিতে হইলে দাম্পত্য জীবনের বন্ধনকে মানিয়া লইতে হয়, কিন্তু রূপের সেবা করিতে হইলে মক্ষিকাবৃত্তি প্রশস্ত। তিনি চিন্তা করিয়াছেন 'মাটীর ভাণ্ড যেদিন ইচ্ছা সেইদিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব'। ভোগলোলুপ আত্মবিস্মৃত ব্যক্তির পক্ষে একটি কঠিন আঘাত ব্যতীত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিবার আর কোন উপায় থাকে না। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পরে আত্মানুশোচনায় দগ্ধ হইয়া তাঁহার পূর্বজীবনে প্রেমের স্নিগ্ধ ছায়ায় প্রত্যাবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন। গোবিন্দলালের পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল না।)

(বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল খাঁটি সামাজিক উপন্যাস। উভয় রচনা রোমান্স-কল্পনা-বর্জিত ও বস্তুনিষ্ঠ। উভয়ের মূল প্রেরণা একজাতীয়। রূপতৃষ্ণার আকর্ষণে নায়কদ্বয় যে সংঘাত সৃষ্টি করিলেন তাহার অনিবার্য পরিণতি বড় দুঃখের। ঘটনার বিচিত্র প্রবাহে ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে মূল চরিত্রসমূহের পরিণাম ঔপন্যাসিক সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিস্ফুট করিয়াছেন। ইন্দিরা বা রজনীতে বঙ্কিমচন্দ্র জীবন-রহস্যের গভীরে প্রবেশ করেন নাই। সেখানে উত্তাপ যখন ঘনীভূত হইয়া উঠিবার প্রয়াস করিয়াছে আদর্শবাদের সংঘাতে তাহা তরল হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে। লবঙ্গলতা বা অমরনাথের বেদনা তাঁহাদের জীবনের ভিত্তি-মূলকে কদাপি বিচলিত করে নাই, কেননা এক সুগভীর প্রত্যয়কে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। (কিন্তু এই দুইটি সামাজিক উপন্যাসে আদর্শ-বাদকে দূরে রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবনের রহস্যময় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জটিল আবর্তের রূপকে শিল্পীমনের নির্লিপ্ততা ও সহানুভূতি লইয়া উপলব্ধি করিয়াছেন।) গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণীর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত বাহিরের বিচিত্র শক্তির অনুকূল পরিবেশে ব্যাপ্তি লাভ করিয়া সমাজ-জীবনেও গভীর

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের ইতিহাস সমাজের মূল্যবোধের দৃষ্টিতে বিচারের দণ্ড লাভ করিয়াছে। জীবনবিধাতা মানুষের জন্য যে দুর্জ্ঞেয় পরিণাম রচনা করিয়াছেন তাহাকে পূর্ব হইতে জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু ইহাও ঠিক যে নর-নারী তাহাদের কার্যকলাপে, অদম্য প্রবৃত্তির তাড়নায়, বিচারবুদ্ধির অভাবে কিংবা ক্ষমাহীন মনোভাবে সেই পরিণামকে ত্বরান্বিত করে।

ব্যক্তির জীবন সমাজে বিধৃত। সমাজশক্তি কখনও সক্রিয়রূপে আবার কখনও-বা দৃঢ়মূল সংস্কাররূপে কাজ করিয়া থাকে। নগেন্দ্রনাথ সমাজকে উপেক্ষা করিয়া কুন্দকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বিবেকবোধে তাড়িত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা সমাজ-সংস্কারের পরিণাম-ফল। হরলাল রোহিণীকে বিধবা-বিবাহের আশ্বাসদানে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া উইল চুরি করিতে প্রণোদিত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি সামাজিক সংস্কারবশতঃ তাহাকে বিবাহ করিতে চাহেন নাই। হরলাল তাঁহার পিতাকে বিধবা-বিবাহের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, কৃষ্ণকান্ত রায় জমিদার ও সমাজপতি। তিনি এই পত্র পাইয়া হরলালের অনুকূলে উইল পরিবর্তন করিবেন। বিধবা-বিবাহ আইনতঃ সিদ্ধ হইলেও সামাজিক সমর্থন লাভ করে নাই। সুতরাং হরলালের প্রস্তাবিত কার্যের সামাজিক মূল্য আছে। গোবিন্দলাল ও রোহিণীর অবৈধ প্রণয় সমাজ-জীবনে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল। তাই কৃষ্ণকান্তের উইল সামাজিক উপন্যাস।)

কাহিনী-বিন্যাস

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বিশ্লেষণের বিষয় নহে। ইহা কি পদ্ধতিতে রচিত হইল তাহা আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া যায়। মানব চরিত্র কিংবা একটি অবস্থা অথবা আকস্মিক কোন ইঙ্গিতকে আশ্রয় করিয়া উপন্যাস রচিত হইতে পারে। হেনরি জেম্‌স্ বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার প্রতিবেশীর মুখে একটি প্রসঙ্গের ইঙ্গিত পাইয়া (**'a mere floating particle in the stream of life'**) তাঁহার ***The Spoils of Poynton*** রচনা করেন। জীবনের রূপ ও বিচিত্র রহস্য উপন্যাসের বিষয়, কিন্তু এই বিষয়কে নির্বাচিত ও গড়িয়া তুলিতে হয়।[১]

১। হেনরি জেমসের মতে জীবন 'has no direct sense whatever for the subject and is incapable, luckily for us, of nothing but splendid waste. (*A Treatise on the Novel* : R. Liddell)

টলস্টয়ের ন্যায় আমরাও জীবনকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষগোচর জগৎ হইতে তাঁহার 'ওয়ার এণ্ড পীসের' উপকরণ সংগ্রহ করেন। কিন্তু যে উদ্ভাবনী-শক্তি থাকিলে ইহা করা যায় তাহা সকলের মধ্যে থাকিবার কথা নহে। উপরন্তু লেখকের প্রতিভা বিষয়টিকে আবিষ্কার করে ও ইহাকে প্রকৃতির অপক্ষপাত প্রাচুর্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়।[১] নির্বাচন করিবার দৃষ্টিভঙ্গী লেখকের মৌলিক ক্ষমতার পরিচয় দান করিয়া থাকে।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া কৃষ্ণকান্তের উইলের কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার জমিদারীর মুনাফা দুই লক্ষ টাকা। বিষয়টি তাঁহার ও ভ্রাতা রামকান্তের উপার্জিত। ভ্রাতার মৃত্যুর পরে কৃষ্ণকান্তের মতিগতি পরিবর্তিত হয় নাই। তিনি প্রথম বারে উইল করিয়া গোবিন্দলালকে সম্পত্তির অর্ধাংশ ও তাঁহার নিজের দুই পুত্রকে তিন আনা হারে দিলেন। অবাধ্য ও দুর্মুখ হরলাল এই উইল লইয়া পিতার সহিত কলহ করায় কৃষ্ণকান্ত দ্বিতীয় বারে উইল পরিবর্তন করিয়া হরলালকে এক আনা ও অপর পুত্র বিনোদলালকে পাঁচ আনা দিলেন। হরলাল কলিকাতা হইতে বিধবা-বিবাহের ভীতি দেখাইয়া পিতাকে পত্র দিলেন। তিনি আট আনা পাইলে মত পরিবর্তন করিবেন। কৃষ্ণকান্ত পুনর্বার উইল পরিববর্তনের সঙ্কল্প করিলেন। ইহাতে হরলালের ভাগে শূন্য পড়িবে, কিন্তু তাহার শিশুপুত্র এক পাই পাইবে। ইহাতেও তাহার ভাগে তিন হাজার টাকা পড়িবে। হরলাল উইলের লেখক ব্রহ্মানন্দ ঘোষের গৃহে আসিয়া এই উইল পরিবর্তনের জন্য তাহাকে অগ্রিম পাঁচশত টাকা দিলেন ও কার্য সিদ্ধ হইলে সমপরিমাণ অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। একটি নকল উইল প্রস্তুত হইল যাহাতে হরলাল জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া পাইবে বারো আনা ও গোবিন্দলাল মাত্র এক পাই। ব্রহ্মানন্দ রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণের ন্যায় ফলাহারের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া অর্থ গ্রহণ করিল ও উইল পরিবর্তনের কৌশল শিখিয়া লইল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে পারিল না। হরলাল তাহার অকর্মণ্যতার জন্য ভৎ'সনা করিয়া তাহার যৌবনদীপ্তা, রন্ধনরতা রূপসী ভ্রাতুষ্পুত্রীর নিকটে আসিল এবং নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া অবশেষে তাহাকে বিধবা-বিবাহের প্রলোভন দেখাইল। মুগ্ধা রোহিণী জাল উইল রাখিয়া দিল ও রাত্রিকালে সুকৌশলে কৃষ্ণকান্তের শয্যাগৃহ হইতে আসল উইলের পরিবর্তে জাল উইল স্থাপন করিল। হরলাল আনন্দিত চিত্তে রোহিণীকে অর্ধেক

১। 'The power that recognizes the fruitful idea and seizes it is a thing apart', (*The Craft of Fiction*. P. Lubbock)

পুরস্কার দিতে চাহিলে সে তাহাকে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিল। কিন্তু হরলাল জানাইল যে চুরি করিয়াছে তাহাকে তিনি রায় বাড়ীর গৃহিণী করিতে পারিবেন না। প্রত্যাখ্যাতা রোহিণী তাঁহাকে কটু-কথা বলিয়া বিদায় দিল।

অপরাহ্নে বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিবার সময়ে কোকিলের কুহুধ্বনি শুনিয়া রোহিণীর স্বতঃই মনে হইতে লাগিল যে, তাহার জীবন বৃথায় গেল, সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য ভোগ করা হইল না। কুহুরবের শব্দের সহিত জগতের সুর পঞ্চমে বাঁধা। সে জলে কলসী ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে দেখিয়া সমবেদনায় তাহার দুঃখের কথা জানিতে চাহিলেন। রোহিণী হয়ত তাঁহার অসুখী জীবনের ব্যর্থতা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছে। গোবিন্দলাল ভাবিলেন তাহার কি কোন প্রতিকার করা যায় না। চতুর্দিকে প্রকৃতি সুন্দর, মনুষ্যহৃদয় শুধু অসুন্দর। তাই তিনি তাঁহাকে দুঃখের কথা জানাইতে বলিলেন। রোহিণীও উত্তর দিল 'একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে'। সমবেদনায় রোহিণীর মন জাগ্রত হইল। সে জাল উইল যথাস্থানে রাখিবার কথা ভাবিতে লাগিল। সে জল আনিতে যায় আর নিত্য গোবিন্দলালকে পুষ্পকানন মধ্যে দেখিতে পায়। প্রকৃতি নিত্যকালের মায়াবিনী। গোবিন্দলালের রূপ তাহার হৃদয়পটে গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত হইতে লাগিল। রোহিণী প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়িল।

কোকিলের কুহুধ্বনি, দীর্ঘিকা তীরে তাহার রোদন, গোবিন্দলালের সমবেদনা, তাঁহার প্রতি রোহিণীর অন্যায় আচরণ—সকল কিছু মিলিয়া তাহার পূর্বরাগকে প্রগাঢ় করিয়া তুলিল। রোহিণী মৃত্যু কামনা করিল বটে, কিন্তু মৃত্যুবরণের ক্ষমতা তাহার ছিল না।

রোহিণী জাল উইল রাখিতে যাইয়া ধরা পড়িল। পরদিন এই কথা পরিচারিকা মহলে রাষ্ট্র হইল। গোবিন্দলালকে কাছারি বাড়ীর দিকে যাইতে দেখিয়া ভ্রমর তাঁহার পরদুঃখ-কাতরতাকে অন্তরে সপ্রশংসভাবে গ্রহণ করিল।

রোহিণী গোবিন্দলালের নিকটে উইল চুরির বৃত্তান্ত জানাইল ও পরিশেষে তাহার উদ্বেল কামনার কথা জানাইয়া বলিল 'এ রোগের চিকিৎসা নাই, আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে মরিতাম'। গোবিন্দলাল তাহাকে স্থান ত্যাগের পরামর্শ দিলেন। রোহিণীর দিক হইতে ইহা তাহার প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ। ইহার মধ্যে ভীরুতা আছে, কিন্তু তাহাই তাহার অন্তরে মাধুর্য বিস্তার করিয়া দিল। রোহিণী স্থান ত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। ধর্ম ও সুখনাশের সম্ভাবনায় সে কাতর হইয়া পড়িল। অসহ্য প্রেমবহ্নির দাহ সে আর সহ্য করিতে পারে না। গোবিন্দলালও চিন্তাকুল হইলেন। ভ্রমর সকল কথা শুনিয়া রোহিণীকে বারুণীতে

সন্ধ্যাকালে ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ দিল। গোবিন্দলাল তাঁহার কার্যের নিন্দা করিলে অপাপবিদ্ধা, পতিগতপ্রাণা ভ্রমর বলিল, 'যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে, সে কি মরিতে পারে'? প্রেমের প্রতিদান পাইলে মৃত্যুর কথা উঠিত না, কিন্তু রোহিণীর অধিকার তখনও স্থাপিত হয় নাই। দিনান্তে বারুণীর তীরে যাইয়া গোবিন্দলাল জলতলে শায়িতা রোহিণীকে উদ্ধার করিল ও 'মদন মদোন্মাদ হলাহল—কলসী তুল্য রাঙ্গা রাঙ্গা মধুর অধরে' অধর দিয়া ফুৎকার দিল। সেই মুহূর্তে ভ্রমর লাঠির দ্বারা বিড়ালকে মারিতে যাইয়া নিজের কপালে আঘাত করিয়া বসিল। রোহিণী জ্ঞানলাভ করিয়া গোবিন্দলালকে তাহার রাত্রি-দিন তৃষ্ণার কথা জানাইল। তাহার সম্মুখে শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে না, সে আশা নাই। গোবিন্দলাল বিজন কক্ষ মধ্যে তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য ও সংঘাত প্রশমিত করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট আবেদন জানাইলেন। 'তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব'। গৃহে ফিরিয়া ভ্রমরের প্রশ্নে গোবিন্দলাল তাঁহার বাগান হইতে বিলম্বে ফিরিবার কারণ দুই বৎসর পরে বলিবার কথা বলিলেন। ভ্রমরের মন হইতে কালো মেঘখানি অপসারিত হইল না। কৃষ্ণকান্তের নিকট হইতে মহাল দেখিবার অনুমতি লইয়া রোহিণীকে ভুলিবার উদ্দেশ্যে গোবিন্দলাল বন্দরখালি যাত্রা করিলেন। ক্ষীরি চাকরাণী রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের আকর্ষণের কথা ভ্রমরকে জানাইল। পরে বিনোদিনী ও সুরধুনী এবং অন্যান্যগণ আসিয়া সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ভ্রমরের মনকে সংশয়াতুর করিয়া তুলিল। রোহিণী তাহার নামে মিথ্যা রটনার অপবাদের জন্য ভ্রমরকে দায়ী করিয়া তাহাকে দেখাইবার জন্য গিল্টি গহনা পড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল যে গোবিন্দলাল তাহাকে সাত হাজার টাকার গহনা দেয় নাই, মাত্র তিন হাজার টাকার দিয়াছেন। মেজবাবুর অনুগ্রহে তাহার আর খাইবার পরিবার দুঃখ নাই। ভ্রমর স্বামীকে কঠোর ভাষায় চিঠি লিখিয়া জানাইল যে, তাঁহার উপরে তাহার ভক্তি ও বিশ্বাস নাই। ব্রহ্মানন্দ গোবিন্দলালকে জানাইল যে, ভ্রমর রটাইয়াছেন যে, তিনি নাকি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছেন। গোবিন্দলাল তাড়াতাড়ি গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন এবং ভ্রমর অভিমানবশে পিত্রালয়ে যাত্রা করিল। যাহা ভাঙ্গে আর তাহা গড়ে না। গোবিন্দলালও ভ্রমরকে শাস্তিবিধানের জন্য ক্ষুদ্র রোগের জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করিতে মনস্থ করিলেন। সেদিন রাত্রে বাগান হইতে ফিরিবার সময়ে রোহিণী জানিয়া গেল যে, গোবিন্দলাল তাহার রূপমুগ্ধ। রূপতৃষ্ণায় তিনি দ্রুত অধঃপতনের পথ বাহিয়া নামিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ও রোহিণীকে লইয়া

কুৎসা কৃষ্ণকান্তের কর্ণেও উঠিল। (তিনি মৃত্যুর প্রাক্কালে গোবিন্দলালের উপস্থিতিতে উইল পরিবর্তন করিয়া ভ্রমরকে সম্পত্তির অর্ধাংশ দিয়া গেলেন।) ভ্রমরের অবর্তমানে তিনি তাহা পাইবেন। ভ্রমর ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তখন সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে, কার্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে, সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়া গিয়াছে। শেষবারের এই উইল পরিবর্তন দাম্পত্যজীবনে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করিতে সহায়তা করিল। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সংশোধনের আকাঙ্ক্ষায় ভ্রমরকে সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর অন্নদাস হইয়া থাকিবেন না এই অছিলায় গোবিন্দলাল তাহাকে ত্যাগ করিবার সংকল্প ঘোষণা করিলেন। রূপসী রোহিণী তাঁহার মনকে অভিভূত করিয়াছিল। এই সময়ে গোবিন্দলালের মাতাও পুত্রবধূর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া কাশী যাইতে মনস্থ করিলেন। তিনি গৃহে থাকিলে সদুপদেশে, স্নেহবাক্যে ও স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ সদুপায়ে পুত্র-পুত্রবধূর মনোমালিন্য দূর করিতে পারিতেন। আত্মপরায়ণা গৃহিণী ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া পুত্রকে লইয়া বিদেশ যাত্রা করিলেন। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে জানাইলেন যে, তিনি আর গৃহে আসিবেন না। মর্মভেদী দুঃখে ভ্রমর বলিল যে, একদিন তাহাকে খুঁজিতে হইবে, নচেৎ দেবতা মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী। তুমি আমারই, রোহিণীর নও। কক্ষান্তরে ভ্রমর কিছুকাল পূর্বে সূতিকাগারে বিনষ্ট পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল, আর গোবিন্দলাল একদিকে ভ্রমরের অকৃত্রিম স্নেহ স্মরণ করিলেন ও চিরকালের জন্য তাহাকে হারাইতে যাইতেছেন বলিয়া দুঃখ-বোধ করিলেন, কিন্তু পরক্ষণে রোহিণীর জ্বলন্ত রূপরাশি তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। দুইটি জীবনের মধ্যে চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ ঘটিল।

কাহিনীর দ্বিতীয় অংশ গোবিন্দলাল—রোহিণীর কামনাতপ্ত জীবনের বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলন ও দ্রুত অবসাদ লইয়া রচিত। যে প্রেম আত্মিক বন্ধনের উপরে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া ওঠে না, যাহা লালসার বহ্নিতে প্রতপ্ত বলিয়া হৃদয়ের রসটুকু শোষণ করিয়া লয়, সেই মনছাড়া দেহের দুঃসহ বোঝা জীবনকে বড় দুর্বহ করিয়া ফেলে। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য গোবিন্দলালের সঙ্গীতচর্চা ও উপন্যাস পাঠ, কামাপুরুষকে রূপের মায়ায় জয় করিয়াও চিত্তজয়ের ব্যর্থতায় রূপসী নারীর জীবনে শূন্যতা বোধ ও কামনার দাহ অপাপবিদ্ধা ভ্রমরের বিশীর্ণ হইয়া মৃত্যুর জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা, মাধবীনাথের কৌশলে গোবিন্দলাল-রোহিণীর জীবনে মর্মান্তিক পরিণতি, অভিযুক্ত গোবিন্দলালের বিচারে মুক্তিলাভ ও ভ্রমরের মৃত্যু-শয্যায় তাঁহার উপস্থিতি—এই সকল দ্রুত পরিণামমুখীন ঘটনাবলী লইয়া উপন্যাসের উত্তরার্ধ রচিত হইয়াছে।

ভ্রমরের দুঃখে বিচলিত মাধবীনাথ হরিদ্রাগ্রামের পোস্টমাস্টারের নিকট হইতে প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল-রোহিণীর অবস্থানের সংবাদ পাইলেন। ব্রহ্মানন্দের নিকটে ইহার সমর্থন মিলিল। পরে তিনি নিশাকর দাস নামক এক চতুর ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিলেন। নিশাকর রাসবিহারী দে ছদ্মনামে তথায় উপস্থিত হইয়া গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল ও তাঁহার ভার্যা যে বিষয়গুলির পত্তনি দিতে সম্মত সেই ক্ষেত্রে তাঁহার অনুমতি প্রয়োজন বলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিল। দুই বৎসর পরে ভ্রমরের নাম শুনিয়া গোবিন্দলাল বিচলিত হইলেন। তিনি নিশাকরকে বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী যাহাকে খুশি পত্তনি দিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। নিশাকর চলিয়া গেলে গোবিন্দলাল একাকী শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ভ্রমরের স্মৃতি, হরিদ্রাগ্রামের স্মৃতি তাঁহার আত্মানুশোচনাকে প্রবল করিয়া তুলিল। নিশাকরের ন্যায় রূপবান যুবাপুরুষকে জয় করিবার উদ্দেশ্যে রোহিণী তাহাকে অপেক্ষা করিবার অনুরোধ জানাইয়া ভৃত্য রূপচাঁদকে পাঠাইল। নিশাকর চিত্রার বাঁধাঘাটের নিকট বকুল গাছ দুইটির সন্নিকটে অপেক্ষা করিবে জানাইল। নিশাকর অপর ভৃত্য সোনাকে মুনিবঠাকুরণের গোপন অভিসারের কথা গোবিন্দলালকে জানাইতে বলিল। তিনি আসিয়া রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিলেন ও গৃহে লইয়া যাইয়া তাহার স্বৈরিণী বৃত্তির জন্য তিরস্কার ও তাহার রূপের জন্য নিজের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া তাহাকে পিস্তলের গুলিতে নিহত করিয়া প্রসাদপুর ত্যাগ করিলেন।

খুনের পঞ্চম বৎসরে গোবিন্দলালকে বৃন্দাবন হইতে গ্রেপ্তার করা হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষীও সাজান হইল। কিন্তু মাধবীনাথ সাক্ষীদিগকে টাকা দিয়া হাত করিলেন। মামলা ফাঁসিয়া গেল। গোবিন্দলাল খালাস পাইয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। ছয় বৎসর পরে তিনি ভ্রমরের নিকটে দিনাতিপাতের জন্য অন্ন ভিক্ষা চাহিলেন। ভ্রমরের উত্তরে কোন স্নেহের বাণী ছিল না, অনুরাগও ছিল না। সে তাঁহাকে পাঁচশত টাকা মঞ্জুর করিল। সপ্তম বৎসরে ভ্রমর মৃত্যুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা রাত্রিতে চিরবিদায় গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইল। গোবিন্দলালের সহিত শেষ সাক্ষাৎ হইল। ভ্রমর স্বামীর নিকটে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিল যেন সে জন্মান্তরে সুখী হইতে পারে। গোবিন্দলালের মত কেহ পায় নাই, আবার তাঁহার ন্যায় কেহ হারায় নাই। ভ্রমরের মৃত্যুর বারো বৎসর পরে এক সন্ন্যাসী ভাগিনেয় শচীকান্ত নির্মিত মন্দিরে আসিয়া দেখা দিলেন। মন্দিরের মধ্যে এক স্বর্ণ প্রতিমা। সুখে দুঃখে, দোষেগুণে যে ভ্রমরের

ন্যায় হইবে সে ইহা লাভ করিবে। সন্ন্যাসী স্বয়ং গোবিন্দলাল। অজ্ঞাতবাস সমাপ্তির পরে তিনি পরিজনবর্গকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছেন। ভগবৎপাদ-পদ্মে মনঃস্থাপন করিয়া তিনি শান্তি পাইয়াছেন। ইহার পরে তিনি চিরদিনের জন্য গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল যে রোহিণীর মুখে প্রায়শ্চিত্তের কথা শুনিয়া গোবিন্দলাল বারুণীর জলে আত্মবিসর্জন করিলেন। সংশোধিত সংস্করণে আছে যে, তিনি ভ্রমরের কথায় ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া ভ্রমরাধিক ভ্রমরকে পাইলেন।

আখ্যান-গঠন

আরিস্টটলের মতে প্রচলিত কাহিনী লইয়া নাটক রচনা করা যায়, কিন্তু নাট্যকারের ধর্ম হইল সেই কাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করা। এইখানে তাঁহার সৃষ্টির মৌলিকতা প্রমাণিত হয়। চরিত্রসমূহের মধ্যে থাকে গুণাবলী, কিন্তু ঘটনাবলীর প্রবাহে ইহারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ঘটনার প্রবাহকে বিশিষ্ট রূপের মধ্যে প্রকাশ করা হইল আখ্যানের ধর্ম। জীবনে আছে বিচিত্র ঘটনার ধারা। কিন্তু যাহা ঘটে তাহা সত্য নহে বলিয়া ঔপন্যাসিক সেই ধারাকে শিল্পের ধর্ম অনুযায়ী কার্য-কারণ সূত্রে পারম্পর্য দান করিয়া থাকেন। এই হেতু বিষয়ের নির্বাচন ও বিন্যাস উপন্যাসের প্রধান বস্তু রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

আখ্যানের গুরুত্ব অন্য দিক হইতেও বিচার্য। হেনরি জেম্‌সের মতে চরিত্র ঘটনাবলী হইতে বিচ্ছিন্ন নহে এবং সেই চরিত্রের পরিচয় ঘটনার বিন্যস্ত রূপ হইতে পাওয়া যায়।[১] যে সকল চরিত্র উপন্যাসে চিত্তাকর্ষকরূপে প্রতীয়মান হয় তাহাদের রূপ ঘটনার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। সুতরাং আখ্যানগঠন সুষ্ঠু হইলে আমরা উপন্যাস-সৃষ্টির আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকি। কাহিনী একটি সুগঠিত বৃত্তের ধারায় গড়িয়া ওঠে। কিন্তু এখানে অসম্পূর্ণতা থাকিলে বিষয়ের আবেদনও ব্যর্থ হইয়া যায়। মানবজীবন হইল উপন্যাসের আশ্রয়। সুন্দর ও অসুন্দর মিলিত হইয়া এই জীবনের পরিচয় দান করে। ইহার ফলে ঔপন্যাসিক অসুন্দরের মধ্যে নীতির দিক হইতে অসমর্থনযোগ্য চরিত্রের মধ্যে বিস্ময়রসাশ্রিত সৌন্দর্যের পরিচয় পাইয়া থাকেন। প্রত্যক্ষগোচর জীবনে সেই চরিত্রটি তাহার কার্যকলাপে আমাদের নিকটে উপেক্ষার বস্তু হইত, কিন্তু ঔপন্যাসিক তাহার মধ্যে যে জীবনরসের পরিচয় পান তাহাতে সে আমাদের

1. 'The hours of author's labour are lived again by the reader, the pleasure of creation is renewed'. (*The Craft of Fiction*: P. Lubbock)

চিত্তলোক অধিকার করিয়া বসে। সৎ চরিত্র লইয়া নীতিগর্ভ প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে। চরিত্রের জটিলতা উপন্যাস রচনায় প্রেরণা দান করে। ডিকেন্সের *Great Expectations*-এ পিপ-চরিত্রের সংঘাত তাহাকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। উপন্যাসে যাহা কাহিনী বলিয়া পরিচিত তাহা কালের ধারায় বিবৃত হইয়া থাকে এবং আখ্যান কার্য-কারণ প্রবাহে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়। বিস্ময় বা রহস্য আখ্যানের বড় আকর্ষণ।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' আখ্যান গঠনের চাতুর্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রসমূহ নব নব বিস্ময়ের দীপ্তি আমাদের মনের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সাধারণভাবে গোবিন্দলালের অসংযত রূপকামনা বা রোহিণীর পুরুষ-চিত্ত জয়ের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিত না, কিন্তু যে ঘটনাবিন্যাসের মাধ্যমে পারস্পরিক সংযোগ হেতু তাহাদের ও ভ্রমরের জীবনে আবর্ত-সঙ্কুল জটিল প্রবাহ রচিত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের চরিত্র হইয়াছে রূপবান ও আকর্ষণীয়।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসটি প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিভক্ত হইয়া কাহিনীর পূর্বার্ধ ও উত্তরাধকে ধারণ করিয়াছে। প্রথম খণ্ডে রোহিণীর রূপোন্মাদনায় সাধ্বী-পত্নী ভ্রমরের সহিত গোবিন্দলালের বিচ্ছেদ যাহা রূপলালসার পূর্বমেঘরূপে বাখ্যাত হইতে পারে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে রূপমোহের অবসানে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি এবং অনুশোচনাদগ্ধ গোবিন্দলালের দাম্পত্য প্রেমের তীর্থে পুনরাগমন এবং শুচিস্নাত অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতিলাভে ভ্রমরের মৃত্যু, যাহা কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে ভাব-সম্মিলনের আশ্বাস দান করিয়াছে, তাহা উত্তরমেঘরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য।

প্রথম খণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত উইল রচনা ও ইহার প্রতিক্রিয়া লইয়া রচিত। বাহ্য ঘটনা মানুষের জীবনে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া কি গভীর প্রতি-ক্রিয়া সৃষ্টি করে তাহা বারংবার উইল পরিবর্তনের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। কৃষ্ণকান্ত চারিবার উইল পরিবর্তন করিয়াছেন। প্রত্যেকবার এই পরিবর্তন কাহিনীর মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন চরিত্রের মানসলোকে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অনেক সময়ে কোন ভাব অথবা কামনা মনোলোকে সুপ্ত থাকে অথবা তাহা আদৌ থাকে না। কিন্তু বাহিরের কোন ঘটনা এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করে যাহা জীবনের অন্তর্দেশে প্রবিষ্ট হইয়া এক অপ্রতিরোধ্য আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইহার ফলাফল অনেক সময়ে এক অবাঞ্ছিত পরিণাম রচনা করিয়া দেয়।

কৃষ্ণকান্ত রায় প্রথমবারের যে উইল তৈয়ারী করিলেন তাহাতে গোবিন্দলাল

তাঁহার পিতার অংশ হইতে পাইলেন সম্পত্তির অর্ধাংশ ও কৃষ্ণকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরলাল ও তাহার অপর পুত্র বিনোদলাল যথাক্রমে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা ও শৈলবতী এক আনা। হরলাল বিষয়বণ্টনে প্রচণ্ড আপত্তি জানাইলে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণকান্ত দ্বিতীয় উইলে বিনোদলালকে পাঁচআনা ও হরলালের জন্য একআনা নির্দিষ্ট করিলেন। হরলাল কলিকাতা হইতে পিতাকে উইল পরিবর্তন করিয়া আটআনা দিতে পত্র দিলেন, নচেৎ তিনি বিধবা-বিবাহ করিবেন এই ভীতি প্রদর্শন করিলেন। কৃষ্ণকান্ত প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে প্রস্তাবিত বিবাহ করিলে তাঁহার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না। হরলাল বিধবা-বিবাহের সংবাদ দিলে কৃষ্ণকান্ত উইল পরিবর্তনের জন্য মনস্থ করিলেন। ইহাতে হরলাল বাদ পড়িবে, তাহার শিশুপুত্র এক পাই পাইবে। তাহাতে তাহার বখরায় বার্ষিক তিনহাজার টাকার উপরে হইবে। এইস্থান হইতে কাহিনী আবর্ত-সঙ্কুল হইয়া উঠিল।

হরলাল উইল-লেখক ব্রহ্মানন্দ ঘোষের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আগাম পাঁচশত টাকা দিলেন ও একটি জাল উইল প্রস্তুত করাইয়া কৃষ্ণকান্তের নাম সই করিলেন। যে উইল ব্রহ্মানন্দের লিখিত তাহা আনিয়া দিলে তিনি আরও পাঁচশত টাকা পাইবেন। দরিদ্র ব্রহ্মানন্দের লোভ বড়, আবার জেলখানারও ভয় আছে। শেষ পর্যন্ত টাকা তিনি গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু কার্যকালে পিছাইয়া গেলেন। হরলাল ব্রহ্মানন্দের বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী অপূর্ব রূপসী যুবতী রোহিণীর নিকটে যাইয়া অতীতে দুর্বৃত্তদের হস্ত হইতে রক্ষার বিনিময়ে তাহাকে ঋণ পরিশোধের দাবী জানাইলেন। কিন্তু রোহিণী কোনমতে বিশ্বাসঘাতকের কাজ করিতে সম্মত হইল না ; হাজার টাকার বিনিময়েও নহে। চতুর হরলাল তাহাকে বিবাহের প্রলোভন দেখাইলে সে সম্মত হইল।

রাত্রি আটঘটিকায় চতুরা রোহিণী উইল সহি হয় নাই ব্রহ্মানন্দের মনের এই সংশয় কৃষ্ণকান্তকে বলিলে তিনি উইল বাহির করিয়া দেখাইলেন যে তাঁহার দস্তখত হইয়াছে। গভীর নিশীথে রোহিণী নিদ্রিত কৃষ্ণকান্তের উইলটি অপহরণ করিল। হরলালের নিকটে রোহিণী তাহার প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করিতে বলায় সে উত্তর দিল বংশমর্যাদা হেতু যে চুরি করিয়াছে তাহাকে সে কদাপি বিবাহ করিতে পারিবে না। রোহিণীও তাহাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়া বিদায় দিল।

রোহিণী নিত্য জল আনিতে বারুণী পুষ্করিণীতে যায়। কিন্তু সেদিন বসন্তের আতপ্ত বাতাসে কোকিলের কুহুধ্বনিতে ও বারুণী পুষ্করিণীর রমণীয় পরিবেশে রোহিণী চিত্তবৈকল্য হেতু তাহার বালবৈধব্যের যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিয়া এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার অবসানের জন্য কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলাল তাহার দুঃখে ব্যথিত

হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল যে, সে অন্য একদিন উত্তর দিবে, সেদিন নহে। তবে একদিন তাঁহাকে তাহার মনের কথা শুনিতে হইবে। রোহিণী নিত্য ঘাটে যায়, নিত্য কোকিল ডাকে আর নিত্য রূপবান গোবিন্দলালকে প্রত্যক্ষ করে। তাঁহার রূপ রোহিণীর জাগ্রত কামনার অবকাশে মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ও সে প্রণয়াসক্ত হইল। রূপানুরাগের পথ বাহিয়া ইহা ঘটিল। বৈষ্ণব পদকর্তা ইহার পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন, 'সহজে মূরতিখানি বড়ই মাধুরি। মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুরি'। গোবিন্দলালের শুভ-কামনায় রোহিণী আসল উইল পুনর্বার যথাস্থানে রাখিতে যাইয়া ধরা পড়িল। কৃষ্ণকান্ত তাহাকে কয়েদ রাখিলেন। পরদিন এই সংবাদ পরিচারিকা মহলের উত্তেজক আলোচনা হইতে ভ্রমর জানিলেন ও গোবিন্দলালকে জানাইলেন। গোবিন্দলাল রোহিণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য তাহাকে নিজের মহলে আনিলেন। রোহিণী সকল কথা অকপটে জানাইল। সে আরও বলিল তাহার রোগের চিকিৎসা নাই, তাহারও মুক্তি নাই। গোবিন্দলাল তাহাকে বলিলেন যে, উভয়ের সাক্ষাৎ না হওয়া বাঞ্ছনীয়। রোহিণী বড় আনন্দিত হইল। তাহার মনের দুঃখ অপগত হইল। রোহিণী শেষ পর্যন্ত গৃহে আসিয়া দেশত্যাগ না করিবার সঙ্কল্প করিল। কুন্দনন্দিনীর মধ্যেও অনুরূপ সংশয় দেখা দিয়াছিল। রোহিণীর মধ্যে প্রেম-যন্ত্রণা তীব্রতর হইল। তাহার অসহ্য যন্ত্রণা ও অনন্ত সুখ তাহার মনকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল। গোবিন্দলালের মুখে তাঁহার প্রতি রোহিণীর আসক্তির কথা জানিয়া ভ্রমর তাহাকে বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ দিলেন। সন্ধ্যাবেলায় গোবিন্দলাল স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈম-প্রতিমার ন্যায় রোহিণীর সংজ্ঞাহীন দেহকে জলতল হইতে উদ্ধার করিলেন। পরে তাহার অধরযুগলে আপন অধর স্থাপন করিয়া ফুৎকার দিলেন। এই সময়ে বিড়ালকে মারিতে যাইয়া ভ্রমরের লাঠি তাহার কপালে লাগিল। সংজ্ঞাপ্রাপ্তা হইয়া রোহিণী তাহার বেদনার কথা ব্যক্ত করিল যে দারুণ তৃষ্ণায় সম্মুখের শীতল জল পান করিবার উপায় তাহার নাই।

সুতরাং চতুর্দশ হইতে উনবিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত রোহিণী ও গোবিন্দলালের মানসিক দ্বন্দ্ব বর্ণিত হইয়াছে। রোহিণী দেবতার নিকটে তাহার প্রেমবহ্নি নির্বাপনের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছে ও পরে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া তাহার কামনার কথা গোবিন্দলালকে ব্যক্ত করিয়াছে। সে বলিয়াছে :

> রাত্রিদিন দারুণ তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল। কিন্তু ইহজন্মে সে'জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।

ইহার মধ্যে তপশ্চরণের কোন কথা নাই, আছে কামনার দহনজাত পিপাসা,

যে পিপাসা আত্মার নহে, দেহাশ্রিত আকাঙ্ক্ষার। ইহা মধুসূদনের তারার প্রেম-পত্রিকার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়ঃ

কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি!
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি।

গোবিন্দলাল অধিক রাত্রে গৃহে ফিরিয়া ভ্রমরের প্রশ্নে তাঁহাকে সকল কথা দুই বৎসর পরে জানাইবার কথা বলিলেন। ভ্রমরের মন হইতে কালো মেঘখানি নামিল না। গোবিন্দলাল বিষয়কর্মে মনোনিবেশ করিয়া রোহিণীর আকর্ষণ ভুলিবার জন্য মহাল পরিদর্শনের জন্য জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতি লইয়া বন্দরখালি যাত্রা করিলেন। ভ্রমর যাইতে চাহিয়াছিল কিন্তু শাশুড়ী অনুমতি দেন নাই।

বিংশতি হইতে চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদে রটনা কৌশলময়ী, কলঙ্ককলিতকণ্ঠে কুলকামিনীগণের প্রয়াসে, পরিচারিকাগণের ক্লান্তিহীন অপবাদ প্রচারে ভ্রমরের মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। অপরাজিতাতে পদ্মের সমাদর দেখিয়া সকলে ঈর্ষাকাতর ছিল। এইবারে সকলে আনন্দিত চিত্তে সংবাদ দিতে আসিল যে গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি আসক্ত, তাহাকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছেন। 'রোহিণী না পারে এমন কাজই নাই'। সে প্রতিবেশিনীর নিকট হইতে একটি বারাণসী সাড়ী ও একসুট গিলটির গহনা চাহিয়া লইয়া ভ্রমরকে গিয়া দেখাইল। সে নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়া বলিল যে মেজবাবুর অনুগ্রহে সে মাত্র তিন হাজার টাকার গহনা পাইয়াছে। বালিকাসুলভ অভিমানে ও মানসিক চঞ্চলতায় ভ্রমর স্বামীকে কঠোর ভাষায় তাহার মনোভাব জানাইল যে তাঁহার উপরে তাহার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তাঁহার দর্শনে তাহার সুখ নাই। গোবিন্দলাল ব্রহ্মানন্দ ঘোষের চিঠি পাইলেন। তাহাতে রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দানের কথা ভ্রমর কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া তিনি লিখিলেন। গোবিন্দলাল বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন কিন্তু ভ্রমর তৎপূর্বে পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিল। মুক্তবেণীর পরে যুক্তবেণী দেখা যায় না।

পঞ্চবিংশতি হইতে একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু, গোবিন্দলালের মাতার কাশীযাত্রা ও মৃত্যুর পূর্বে কৃষ্ণকান্ত কর্তৃক শেষবার উইল পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করিয়া গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মধ্যে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল। যে সংশয়ের কালো মেঘ একদা ভ্রমরের মনে ছায়া বিস্তার করিয়াছিল তাহা স্ফীত হইয়া উপন্যাসে বর্ণিত একটি পুরুষ ও দুইটি নারীর জীবনকে আচ্ছন্ন করিল।

রোহিণীর প্রতি দুঃখবোধ বাসনায় পরিণত হইল। বর্ষণক্লান্ত একটি দিনে বাগানে বৈঠকখানায় রোহিণীর সঙ্গে তাঁহার যে কথোপকথন হইল তাহাতে তাঁহার রূপমুগ্ধ মনোভাব প্রকাশিত হইল। ইহা ভোগাকাঙ্ক্ষা, রূপ যৌবনের প্রতি প্রমত্ত আকর্ষণ। মৃত্যুর পূর্বে কৃষ্ণকান্ত তাঁহার শেষ উইল পরিবর্তনে গোবিন্দলালের স্থানে ভ্রমরকে অর্ধাংশ দিয়া গেলেন। ভ্রমর আসিল, কিন্তু তখন সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়া গিয়াছে। সে তাহার অপরাধের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিল, সম্পত্তি গোবিন্দলালের পৈতৃক বলিয়া তাঁহাকে লিখিয়া দিতে চাহিল। কিন্তু গোবিন্দলাল তখন সুরূপসী প্রভাতশুক্রতারারূপিনী রোহিণীর ধ্যানে মগ্ন। ভ্রমরকে ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প তিনি জানাইলেন। ভ্রমর বলিল যে আন্তরিক স্নেহের উৎসরূপে তাহাকে খুঁজিতে হইবে, তাঁহাকে কাঁদিতে হইবে, ভ্রমর বলিয়া ডাকিতে হইবে। মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে ভ্রমর সংসারের রুক্ষ মরুভূমিতে পরিত্যক্তা হইল। মাতাকে কাশী লইয়া যাইবার অছিলায় গোবিন্দলাল রূপোন্মাদনা চরিতার্থতায় ভোগের পথেপদার্পণ করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত ছিলেন বিষয়ী ব্যক্তি। তিনি গোবিন্দলালের সংশোধনের জন্য তাঁহাকে ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া গিয়াছিলেন। এই হেতু তিনি উইল পরিবর্তন করিয়াছিলেন। গোবিন্দলালের পক্ষে ইহা ভিন্ন রূপে দেখা দিল। গোবিন্দলালের মাতা সুগৃহিণী হইলে কদাপি পুত্র ও পুত্রবধূর আন্তরিক বিচ্ছেদের দিনে তাঁহার কাশীবাসের ব্যবস্থা করিতেন না। তাঁহার অবিবেচনার মূলে ছিল পুত্রবধূর সম্পত্তি লাভের জন্য ঈর্ষা। সর্বোপরি, রূপলালসামত্ত গোবিন্দলালের আর কোন ধর্মবোধ ছিল না।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম চারিটি পরিচ্ছেদে প্রথম বৎসরের অবসানে ভ্রমরের রোগ-শয্যায় শয়ন ও ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথের ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া যশোহরের অন্তর্গত প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের অবস্থানের ঠিকানা লাভ,ব্রহ্মানন্দকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনুসন্ধান এবং নিশাকরকে লইয়া যাত্রা বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চম হইতে দশম পরিচ্ছেদে প্রসাদপুরের কুঠির ঘটনাবলী দ্রুতগতিতে ধাবিত হইয়া চরমোৎকর্ষে উপনীত হইয়াছে। বিশীর্ণকায়া চিত্রানদীর তীরে প্রসাদপুর স্থানটি নিঃসঙ্গ। এখানে সুশোভিত অট্টালিকায় এক যুবা পুরুষ উপন্যাস পড়িতেছেন আর এক যুবতী ওস্তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া গান করিতেছেন। যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষহেতু যুবকের চিত্তে স্বরসপ্তক সম্পূর্ণতা লাভ করিতেছিল। অকস্মাৎ নিশাকর দাসের প্রবেশে গীত বন্ধ হইল, উপন্যাসও স্খলিত হইল।

নিশাকর রাসবিহারী ছদ্মনামে গোবিন্দলালকে বলিল যে সে তাহার স্ত্রী ভ্রমর-দাসী কর্তৃক পত্তনিদানে ইচ্ছুক কতকগুলি বিষয় লইতে চায়, কিন্তু তাঁহার অনুমতি আবশ্যক। সুদীর্ঘকাল পরে ভ্রমরের নামে গোবিন্দলাল বিমনা হইলেন। পরে তিনি সম্বিত পাইয়া নিশাকরকে বলিলেন যে, বিষয় তাঁহার স্ত্রীর ; তিনি যাহাকে খুসী দিতে পারেন, তাঁহার কোন বিধি নিষেধ নাই। ইহার পরে গান জমিল না, উপন্যাসের অর্থবোধও অসাধ্য হইল। গোবিন্দলাল রুদ্ধগৃহে কাঁদিতে লাগিলেন। হরিদ্রাগ্রামের পথে কাঁটা পড়িয়াছে। নিশাকর গৃহে প্রবেশের পূর্বে রোহিণী, তাহার সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। উভয়ের চক্ষে চক্ষে ভাব-বিনিময় হইয়াছিল। নিশাকরকে রোহিণী অপেক্ষা করিতে সংবাদ দিয়াছিল। চতুর নিশাকর এক ভৃত্যকে দিয়া সংবাদ দিল যে, সে নদীর ধারে বাঁধা ঘাটে অপেক্ষা করিবে ও রাত্রিবেলায় উভয়ের দেখা হওয়া প্রশস্ত। আবার সে অপর ভৃত্য সোনাকে হাত করিয়া গোবিন্দলালকে এই সাক্ষাতের অর্থাৎ রোহিণীর নিশাভি-সারের সংবাদ জানাইল। গোবিন্দলাল অপ্রস্তুত রোহিণীকে লইয়া গৃহে উপস্থিত হইলেন। যে নারীর জন্য তিনি রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য, সম্পদ, ধর্ম, এমনকি ভ্রমরকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন সেই রোহিণী অবিশ্বাসিনী। যে স্বপ্নকে তিনি সত্য মনে করিয়া প্রেমের স্বর্গ রচনা করিয়াছিলেন, অকস্মাৎ বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে তাহা ছিন্ন হইল। রোহিণীও রূপভোগের অতিরিক্ত কিছু পায় নাই, পাইবার যোগ্যতাও তাহার ছিল না, আর গোবিন্দলালের চিত্তে ভ্রমর চিরকালই প্রবলপ্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী। ভ্রমর তখন অপ্রাপনীয়া, কিন্তু রোহিণী অত্যাজ্যা হইলেও তাহার স্থান বাহিরে। রোহিণী অত্যন্ত কাতর-স্বরে তাহার জীবন রক্ষার জন্য আবেদন জানাইল। সে বলিল 'আমার নবীন বয়স, নতুন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না।' কিন্তু গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের জীবনের বিনিময়ে তাহার বাঁচা সম্ভব নহে বলিয়া রোহিণীকে মরিতে হইল। ভৃত্যরা আসিয়া দেখিল যে, বালক-নখর বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ মাটিতে লুটাইতেছে।

দশম হইতে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ছয় বৎসরের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়সমূহে হত্যার জন্য গোবিন্দলালের বিচার ও মুক্তিলাভ, ভ্রমরের মৃত্যুশয্যায় গোবিন্দলালের উপস্থিতি, ভ্রমরের মৃত্যু ও গোবিন্দলালের গৃহত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে।

ভ্রমরের দহন-জ্বালা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মধ্যে শান্তি লাভ করিয়াছে কিন্তু গোবিন্দলালের কোন আশ্রয় নাই। এই অর্থে ভ্রমর সুখী। গোবিন্দলাল যদি

অনুতপ্ত মন লইয়া ভ্রমরের নিকটে দাঁড়াইতেন তবে তিনি তাহার প্রসন্ন হৃদয়ের ঔদার্যের আশ্রয় পাইতেন। কিন্তু পুরুষোচিত অহমিকা, লজ্জা ও ভীতি তাহার অন্তরায় হইয়াছিল। রূপলালসায় তি'ন গৃহত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাকে পাইয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছিল যে, এ মন্দারঘর্ষণ-পীড়িত বাসুকি নিঃশ্বাস নির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরি ভাণ্ড নিঃসৃত সুধা নহে।'

একে একে চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। পঞ্চম বৎসরে বৃন্দাবনে গোবিন্দলাল ধরা পড়িলেন। ভ্রমরের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ব্যথিত মাধবীনাথ যশোহরে গেলেন। তিনি অর্থে সাক্ষীদের বশীভূত করিয়া গোবিন্দলালকে মুক্ত করিলেন। ষষ্ঠ বৎসরে গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকটে অন্নাভাব হেতু অর্থ ভিক্ষা করিয়া এক করুণ পত্র লিখিলেন। ইহার ছত্রে ছত্রে আকুলতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ভ্রমর প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে আসিবার আমন্ত্রণ জানাইয়া লিখিলেন যে, উভয়ের মধ্যে ইহজন্মে আর সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। মর্মাহত গোবিন্দলাল দ্বিতীয় পত্রে মাসিক ভিক্ষা চাহিয়া পাঠাইলেন। ভ্রমর তাঁহাকে পাঁচশত টাকার ব্যবস্থা করিলেন। আর অধিক দিলে 'অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা'। সপ্তম বৎসরের ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত্রি আসিল। এই তিথিটি মহাযাত্রার জন্যে ভ্রমর নির্বাচন করিয়াছিল। মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত গোবিন্দলালের চরণধূলি লইয়া সে প্রার্থনা করিল যেন জন্মান্তরে সে সুখী হয়। উভয়কে লইয়া তাহার কোন প্রার্থনা ছিল না। ক্রন্দনরত গোবিন্দলাল নিঃশব্দে ভ্রমরের হাত হাতে তুলিয়া লইলেন।

ভ্রমরের মৃত্যুর পরে তাহার শয্যাগৃহতলস্থ উদ্যানে গোবিন্দলাল গেলেন। এই নন্দন কাননটির রূপ বিনষ্ট হইয়াছে, সেখানে সকল কিছু জরাজীর্ণ ও ধ্বংস হইয়াছে। এই উদ্যানটি বিধ্বস্ত জীবনের প্রতীক। রোহিণীর হত্যাকারী ও ভ্রমরের জীবন নিঃশেষকারী সর্বরিক্ত গোবিন্দলালের জীবনের বহিঃপ্রকাশরূপে এই উদ্যানটিকে গ্রহণ করা যায়। 'সে বাগানে আর ফুল ফুটে না, ফল ফলে না—বুঝি সুবাতাসও আর বয় না'। উন্মাদগ্রস্ত চিত্তবিকারে গোবিন্দলাল রোহিণীর আহ্বান শুনিতে পাইলেন। পরে জ্যোতির্ময়ী ভ্রমর মূর্তি দেখা দিয়া তাঁহাকে বলিল যে, তাঁহার অপেক্ষাও প্রিয়জন কেহ আছেন যিনি তাঁহার শরণ্য। গোবিন্দলাল গৃহত্যাগ করিলেন। সাত বৎসর পরে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল।

বারো বৎসর পরে অজ্ঞাত বাস পর্ব শেষ করিয়া গোবিন্দলাল ভাগিনের শচীকান্ত নির্মিত মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মন্দির অভ্যন্তরে ছিল ভ্রমরের সুবর্ণ মূর্তি। গোবিন্দলাল সেই মূর্তি দর্শন করিয়া আপনার পরিচয় দান করিলেন ও

শচীকান্তকে আশীর্বাদ করিলেন। ভগবৎ পাদপদ্মে তিনি মনঃস্থাপন করিয়াছেন। তিনিই তাঁহার ভ্রমরাধিক ভ্রমর।

আখ্যান-গঠনে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে কোথাও শিথিলতা বা কোন ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যায় না। কাহিনীকে বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঔপন্যাসিক পরিণতি-পর্ব পর্যন্ত কাহিনীর প্রবাহকে দ্রুতগতিতে, মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে আকর্ষণ করিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষে' মনোলোকের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-প্রবাহ ঘটনা-স্রোতের অনুকূলে হইয়াছে, কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' একটির পর একটি ঘটনা উৎক্ষিপ্ত হইয়া মনোলোকে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে তাহার পরিণাম উপন্যাসে প্রত্যক্ষ করা যায়। ঘটনা-প্রবাহ এমন অনিবার্য বেগে আসিয়া তরঙ্গ-ভঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোন চরিত্র স্থির হইয়া বসিয়া চিন্তা করিবার অবকাশ পায় নাই। প্রধান চরিত্রত্রয়ের ত কথাই নাই। কৃষ্ণকান্তের বারবার উইল পরিবর্তন ও গোবিন্দলালের মাতার কাশীযাত্রা পূর্বোক্ত কথা প্রমাণিত করে। একমাত্র মাধবীনাথ ঘটনার ধারাকে আপন বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন কিন্তু তাহাও এক অনভিপ্রেত ফল সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি তাঁহার কৌশলে গোবিন্দলাল—রোহিণীর জীবনে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন ও জামাতাকে আদালতের বিচার হইতে মুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে পরিণাম সৃষ্টি করিয়াছে তাহার উপরে তাঁহার কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল না।

এই উপন্যাসে নীতির একটি প্রশ্ন দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা শিল্পীর সৃজনী দৃষ্টিকে কোথাও আচ্ছন্ন করে নাই, বাধাও দেয় নাই। লর্ড ডেভিড সিসিলের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'The artist's only conscious duty should be to the truth of his creative vision. Every other consideration must be sacrificed to it'.

নামকরণ

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি গল্প উপন্যাসের নাম নায়িকার নামে চিহ্নিত হইয়াছে। দুইটি উপন্যাসের নাম নায়কের নামে এবং চারিটি উপন্যাসের নাম 'উদ্দেশ্যমূলক অথবা ঘটনাবীজঘটিত'। ডাঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করিয়াছেন, 'গ্রন্থের নামের মধ্যে কাহিনীর যে বীজ উইল-চুরি তাহারই প্রাধান্য স্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত নাটক মৃচ্ছকটিকের নাম অতুলনীয়'।[১] শর্বিলক কর্তৃক অপহরণ ও মদনিকার নিকটে চৌর্যলব্ধ অলঙ্কার-মঞ্জুষা লইয়া আগমন ও আত্মপক্ষ সমর্থন—এই ঘটনার সহিত

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড।

উইল-চুরির কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। আবার শর্বিলকের মধ্যে যে সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আছে তাহা রোহিণীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

ব্যক্তির নামে গ্রন্থের নামকরণ হইলে তাহা সঙ্গত হইত কি না তাহা বিচার্য। গোবিন্দলাল উপন্যাসের নায়ক। রূপপিপাসা হেতু দাম্পত্য জীবনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরে আত্মানুশোচনায় দগ্ধ কামনামলিন জীবনযাত্রা ও তাহার বিষময় পরিণাম উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই হেতু গোবিন্দলালের নামে উপন্যাস নামাঙ্কিত হইতে পারিত। আবার অন্যদিক হইতে বিচার করিলে যেহেতু ভ্রমরের জীবন-কাহিনী এই উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার নামেও নামকরণ অসঙ্গত হইত না। ভ্রমরের দাম্পত্য প্রেমে আছে নিষ্ঠা ও আদর্শবাদ। সে তাহার প্রেমকে পরিবর্তনশীল লৌকিক জগৎ হইতে অধ্যাত্মলোকের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই প্রেম 'bear it out ev'n to the edge of doom'. তাহার প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক মন্তব্য করিয়াছেন, 'রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া; সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া'। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার প্রাক্কালে বেদনাহত ভ্রমর গোবিন্দলালকে বলিয়াছিল যে, তাঁহাকে একদিন তাহার জন্য কাঁদিতে হইবে। 'যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব'। ভ্রমরের কথা ফলিয়াছিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের মৃত্যু-শয্যায় আসিয়াছিলেন। তাহার হাত হাতে লইয়া তিনি কাঁদিয়াছিলেন। সুতরাং ভ্রমর নামকরণ হইলে কাহিনীর দিক হইতে তাহা সঙ্গত হইত। অপরদিকে রূপলাবণ্যবতী রোহিণী তাহার অতৃপ্ত যৌবনকামনা লইয়া গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের দাম্পত্য জীবন বিনষ্ট করিয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রেম অপেক্ষা ছিল পুরুষ-চিত্ত জয় করিবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। এই জিগীষার সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল তাহার অবদমিত, অতৃপ্ত, অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা। রাত্রিদিন তৃষ্ণায় যখন তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল তখন গোবিন্দলালরূপ শীতল যমুনায় সে অবগাহন করিতে চাহিয়াছিল। সে তাহার রূপের মোহ বিস্তীর্ণ করিয়া গোবিন্দলালকে পাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের উপর অধিকার স্থাপন করিতে পারে নাই। তাহার জিগীষাবৃত্তি হেতু সে অন্য পুরুষের উপরে অধিকার স্থাপন করিতে যাইয়া তাহার ও গোবিন্দলালের করুণ পরিণাম ত্বরান্বিত করিয়া আনিল। ক্লিওপেট্রার ন্যায় রোহিণীও গোবিন্দ-লালের জীবনে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিল:

O'er my spirit

Thy full supremacy thou knew'st and that

Thy beck might from the bidding of the Gods
command me.

তাঁহারও ক্ষেত্রে :

How I convey my shame out of thine eyes
By looking back when I have left behind
Stroy'd in dishonour.

তথাপি কোন বিশেষ চরিত্রের নামানুযায়ী গ্রন্থের নামকরণ করিলে তাহা সঙ্গত হইত না। উপন্যাস নিয়ামক নক্ষত্রের ন্যায় কৃষ্ণকান্ত রায় কর্তৃক পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত উইল প্রধান চরিত্রত্রয়ের উপরে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বাহ্য ঘটনা চরিত্রের উপরে কি দূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাহার প্রমাণ আমরা উইল পরিবর্তন হইতে পাই। মানুষের মনোজগৎ বাহ্য ঘটনাবলীর অধীন। ইহারা অনুকুল পরিবেশের সুযোগ লইয়া মানুষের জীবনে এক দুরতিক্রম্য প্রভাব সৃষ্টি করে। কৃষ্ণকান্তের উইল পরিবর্তন যেন বিধিলিপির ন্যায় উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ভাগ্যও পরিবর্তিত করিয়াছে।

প্রথম বারে যখন উইল লিখিত হয় তখন জ্যেষ্ঠপুত্র হরলাল প্রতিবাদ জানাইলেন। গোবিন্দলাল যে তাঁহার পিতার ন্যায্য অংশ পাইবেন ইহা তাঁহার মনঃপূত নহে। জননী ও ভগিনীকে কোন কিছু না দিয়া তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণীরূপে লিখিয়া যাওয়া যথেষ্ট। হরলালের সঙ্গে বাদানুবাদে রুষ্ট কৃষ্ণকান্ত দ্বিতীয়বার উইল পরিবর্তন করিয়া হরলালের ভাগে এক আনা মাত্র দিলেন। হরলাল কলিকাতা হইতে বিধবা-বিবাহের ভীতি প্রদর্শন করিয়া পিতাকে তাঁহার অনুকূলে আট আনা লিখিয়া দিতে জানাইলেন। কৃষ্ণকান্ত অনমনীয় প্রকৃতির মানুষ। তিনি পুরাতন উইল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নূতন উইল প্রণয়নের সিদ্ধান্ত করিলেন। ইহাতে হরলালের ভাগে শূন্য পড়িবে, তবে তাঁহার শিশুপুত্র এক পাই পাইবে। ইহাতে তাহার বখরায় তিন হাজার টাকা হইবে। হরলালের কনিষ্ঠ বিনোদলালের অনুরোধেও কৃষ্ণকান্ত মত পরিবর্তন করিলেন না।

উইল পরিবর্তনের ফলাফল একজন ব্যক্তির জীবনে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইহার পরে এক নূতন দিক উন্মোচিত হইল।

হরলাল ব্রহ্মানন্দ ঘোষকে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে বলিলেন। ব্রহ্মানন্দ প্রথমে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু পরে রাজদ্বারে দণ্ডের ভীতি হেতু পশ্চাদপদ হইলেন। উহার পরে হরলাল ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী যৌবন-সৌন্দর্যে পরিপূর্ণা বিধবা রোহিণীর নিকট যাইয়া তাহাকে এক্ষণ্যা

বিপদ হইতে রক্ষা করিবার দাবীতে কৃতজ্ঞতারূপ ঋণের বিনিময়ে কৃষ্ণকান্তের গৃহে জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিবার জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু রোহিণী অর্থের বিনিময়ে বিশ্বাসহন্ত্রীর কাজ করিতে রাজী হইল না। এইবার হরলাল তাহার সুপ্ত কামনায় আঘাত দিলেন। তাহাকে বিবাহের প্রলোভন দেখাইলে রোহিণী তাহার নিকট হইতে জাল উইলটি রাখিয়া দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হরলাল তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। কেননা কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্রের পক্ষে যে চুরি করিয়াছে তাহাকে বিবাহ করা সম্ভব নহে। সুতরাং হরলালের আপত্তির কারণ বর্ণাশ্রম ধর্মের বিশুদ্ধতা নহে, সামাজিক আভিজাত্যের প্রশ্ন। রোহিণীও দলিতা ফণিনীর ন্যায় হরলালকে দংশন করিল। সে তাহাকে প্রবঞ্চনা ও প্রলোভন দর্শনের জন্য অভিযুক্ত করিয়া বলিল যে, কৃষ্ণকান্তের পুত্র হইয়া সে ইতর বর্বরের পক্ষে অসাধ্য শঠতা ও মিথ্যাচরণ করিয়াছে। তাহার মত ব্যক্তিকে গ্রহণ করে এমন হতভাগিনী কেহ নাই।

উইল পরিবর্তনের একটি দিক দেখা গেল অর্থলুব্ধ হরলাল কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রোহিণীর সুপ্ত প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলে।

বসন্তের কোকিলের কুহুধ্বনি ও বারুণী পুষ্করিণীর তীরে মনোরম উদ্যান উদ্দীপন বিভাবের ন্যায় রোহিণীর মনকে তাহার জীবনের শূন্যতা বোধ সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। সেই কাননে গোবিন্দলালও প্রত্যক্ষ করিলেন ভাস্করকীর্তিকল্প ছায়া, পূর্ণচন্দ্রের ছায়া ও কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া। তাঁহার মন ক্রন্দনরতা রোহিণীর প্রতি সমবেদনায় ব্যথিত হইল। তিনি তাহাকে মনের দুঃখ জানাইবার জন্য অনুরোধ করিলে সে বলিল যে তাহাকে তাহার কথা একদিন শুনিতে হইবে। রোহিণী তাহার জীবনে সমবেদনার আশ্বাস পাইয়া সুখী হইল। নিত্য কোকিলডাকা উদ্যানে রোহিণী নিত্য গোবিন্দলালকে দেখে। সে প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়িল। উইল চুরির ফলে গোবিন্দলালের যে ক্ষতি হইবে তাহাতে রোহিণী বিমর্ষ হইল ও শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকান্তের গৃহে আসল উইল রাখিতে যাইয়া ধরা পড়িল।

পরিচারিকা মহলের সোরগোল হইতে ভ্রমর এবং পরে গোবিন্দলালের কানে কথাটি গেল। পরদুঃখকাতর গোবিন্দলাল তাহাকে রক্ষার জন্য কৃষ্ণকান্তের নিকটে যাইয়া রোহিণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য লইয়া আসিল। সে সকল কথা স্বীকার করিয়া পরিশেষে তাহার মনের অশান্তির কথা জানাইল। গোবিন্দলালের মনে দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল। তিনি উভয়ের মঙ্গলের জন্য তাহাকে দেশত্যাগের কথা বলিলেন। রোহিণীর মনের সকল দুঃখ অপসারিত হইল, আবার দেশে থাকিতে তাহার বাসনা হইল। রোহিণীর এই প্রথম প্রণয় সম্ভাষণে কোন

কুণ্ঠা ছিল না, লাজনম্র মাধুর্যের কোন পরিচয়ও ছিল না। সে তাহার কামনা-সংরক্ত হৃদয়টি প্রসারিত করিয়া রূপতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে চাহিল। গোবিন্দলালের নিকটে ভ্রমর রোহিণীর প্রেমাকাঙ্ক্ষার কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে সন্ধ্যাবেলায় বারুণীর জলে মরিতে নির্দেশ দিল। নিমজ্জিতা রোহিণীকে গোবিন্দলাল কর্তৃক উদ্ধার, তাহার সুধাপরিপূর্ণ মদনমদোন্মাদ মধুর অধরে অধর দিয়া ফুৎকার, সংজ্ঞা-প্রাপ্ত হইয়া রোহিণীর প্রণয়-নিবেদন এবং গোবিন্দলালের মানসিক সংঘাত ও চিত্তজয়ের সঙ্কল্প এবং ভ্রমরের নিকটে রোহিণীর সম্পর্কিত ঘটনা গোপন রাখা—এই সকলই উইলকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত সৃষ্টি করিয়াছে। পরিশেষে রূপতৃষ্ণায় কাতর গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভুলিবার জন্য বন্দরখালি মহলে যাত্রা করিলেন। রোহিণীকে লইয়া গোবিন্দলাল সম্পর্কে যে কুৎসা উঠিল তাহা পল্লবিত নানা শাখা-প্রশাখায় ব্যাপ্ত হইয়া ভ্রমরের কানে উঠিল। রোহিণী ভ্রমরকে অপবাদের মূলে সন্দেহ করিয়া নির্লজ্জার ন্যায় শাড়ী ও গিল্টি করা গহনা গোবিন্দলাল কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়া দেখাইয়া গেল। ভ্রমর তাহার স্বামীকে কঠোর ভাষায় পত্র দিল। সে লিখিল 'এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই'। গোবিন্দলাল গৃহে আসিবার পূর্বে সে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। তিনিও অভিমানবশত, আপনার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। রোহিণীর চিন্তা বাসনায় পরিণত হইল। মহতী বিনষ্টির পথ প্রসারিত হইল।

গোবিন্দলালের পদস্খলনের কথা কৃষ্ণকান্তের কানেও উঠিল। মৃত্যুকালে আবার তিনি উইল পরিবর্তন করিয়া গোবিন্দলালের অর্ধাংশ ভ্রমরকে দিয়া গেলেন। ইহা উভয়ের মধ্যে বন্ধনের শেষ গ্রন্থিটুকু ছিন্ন করিয়া দিল। ভ্রমর রেজেষ্ট্রি করিয়া তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি স্বামীর নামে লিখিয়া দিল। কিন্তু তিনি স্ত্রীর দান গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। আসলে গোবিন্দলালের আহত পৌরুষের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছিল রোহিণীর প্রতি রূপাসক্তি। প্রভাত-শুক্রতারারূপিনী, রূপতরঙ্গিনী, চঞ্চলা রোহিণীতাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল বলিয়া তিনি নয় বৎসরের বিবাহিত জীবনের বধূ সপ্তদশবর্ষীয়া বহুগুণান্বিতা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, আলুলায়িত কুন্তলা ভ্রমরকে ত্যাগ করিলেন। শেষবারে উইল পরিবর্তিত না হইলে গোবিন্দ-লাল স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া রূপলালসায় প্রমত্ত হইবার অবকাশ পাইতেন না। প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায় হয়ত ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ঘটিতে পারিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উইল পরিবর্তন নিয়তির অমোঘ শক্তিরূপে উপন্যাসে ও চরিত্রত্রয়ের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত করিয়াছে।

তত্ত্ব ও উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পর্বের তিনটি উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী ১৮৬৫-১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। এই তিনটি উপন্যাসের আকর্ষণ হইল কাহিনী-বিন্যাসের চাতুর্য। আখ্যায়িকার প্রবাহ পারম্পর্যের বন্ধনে সংহতি লাভ করিয়া পরিণতিতে উপনীত হইয়াছে। ঘটনার দ্রুত আবর্তে বিভিন্ন চরিত্র যে রূপ লাভ করিয়াছে তাহা আমাদের মনে রেখাপাত করে। ১৮৭৩-১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে বিষবৃক্ষ হইতে সুরু করিয়া কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি উপন্যাসসমূহ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের মূলে যে একটি বিশেষ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সুর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসসমূহ ক্রমশঃ জীবন-ভিত্তিক হইয়া পড়ায় রোমান্স সৃষ্টির প্রবণতা সঙ্কুচিত হইয়াছে, কাহিনীর প্রাধান্য হ্রাস পাইয়াছে এবং বিশেষ জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবনের পরিচয়কে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছে। ইহাকে সমালোচক বলিয়াছেন 'an accent in the novelist's voice'.

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে ব্যক্তি কদাপি সমাজ নিরপেক্ষ প্রাধান্য লাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' হইতে যে ধারা সুরু করিলেন তথায় ব্যক্তির মূল্য সমধিকরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্বে চিন্তাশীল মনীষিগণ পাশ্চাত্যে ও আমাদের দেশে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের কথা চিন্তা করিয়াছেন। শকুন্তলার জীবনে দুর্বাসার অভিশাপের তাৎপর্য হইল যে, তিনি সমাজ নিঃসম্পর্কিতভাবে ব্যক্তিমানসকে অগ্রাধিকার দান করিয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্তও সমাজ-শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া মিথ্যাচরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সমাজের স্থান পূর্বে, কেন না ইহার আশ্রয়ে ব্যক্তি-জীবনের বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। চন্দ্রনাথ বসু এই তত্ত্ব তাঁহার শকুন্তলা প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

উপন্যাস রচনা করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী-মন-ব্যক্তি জীবনের ভাব ও ভাবনা এবং কার্যকলাপ উদ্ভূত পরিণামের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। শিল্পীর নিকটে পাপপুণ্য নাই, ধর্মাধর্মের কোন নীতিগত মূল্য নাই। বরং চরিত্রের আসক্তিজনিত পতন ও স্খলন তাঁহার মনকে আকর্ষণ করে। ইহার মধ্যে তিনি সৌন্দর্যের পরিচয় পান। হীরা ও রোহিণীর চরিত্রে ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশী, কেন না তাহাদের মধ্যে আছে এক জটিল রহস্য। সুতরাং ঔপন্যাসিক যদি নীতিবাদীর দৃষ্টি পরিহার

করেন তাহাতে তাঁহাকে দোষারোপ করা চলে না। চরিত্রের সরলতা ও গতানুগতিকতা শিল্পীমনের নিকটে কোন আকর্ষণ সৃষ্টি করে না।[১]

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সে যুগের চিন্তানায়ক। স্বভাবতঃ সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা তিনি বিস্মৃত হননি। তাই তিনি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের সূত্র অনুসন্ধান করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার রচনায় তত্ত্বজিজ্ঞাসারূপে দেখা দিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ-সমালোচনা' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক' যথাক্রমে ১৮৭৬ ও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। যে ভাবমণ্ডলে থাকিয়া তিনি 'বিবিধ প্রবন্ধের' অন্তর্ভুক্ত নানা গুরুতর তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, সেই একই মানসিক পরিমণ্ডলে থাকিয়া তিনি দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসসমূহ রচনা করেন। সুতরাং ধর্মতত্ত্বে ব্যাখ্যাত তত্ত্ব উপন্যাসের জীবন-জিজ্ঞাসায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

'ধর্মতত্ত্বে' গুরু শিষ্যকে বলিয়াছেন যে, তরুণ অবস্থা হইতে তাঁহার মনে যে প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল তাহা হইল 'এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?" এই প্রশ্ন মানব-জীবনের স্বরূপ জিজ্ঞাসা লইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। গুরু তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তর পাইয়াছেন যে, সকল মানবিক বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি। 'মানববৃত্তির উৎকর্ষণই ধর্ম'। বৃত্তিসমূহ নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট হউক তাহাদের উচ্ছেদমাত্র অধর্ম। নিখিল বিশ্বের সর্বাংশই মনুষ্যের বৃত্তিসমূহের অনুকূল। বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনের জন্য ভক্তি ও প্রীতি, উভয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তির পরিণাম হইলেন ঈশ্বর। আর প্রীতি-পরিচয়, স্বদেশ ও বিশ্বকে আশ্রয় করিয়া উৎসারিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর জগৎ হইতে পৃথক হইলেও জগৎ তাঁহাতে আছে। 'তাঁহাকে ভালবাসিলে সকল মনুষ্যকেই ভালবাসিলাম'। মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই, তাই ভক্তি ও প্রীতি অভিন্ন।

দাম্পত্যপ্রীতি জগৎ রক্ষার্থ ও ধর্মাচরণের জন্য অনুশীলন করিলে তাহা নিষ্কাম ধর্মে পরিণত হয়। আর যাহা পাশব বৃত্তি তাহা দমনই অনুশীলন। ধর্মপালনের জন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজ গঠনের জন্য পারিবারিক জীবন একান্ত প্রয়োজন। পারিবারিক প্রীতিরূপ সোপানে আরোহণ করিয়া জাগতিক প্রীতিতে উপনীত হইতে হয়। সমাজ-জীবনের বাহিরে মনুষ্যজীবনের কোন বিকাশ নাই। ইহার ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই। 'সমাজ-ধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্মধ্বংস'।

১। The broad full-faced meaning of the situation may matter less to him. And there is no reason why he should be condemned for looking at life aesthetically, not ethically or politically'. (A Treatise on the Novel: R. Liddell)

যেখানে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ-জীবনের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় সেখানে মানবিক বৃত্তি-সমূহের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাশীল মন উপন্যাসের মধ্যে তত্ত্বের অবতারণা করিয়া মানব-জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শিল্পীমন ব্যক্তিজীবনের জটিল রূপ ও রহস্যের মধ্যে অবগাহন করিয়া আনন্দিত হইয়াছে।

ভ্রমরের দাম্পত্যপ্রেমে পবিত্রতার আদর্শ ও বিশ্বাসনিষ্ঠ আনুগত্য, গোবিন্দলালের মনে রোহিণীর প্রতি সমবেদনা হইতে সৃষ্ট তীব্র আসক্তি এবং রোহিণীর সুপ্তকামনা জাগ্রত হইয়া পুরুষচিত্তে জয়পতাকা উড়াইবার অদম্য আকাঙ্খা ঘটনাবলীর ধারা অনুসরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এখানে জীবনকে বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু অপরদিকে যে রূপলালসা ও অচরিতার্থ প্রবৃত্তির অসংযত প্রয়াস গোবিন্দলাল ও রোহিণীর মধ্যে উদ্দামভাবে দেখা দিল ও সমাজ-নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পারিবারিক জীবনকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল এবং পরিশেষে তাহা ভোগ-প্রমত্তজীবনে আঘাত হানিয়া চরম দুর্যোগ সৃষ্টি করিল তাহার কোন সার্থকতা বঙ্কিচন্দ্রের তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন দেখিতে পায় নাই। 'রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া সৃষ্টিমাত্র'—রমণীর এই রূপ দাম্পত্য প্রেমের বন্ধনের মধ্যে প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু যে প্রেম ভোগে অসংযত ও রূপতৃষ্ণায় প্রগল্‌ভ তাহা 'মন্দার-ঘর্ষণপীড়িতবাসুকি নিঃশ্বাস নির্গত হলাহল'। দাম্পত্য-প্রীতি একমাত্র 'ধন্বন্তরি ভাণ্ড নিঃসৃত সুধা'।

উপন্যাসে কাহিনীর বস্তুনিষ্ঠ ধারা ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসা যদি রসরূপ লাভ করিয়া একাত্মতা লাভ করে তবে সেখানে সৃষ্টির সার্থকতা। তাহা না হইলে লেখকের উদ্দেশ্যমূলক মনোভাব অর্থাৎ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা প্রকট হইয়া পড়ে। ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন কাহিনীর রস পরিণামে যুক্ত না হইলে তাহা প্রশংসার যোগ্য হয় না।

গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের দাম্পত্য জীবনের আনন্দ ও পারস্পরিক নির্ভরতা হরলালের বিধবা-বিবাহের প্রস্তাবে নিঃশব্দ রোহিণীর চিত্তলোক হইতে সুপ্ত কামনার জাগরণ, হরলাল কর্তৃক বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, রোহিণীর প্রতি দয়া ও সমবেদনার সূত্র ধরিয়া গোবিন্দলালের প্রতি তাহার আকর্ষণ, ভ্রমরের কথায় রোহিণীর বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিবার প্রয়াস, গোবিন্দলাল কর্তৃক তাহার উদ্ধার এবং তাঁহার নিকটে তাহার বঞ্চিত হৃদয়ের নিদারুণ তৃষ্ণার কথা নিবেদন, গোবিন্দলালের চিত্তে রূপতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্য আকুলতা এবং আত্মসংযম -মানসে বন্দরখালি যাত্রা, ভ্রমরের উপরে প্রতিশোধের আকাজ্ক্ষায় রোহিণী কর্তৃক

গোবিন্দলাল প্রদত্ত অলঙ্কারাদি প্রদর্শন, স্বামীর নিকট ভ্রমরের অভিমানপ্রসূত অভিযোগ-লিপি প্রেরণ, তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে গোবিন্দলালের অধঃপতন, মৃত্যুর পূর্বে কৃষ্ণকান্ত কর্তৃক নূতন উইল রচনা ও গোবিন্দলালের প্রাপ্য অংশ ভ্রমরকে দান এবং এই অজুহাতে স্ত্রীকে তাঁহার পরিত্যাগ—প্রথম খণ্ডে বর্ণিত ঘটনাবলীকে আশ্রয় করিয়া মানসিক সংঘাতের সূক্ষ্ম ইতিহাস বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সাধ্বী স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রবৃত্তির দাপদাহে গোবিন্দলাল কিভাবে সংসার ত্যাগ করিলেন সেই কাহিনী প্রথম খণ্ডে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যে ভ্রমর তাঁহার শিষ্যা, আশ্রিতা ও কথার ভিখারী তাহাকে বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিয়া রোহিণীর কামনা-সমুদ্রে অবগাহনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ তাঁহার চরিত্রের উদ্দাম ভোগাকাঙ্ক্ষাকে পরিস্ফুট করিয়াছে। কিন্তু কামনার অসংযত লালসা যে শুভকর হইবে না তাহা উপলব্ধি করিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, 'মাটীর ভাণ্ড যেদিন ইচ্ছা সেইদিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব'। ভ্রমর যখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন তখন গোবিন্দলালও কাঁদিতে কাঁদিতে বহির্বাটীতে আসিলেন। যাহা ত্যাগ করিলেন আর তাহা ফিরিয়া পাইবেন না, অকৃত্রিম প্রীতির উদ্বেল প্রকাশ হইতে তিনি বঞ্চিত হইলেন, ইহা তাঁহার মনকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। শিল্পীর নির্লিপ্ত মানস ও গভীর সহানুভূতিবোধ লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্র-সমূহের মানসিক বিচিত্র ধারা বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের পরিণাম লইয়া সংশয় দেখা দিয়াছে যে, তিনি সামাজিক সংহতি রক্ষার মানসে ব্যক্তি চরিত্রের প্রতি সুবিচার করিতে পারিয়াছেন কি না। এই স্থানে বিশেষ উদ্দেশ্যের দিকটি সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। নিশাকরকে দেখিয়া রোহিণীর মুগ্ধ ভাব, তাহার জন্য গোপন অভিসার, গোবিন্দলাল কর্তৃক তাহার হত্যা, বিচারে মুক্তিলাভের পরে ভ্রমরের নিকট তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা ও প্রত্যাখ্যাত হইবার বেদনামিশ্রিত গ্লানি, তাহার মৃত্যুশয্যায় গোবিন্দলালের আগমন ও তাঁহার সংসার ত্যাগ যেন এক তত্ত্ব বা আদর্শসৃষ্টির মনোভাবরূপে উদ্ভূত হইয়াছে।

পাপের চিত্র অঙ্কিত করিবার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের অনীহা ছিল। এই হেতু পরিণামের স্তরগুলি বস্তুনিষ্ঠরূপে উপন্যাসে প্রদর্শিত হয় নাই। তথাপি দেখা যায় যে, ঔপন্যাসিকের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা শিল্প-সৃষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। রোহিণীর কামনা পুরুষচিত্তে জয় পতাকা উড্ডীন করিবার উদ্দেশ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। গোবিন্দ-লালের প্রতি তাহার সত্যকার ভালবাসা কোনদিন ছিল না, তিনিও তাহার মধ্যে নারীস্বভাবের গুণগুলি দেখিতে পান নাই। রোহিণীর মধ্যে তিনি রূপতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রসাদপুর বাটীর উদ্যান, গৃহমধ্যস্থ চিত্ররাজি ও

সঙ্গীত তাঁহার মনে অবসাদের ক্লান্তি পরিস্ফুট করিয়াছে। সুপুরুষ নিশাকরকে দেখিয়া রোহিণীর মনেও তাহাকে জয় করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে। 'জনশূন্য প্রান্তরস্থিত রম্য অট্টালিকায়' ভোগারতির মধ্যে বাস করিয়া রোহিণী উপলব্ধি করিয়াছে যে, সে গোবিন্দলালের চিত্তে স্থান পায় নাই। স্বভাবতঃ হৃদয়ে মর্যাদার আসন লাভ করিতে না পারিয়া তাহার মনের বন্ধন শিথিল হইয়াছে। তাহার কামনা আরও অসংযত হইয়াছে। সুতরাং গোবিন্দলাল ও রোহিণীর পরিণাম শিল্পের ধারাকে অনুসরণ করিয়াছে। এখানে নীতিবাদের প্রাধান্য ঘটে নাই। রোহিণীর হত্যা ঘটনাবলীর অপরিহার্য ধারায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে তত্ত্বের কোন প্রক্ষেপ ঘটে নাই এবং সৌন্দর্যসৃষ্টিও ব্যাহত হয় নাই। ভ্রমরের চিত্তও স্বাভাবিক রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে আদর্শ প্রেমের প্রতীক রূপে অঙ্কিত না করিয়া তাহার পরিণতির দিক বস্তুনিষ্ঠ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও পাপবোধ

মানব-জীবন উপন্যাসের আশ্রয়ভূমি। সুতরাং এখানে ব্যক্তিচরিত্রে পাপ ও পুণ্য উভয়ের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। নীতিগ্রন্থে পুণ্যবানদের জয়গাথা উদগীত হইয়া থাকে। কিন্তু শিল্পীর মন যেহেতু রূপ ও রহস্য অনুসন্ধানের জন্য সদা আগ্রহশীল সেই হেতু তিনি পাপকে নীতিবাদীর দৃষ্টিতে নিন্দা করিতে পারেন না। পাপকে জয় করিয়া কি ভাবে পবিত্র ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় তাহার পরিচয় রূপকাশ্রিত গদ্য-রচনায় অথবা কাব্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। বানিয়ান তাঁহার *Pilgrim's Progress* এবং দান্তে *Divina Comedia*-তে ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দান্তে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া অসংযম, পাশবিক ভাব এবং প্রতারণা প্রভৃতি অনিষ্টকর পাপের প্রতীকরূপে চিতাবাঘ, সিংহ ও নেকড়েকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু সামাজিক উপন্যাস একান্তরূপে বস্তুনিষ্ঠ রচনা। সুতরাং এখানে রূপকারোপের কোন সুযোগ নাই। ঔপন্যাসিককে নির্লিপ্ত মন ও তদ্গত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নরনারীগণের জীবনের আলেখ্য রচনা করিতে হয়। এখানে যেমন সংযত ও ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের পরিচয় পাওয়া যায় আবার দেখা যায় সামাজিক নীতি বিচ্যুত নরনারীগণ হৃদয় বৃত্তির তাড়নায় নীতিধর্মের সামনে নিয়ন্ত্রিত না থাকিতে পারিয়া অসামাজিক প্রেমের আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। যে অবস্থায় তাঁহারা আত্মসংযম হারাইয়াছেন তাহা তাঁহাদের নিকটে সত্য ও শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা আবার মনে তীব্র অনুশোচনা সৃষ্টি

করিয়াছে। শিল্পীর পক্ষে জীবনের এই সত্যকে উপেক্ষা করা চলে না। ফ্লবেয়ের এমা বোভারি যেদিন নায়ক রোদোলফের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন সেইদিন তিনি নূতনভাবে জীবনের আনন্দ ও পরিপূর্ণতাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। বৃক্ষসমূহ হইতে এক অনির্বচনীয় মাধুর্য ক্ষরিত হইতেছে। দূরে অরণ্য ও আরও দূরে পাহাড় হইতে এক শব্দহীন বাণী যেন বাতাস ভরিয়া তুলিল। সঙ্গীতের ন্যায় ইহা তাঁহার দেহে ও মনে সঞ্চারিত হইল। নায়িকার ক্ষেত্রে ইহা প্রেমের স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ আনন্দের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু ভোগতৃপ্ত নায়কের মনের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরে নায়িকা যখন তাঁহাকে লইয়া নূতন জীবন রচনার স্বপ্ন দেখিয়াছেন তখন নায়ক মুক্তির চিন্তা করিযাছেন। বিবাহিতা নারীর পক্ষে এই গোপন প্রেম নীতি বিগর্হিত হইতে পারে কিন্তু ইহার বাস্তব অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। আবার 'গৃহদাহ' উপন্যাসে মিথ্যা সম্মানের মোহে সুরেশের শয্যাগৃহে অচলার প্রবেশ ও পরে তাঁহার গভীর মানসিক সন্তাপ সমাজ বহির্ভূত প্রেমের আর একটি দিক উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।

পাপ সম্পর্কে নৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্ন শিল্পীর মনকে বিড়ম্বিত করে না, কেন না জীবনের রূপ অঙ্কিত করা তাঁহার ধর্ম। নীতিবাদী পাপ ও পুণ্যকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করেন। নীতিভ্রষ্টতা হেতু কার্যাবলী কোন মানুষের সদ্‌গুণাবলী-সমূহকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করিতে পারে, কিন্তু সেই হেতু তাহার সামগ্রিক বিচার করা চলে না। শিল্পী সহানুভূতির আলোকে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন বলিয়া তাঁহার রচনায় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী বড় হইয়া ওঠে। অকটোভিয়াস নৈতিক দৃষ্টিতে আন্‌টনির কার্যকলাপ বিচার করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু লেপিডাস উত্তর দিয়াছিলেন:

> **I must not think there are**
> **Evils enow to darken all his goodness.**

লেপিডাসের মুখে শিল্পীর বক্তব্য উচ্চারিত হইয়াছে।

মঙ্গল ও কল্যাণের ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভোগ-প্রমত্ততা হেতু আত্মকেন্দ্রিকতার সাধনা হইল পাপ। পাপ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। সে যেমন নিজের তেমনি অপরের ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, পাপ জয়স্ফীত হইয়া প্রাধান্য বিস্তার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মকেন্দ্রিকতা ইহার পতন ত্বরান্বিত করে। পাপের মধ্যে ইহার ধ্বংসের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে। যে লেডি ম্যাকবেথ তাঁহার স্তন্যপানরত শিশুকেও হত্যা করিতে পারেন বলিয়া স্বামীকে হত্যাকাণ্ডে প্ররোচিত করিয়াছিলেন, শেষ পর্যন্ত মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফলে

তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছিল, 'naught's had, all's spent'. অমোঘ দণ্ডবিধান হেতু তাঁহার মানসিক ভারসাম্য বিচলিত হইয়াছিল।

পাপ যখন ধ্বংস হয় তখন সৎ ব্যক্তি ও গুণরাজিরও ধ্বংস সাধিত হইয়া থাকে। সৎ আপনার বিলয়ের মাধ্যমে পাপকে জয় করিয়া থাকে। কিন্তু এখানেও একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। হীরা ও রোহিণী, দেবেন্দ্র ও গোবিন্দলাল দণ্ড লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু কুন্দ বা ভ্রমরের জীবনাবসানের ক্ষতিপূরণ কোনদিন হইতে পারিল না।

শুধু শেক্সপীরিয় নাটকাবলীতে নয়, সকল সাহিত্যে দেখা যায় যে, পাপ দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করে না। ইয়াগোর আনন্দ, রেগান-গোনেরিলের জয়লাভ অথবা ক্লডিয়াসের নিরাপত্তাবোধ শেষ পর্যন্ত অটুট থাকে নাই। তাঁহাদের উপরে বিধাতার দণ্ড নামিয়া আসিয়াছিল।

জগৎ ও জীবন নৈতিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইহাকে আঘাত করিলে যে তরঙ্গ-বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তাহা শেষ পর্যন্ত অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় অমঙ্গলকে প্রত্যাঘাত করিয়া থাকে। গ্রীক ও শেক্সপীরিয় নাটকে এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে।

তত্ত্বের পরিচয় নৈতিক হইলেও ইহার ভিত্তি সামঞ্জস্য সূত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সামঞ্জস্যের বিরোধিতা অকল্যাণকে আহ্বান করিয়া আনে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসসমূহে এই সামঞ্জস্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনায় নৈতিক সুর অনেকের মধ্যে শিল্পীর ধর্ম সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর জীবনযাত্রা বর্ণনা করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন 'যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব'। ইহা তত্ত্বজিজ্ঞাসু বঙ্কিমচন্দ্রের পাপ সম্পর্কে মানসিক অনীহাকে ব্যক্ত করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী-মানস ইহার দ্বারা কথঞ্চিত প্রভাবিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, নচেৎ তিনি অপবিত্র ও অদর্শনীয়কে শিল্পের প্রয়োজনে উদ্‌ঘাটিত করিতেন। রোহিণীর সঙ্গীতের প্রয়াস ও চঞ্চল কটাক্ষের ব্যবহার ও পার্শ্ববর্তী কক্ষে গোবিন্দলালের উপন্যাস পাঠের প্রয়াস ও কটাক্ষের তাৎপর্য অনুধাবন উভয়ের সম্ভোগ-তাড়িত জীবনের অবসন্ন দিকটি ব্যক্ত করে। কিন্তু কোন অবস্থায় তাঁহাদের জীবনের মানসিক ক্লান্তি দেখা দিয়াছিল তাহা ব্যাখ্যা না করিলে তাঁহাদের পরিণতির চিত্রটি বিশ্বাসযোগ্য হইয়া ওঠে না। শিল্পীর পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা অথবা ঔদাসীন্য তাঁহার সৃষ্টিকে সার্থক করিয়া তোলে না। যে গভীর সমবেদনার গুণে চরিত্র জীবন্ত হইয়া ওঠে,

যাহাকে রুশীয় উপন্যাস আলোচনা কালে ভার্জিনিয়া উলফ্ বলিয়াছেন 'understanding of the soul and heart', তাহার অভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। তবে পাপের প্রতি তাঁহার যে বীতরাগ তাহা নীতিবোধ-জনিত নহে, জীবনের শ্রেয়োবোধ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। তথাপি ইহা উপন্যাসের ত্রুটি রূপে বিবেচিত হইবে। শিল্পীর মধ্যে পাপ, পুণ্য সম্বন্ধে কোন ভেদ বোধ থাকিবে না। ইমোজেন ও ইয়াগো তাঁহার নিকটে সমান মর্যাদা লাভ করিবে।

বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল

'বিষবৃক্ষ' রচিত হইবার পাঁচ বৎসর পরে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশিত হয়। উভয় গ্রন্থ সামাজিক উপন্যাস ও ইহাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় দাম্পত্যজীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রেমের আবির্ভাব কিভাবে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়া গভীর মনোবেদনা ও অশান্তি জাগাইয়া তোলে তাহা ঔপন্যাসিক বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষে' নানাগুণান্বিত নায়ক নগেন্দ্রনাথ তাঁহার আশ্রিতা বিধবা, রূপসী কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে সংযত রাখিতে পারেন নাই। কুন্দের চিত্তেও শ্রদ্ধাবোধ হইতে প্রেম সঞ্চারিত হয়। সূর্যমুখী পতিপ্রেমের গভীর নিষ্ঠা হেতু উভয়ের বিবাহ দেন ও মানসিক সন্তাপে গৃহত্যাগ করেন। নগেন্দ্রের মনে গভীর অনুশোচনা দেখা যায় ও তাঁহার সহিত কুন্দনন্দিনীর আত্মিক বিচ্ছেদ ঘটে। সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তনে উভয়ের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটে, কিন্তু উপেক্ষিতা কুন্দ আত্মহত্যা করে। নগেন্দ্র-কুন্দের প্রেম দাম্পত্য-জীবনের আদর্শের দিক হইতে নীতিবিগর্হিত মনে হইলেও তাহা সমাজ বহির্ভূত নিষিদ্ধ প্রেম নহে। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' প্রেমের অসামাজিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সেখানে নায়ক সুপুরুষ ও দাম্পত্য প্রেমে অনুরক্ত। কিন্তু বিধবা রমণীর প্রতি সমবেদনার সূত্র ধরিয়া স্ত্রীর অভিমানকে কেন্দ্র করিয়া ও সর্বোপরি রূপসী যুবতীর মুখে গভীর আসক্তির কথা শুনিয়া গোবিন্দলাল রূপপিপাসায় হিতাহিত জ্ঞান হারাইলেন। তিনি দাম্পত্যপ্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া রূপারতির নিমিত্ত প্রসাদপুরে নূতন জীবন সুরু করিলেন। সেখানে দুইজনের জীবনে আত্মিক প্রীতি-বন্ধনের অভাবে অবসাদ দেখা দিল। রোহিণীর চরিত্রে কোন নৈতিক আদর্শ ছিল না, তাই এক রূপবান পুরুষকে দেখিয়া সে প্রলুব্ধ হইল এবং গোবিন্দলালের ভ্রমর-কেন্দ্রিক মন তাহাকে কঠোর দণ্ড দিল। সুতরাং উভয় উপন্যাসে প্রেমের ত্রিভুজাকৃতি জটিল রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

রসজ্ঞ সমালোচকের মতে[১] চিত্রের পূর্ণতায় বিশ্লেষণের গভীরতায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বিষবৃক্ষের' তুলনায় আরও পরিপক্ক ও অনিন্দ্যনীয় কলাকৌশলের পরিচয় দান করিয়াছে। মনস্তত্ত্ব-সঙ্গত চরিত্র বিশ্লেষণের দিক হইতেও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা তিনি করিয়াছেন। প্রথমতঃ, কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রের অনুরাগের সঞ্চার ও ক্রমবর্ধমান অভিব্যক্তি বিশদরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, সূর্যমুখী অপেক্ষা ভ্রমর অধিকতর জীবন্ত। তৃতীয়তঃ, হীরাকে বাদ দিলে 'বিষবৃক্ষে' বাহিরের কোন প্রভাব নাই। অথচ বাঙ্গালীর জীবনে বাহিরের প্রভাব অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবাসীগণের প্রভাব কোনক্রমে অস্বীকার করা চলে না। 'বিষবৃক্ষে' কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্র উপদেশ এবং শান্তি ও সান্ত্বনা দানের জন্য আহুত হইয়াছেন কিন্তু প্রধান চরিত্রত্রয়ের অন্তর্জীবনে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ বিচারযোগ্য। 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর জীবনে প্রেমের সঞ্চার ও ইহার অপ্রতিরোধ্য গতিবেগের স্তরসমূহ বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ঘাটিত করেন নাই। নগেন্দ্রের সৌন্দর্যারতি ও কুন্দের ভক্তি কিরূপে অনুরাগে পরিণত হইয়া উভয়কে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল করিয়া তুলিল সেই ইতিহাস বিশ্লেষিত না হওয়ায় আমাদের তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলালের সমবেদনা প্রবল আসক্তিতে পরিণত হইল এবং রোহিণীর প্রেম-কামনা হরলাল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় গোবিন্দলালের সমবেদনা তাহার হৃদয়কে দুর্নিবার শক্তিতে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিল। ইহা সুচারুরূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে। রোহিণীকে ক্রন্দনরতা দেখিয়া গোবিন্দলালের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার, উইল চুরির লাঞ্ছনা হইতে তাহাকে মুক্তিদান ও জল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া পুনর্জীবন প্রদান রোহিণীর মনে তাঁহার প্রতি গভীর আসক্তি সৃষ্টি করিল। সে অকপটে তাহার রাত্রিদিন যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করিয়া বলিল যে, তাহার সম্মুখে তৃষ্ণা নিবারণের শীতল জল কিন্তু তাহার জলস্পর্শ করিবার কোন উপায় নাই, আশাও নাই। ইহার পরে ধাপে ধাপে তাহাদের প্রবল আসক্তিজনিত সম্ভোগমিলনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তবে উভয় উপন্যাসে ভিন্নতার কারণ হইল যে, 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্র কবি-কল্পনার সুউচ্চ স্থান হইতে জীবন-নাট্যের প্রবাহ ও পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন আর 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তিনি বাস্তব জীবনে নামিয়া আসিয়া বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী জীবনের ক্ষেত্রে প্রসারিত

১। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা: ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

করিয়াছেন। একটিতে ধ্বনিত হইয়াছে লিরিকের সুর, অন্যটিতে বাস্তববাদীর গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা।

সূর্যমুখীর তুলনায় ভ্রমরকে যে অধিকতর জীবন্ত বলিয়া মনে হয় তাহার কারণ আছে। সূর্যমুখী বুদ্ধিমতী, সংযত ও প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী। কুন্দের প্রেমে মিলনোৎসুক নগেন্দ্র আত্মসংযমে অপারগ হইয়া গৃহত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, যেহেতু তিনি স্ত্রীর নিকটে বিশ্বাসহন্তা সেইজন্য তিনি দেশান্তরে যাইবেন। তিনি সূর্যমুখীকে বলিলেন:

> আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আর সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না।

এখানে নগেন্দ্রের মধ্যে চিত্তদমনের অসামর্থ্য হেতু আত্মগ্লানির দিকটি পরিস্ফুট হইয়াছে। স্বামীকে সুখী করিবার জন্য সূর্যমুখী কুন্দের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু পতির প্রেমের গভীরতার দিকটি অবগত ছিলেন বলিয়া তাঁহার গৃহে ফিরিয়া আসিবার পক্ষে কোন বাধা ঘটে নাই। সাময়িক বিচ্ছেদ হেতু যে দুঃখ উভয়ে পাইয়াছিলেন তাহা মিলনের আশ্বাসে দাম্পত্য প্রেমের বন্ধনকে দৃঢ়তর করিয়াছিল। সূর্যমুখী স্বামীর উপরে কোনদিন আস্থা হারান নাই বলিয়া তাঁহাকে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় নাই ও তাঁহার জীবনের মূল্যবোধ আলোড়িত হয় নাই।

ভ্রমর সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকাবধূ। সে রূপসী নহে, কিন্তু সে তাহার গুণে স্বামীর চিত্তকে জয় করিয়াছিল। কিন্তু মায়াবিনী রোহিণীর প্রভাবে গোবিন্দলালের মনে প্রবল রূপলালসা জাগিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, 'এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব'। বন্দরখালি হইতে তাঁহার গৃহে আসিবার সংবাদ পাইয়াও অভিমানিনী ভ্রমরের পিতৃগৃহে যাত্রা, মৃত্যুর প্রাক্কালে কৃষ্ণকান্ত কর্তৃক ভ্রমরকে সম্পত্তির অর্ধাংশ দান ও মাতার কাশীবাসের ইচ্ছা, গোবিন্দলালকে রূপ সেবার অবকাশ সৃষ্টি করিয়া দিল। ভ্রমর যখন তাঁহার স্বামীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন তখন গোবিন্দলাল ধ্যান করিতে-ছিলেন প্রভাত শুক্রতারারূপিণী, রূপতরঙ্গিণী রোহিণীকে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে তিনি ভ্রমরকে বলিলেন, 'আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব'। বিনা অপরাধে সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ ভ্রমরের জীবনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল তাহার প্রভাবে ও নানা ঘটনাবলীর সংঘাতে ভ্রমর-চরিত্র দুঃখ সাধনার মাধ্যমে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সর্বোপরি যে স্বামীকে তিনি দেবতার আসনে স্থাপন করিয়া-

ছিলেন তাঁহার নারীহত্যারূপ পাপ ভ্রমরকে অনাসক্ত ও নিস্পৃহতার দীক্ষা দান করিয়াছিল।

বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবন আত্মীয়তার প্রভাবশূন্য হয় না। কিন্তু 'শতবন্ধন-জাল জটিল সামাজিক জীবনে' ইহার মূল্য সর্বক্ষেত্রে স্বতঃসিদ্ধ নহে। 'বিষবৃক্ষে' সামাজিক জীবনের প্রভাব অত্যন্ত পরিমিত কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তাহা ব্যাপক। নগেন্দ্র জমিদার, সমাজ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে। তিনি শ্রীশচন্দ্রকে একটি পত্রে লিখিয়াছেন:

এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য? যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আমার আবার সমাজচ্যুতি কি?

তাঁহার গৃহে যে আত্মীয়গণ কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায় রাত্রিদিবা কলকল করিত তাহারা তাঁহার ও সূর্যমুখীর কৃপার উপরে নির্ভরশীল। সূর্যমুখী আলোচনা-মুখর মহিলাগণের মধ্যে উপস্থিত হইলে তাহাদের বাজে কথা বন্ধ হইত, অল্প-বয়স্কেরা সকলেই এক একটা কাজ লইয়া বসিত। সূর্যমুখীর সঙ্গে কমলমণির প্রীতির সম্পর্ক থাকিলেও তাহার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। হরদেব ঘোষাল অথবা শ্রীশচন্দ্রের প্রভাব নগেন্দ্রের জীবনে বিশেষ দেখা যায় না। বাহিরের প্রভাবের মধ্যে হীরার কথঞ্চিৎ উপযোগিতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সূর্যমুখী তাহাকে জবাব দিলে সে কর্ত্রীর বিরুদ্ধে কুন্দের প্রতি আচরণ সম্পর্কে নালিশ করিয়া নগেন্দ্রের মনকে রুষ্ট করিয়া বিচ্ছেদের পথ রচনা করিয়াছিল। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' পরিজনবর্গ ও দাসদাসীগণ রোহিণীর সঙ্গে সম্পর্ক লইয়া গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের দাম্পত্য জীবনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত রায় ও হরলালের বাহিরের সমাজের সহিত যোগ ছিল। ক্ষীরি চাকরাণী রোহিণী প্রসঙ্গে ভ্রমরের মনে সংশয়ের বীজ বপন করিল। তাহার পরে পরিচারিকা মহল হইতে কলঙ্ককল্পিত বর্ণনা গৃহের আত্মীয়াদের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া ভ্রমরের জীবনকে দুঃসহ করিয়া তুলিল। রোহিণীও এই মিথ্যা রটনা শুনিয়া ভ্রমরকে দোষী করিল ও দেশত্যাগের পূর্বে ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইবার জন্য তাহাকে গিল্টি করা গহনা গোবিন্দলাল প্রদত্ত বলিয়া দেখাইয়া তাহার মনকে কঠিন করিয়া তুলিল। বাহিরের প্রভাবে বিক্ষুব্ধ ভ্রমর বন্দরখালিতে অবস্থিত স্বামীকে কঠোর ভাষায় পত্র লিখিল, ব্রহ্মানন্দও ভ্রমরকে দোষারোপ করিয়া পত্র দিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন অন্তে ভ্রমরকে না দেখিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। রোহিণীর প্রতি দুঃখ বাসনায় পরিণত হইল। বাগানের বৈঠকখানায় যে কথোপকথন হইল তাহাতে রোহিণী বুঝিয়া গেল যে, গোবিন্দলাল তাহার রূপমুগ্ধ। রোহিণী গোবিন্দ-

লাল সম্পর্কে নানাকথা কৃষ্ণকান্তের কানে ওঠায় তিনি শেষবার উইল পরিবর্তন করিয়া গোবিন্দলালের অর্ধাংশ ভ্রমরকে দিয়া গেলেন। বহিঃশক্তির অমোঘ প্রভাব গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণীর জীবন নাট্যে মর্মান্তিক পরিণাম ত্বরান্বিত করিতে সহায়ক হইয়াছে। সমাজশক্তির প্রতীক মাধবীনাথ তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়া কাহিনীর পরিবর্ধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। সুতরাং এই উপন্যাসে বাহিরের ঘটনা অলঙ্ঘ্য নিয়তির ন্যায় প্রধান চরিত্রত্রয়ের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বাহিরের শক্তি পারিবারিক জীবনের সম্পদ ও সৌভাগ্যকে কিভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে তাহার পরিচয় 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ঘটনা প্রবাহে পরিস্ফুট হইয়াছে।

'বিষবৃক্ষ' উসন্যাস সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিতে রচিত। এখানে বাহিরের শক্তি পাত্র-পাত্রীগণের চরিত্রে কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র মনোলোকে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার দিকটি নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সুখী দাম্পত্য জীবনে নায়ক চরিত্রের রূপমোহ কী বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বঙ্কিমচন্দ্র কবি-মনের গভীর অনুভূতি লইয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বর্ণিত হইয়াছে সমাজ-বহির্ভূত রূপ-লালসার এক প্রগলভ চিত্র। নগেন্দ্র ভোগ-পঙ্কিল জীবনে অবতরণ করেন নাই কিন্তু গোবিন্দলাল পতিগতপ্রাণা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া কামনার পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া তুলিয়াছিলেন। সূর্যমুখীর পক্ষে পতিগৃহে প্রত্যাবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছিল কিন্তু ভ্রমর তাঁহার স্বামীকে কদাপি ক্ষমা করিতে পারে নাই। কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র বস্তুনিষ্ঠ মন লইয়া জীবনধারার প্রবাহ ও পরিণাম বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাহিরের প্রভাবকে দূরে রাখিয়া নরনারীর মনোজীবনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন, আর দ্বিতীয় উপন্যাসে তিনি নামিয়া আসিয়াছেন জীবনের 'ঘোলাগঙ্গাস্রোতে' এবং তথায় তিনি বিশ্লেষণী আলোকে ঘটনা প্রবাহে চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল নরনারীদের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর জীবনে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বাহিরের কোন শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যাইত না, কিন্তু এইরূপ অনিবার্য হৃদয়াবেগ গোবিন্দলাল-রোহিণীর জীবনে হয়ত ছিল না। 'প্রত্যেক মুহূর্তেই মনে হয় যে একটু এদিক ওদিক হইলেই গোবিন্দলালের অধঃপতন নিবারিত হইতে পারিত। 'এই কারণে এই ট্রাজেডি অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া গিয়াছে'।[১]

১। বঙ্কিমচন্দ্র : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

গোবিন্দলালের গৃহত্যাগ পর্যন্ত এই মন্তব্য সত্য। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাসমূহ অনিবার্য ভাবে ঘটিয়াছে এবং তাহা প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং গোবিন্দলাল-রোহিণী ও ভ্রমরের ট্রাজেডিকে লঘু বলা যায় না।

উপন্যাসের পাঠান্তর

'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮২ সালের পৌষ হইতে আরম্ভ করিয়া ফাল্গুন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ইহার পরে সাময়িক বিরতির পরে 'বঙ্গদর্শন' পুনঃ প্রকাশিত হইলে ১২৮৪ সালের বৈশাখ হইতে উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইয়া মাঘে শেষ হয়। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত উপন্যাসের পাঠের সহিত পরিমার্জিত গ্রন্থের পাঠের পার্থক্য কোন কোন স্থানে দেখা যায়। সুতরাং আলোচনার জন্য 'বঙ্গদর্শন' ও সংশোধিত সংস্করণের পাঠের ভিন্নতা দেখান প্রয়োজন।[১]

এই পাঠভেদ ঘটিয়াছে রোহিণীকে লইয়া। সংশোধিত সংস্করণের যে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত পাঠভেদ দেখা যায় তাহাতে উপন্যাসের শিল্পগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

'বঙ্গদর্শনে' রোহিণীর বয়ঃক্রমের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে তাহার বয়স অষ্টবিংশতি বৎসর অতীত হইয়াছিল কিন্তু তাহাকে দেখাইত বিংশতি বৎসর।

সংশোধিত গ্রন্থে রোহিণীর বয়সের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন:

> রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল, শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ।

গ্রন্থমধ্যে গোবিন্দলালের বয়সেরও উল্লেখ করা হয় নাই। তাঁহাকে যুবাপুরুষ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনিও অত্যন্ত সুপুরুষ। তাঁহার বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন:

> গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে গিয়া তাহার পার্শ্বে চম্পকনির্মিত মূর্তিবৎ সেই চম্পকবর্ণ চন্দ্র কিরণে দাঁড়াইলেন।

(বারুণী পুষ্করিণীতীরে গোবিন্দলালের রূপবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন:

> তাঁহার অতি নিবিড় কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজিনির্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে,—কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে।

কুসুমিত বৃক্ষ-লতার উল্লেখ গোবিন্দলালের পূর্ণ যৌবনের ইঙ্গিত দান করে।)

১। বঙ্কিম জীবনী: শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একমাত্র ভ্রমরের বয়সের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। গোবিন্দলাল যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া যান তখন তাহার বয়স সতেরো মাত্র। বিধবা কুন্দনন্দিনীরও এই বয়সের কথা সূর্যমুখী তাঁহার পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

রোহিণীর ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র নানাভাবে তাহার যৌবনশ্রীর বর্ণনা দিয়াছেন। তাহার চালচলনের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে' লিখিত হইয়াছিল যে, সে নির্জলা একাদশী করিত না, মাছ খাইত, বিধবা-বিবাহের হুজুক যখন পাড়ায় উঠিয়াছিল তখন সে বলিয়াছিল, 'পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি' এবং পাড়ার মেয়েরা যেখানে গোপনে গানের মজলিস বসাইত সেখানে সে টপ্পা, পাঁচালি, কীর্তন, কবি গান করিত। 'শুনা গিয়াছে রোহিণী 'ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র' অনেক জানিত। সুতরাং মেয়েমহলে রোহিণীর পশারের সীমা ছিল না'।

সংশোধিত সংস্করণে রোহিণীর পরিচয় এত স্থূল নহে।

রোহিণীর কলসী ভারি, চালচলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতেপেড়ে ধুতি পরা, আরও কাঁধের উপর চারুবিনির্মিতা কালভুজঙ্গিনীতুল্য কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী।...চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল—অমনি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল।

অন্যান্য স্থানেও রোহিণীর রূপের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী-মন যেন রূপোল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছিল। বারুণী পুষ্করিণীতে জলতলে রোহিণীর শায়িত দেহের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন।

স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈম-প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।

গোবিন্দলাল তাহার 'বাত্যাবর্ষবিধৌত' চম্পকের মত দেহকে উদ্ধার করিয়া পালঙ্কে স্থাপন করিলেন। ইহার পরে তিনি 'পক্কবিম্ববিনিন্দিত সুধাপরিপূর্ণ মদনমদোন্মাদ হলাহল—কলসীতুল্য রাঙ্গা রাঙ্গা মধুর অধরে অধর দিয়া ফুৎকার দিলেন'। রোহিণীর কেশদাম 'তরঙ্গক্ষুব্ধ কৃষ্ণতড়াগ-তুল্য'।

রোহিণীর উইল চুরির প্রসঙ্গ 'বঙ্গদর্শনে' অন্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হরলাল যখন ব্রহ্মানন্দের নিকটে প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল তখন রোহিণী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উইল পরিবর্তনের ভার নেয় ও পারিশ্রমিক স্বরূপে এক হাজার টাকা অগ্রিম গ্রহণ করে। এখানে বিধবা-বিবাহের কোন প্রশ্ন নাই। যেভাবে উপযাচিকা হইয়া রোহিণী উইল অপহরণের ভার লইয়াছে তাহাতে তাহার অর্থ-লোলুপতার দিকটি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

কিন্তু সংশোধিত পাঠে দেখা যায় যে, হরলাল তাঁহার পূর্ব উপকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া কৃতজ্ঞতার দাবীতে রোহিণীকে উইল চুরি করিতে বলিয়াছেন।

রোহিণী তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের কাজ করিতে সম্মত নহে। পরে অতি সুকৌশলে হরলাল বিধবা বিবাহের প্রস্তাব করিতে রোহিণী সম্মত হইল। হরলাল ইহার পূর্বে হাজার টাকার পুরস্কার দিতে চাহিলে রোহিণী বলিয়াছিল, 'টাকার প্রত্যাশা করি না'। বঙ্কিমচন্দ্র সংশোধিত সংস্করণে দেখাইতে চাহিয়াছেন হরলাল আসিয়া রোহিণীর অতৃপ্ত সুপ্ত কামনাকে জাগাইয়া তুলিল বটে, কিন্তু পরে আকৃষ্টা রোহিণীকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিল।

'বঙ্গদর্শন' সংস্করণে অপহৃত উইল লইয়া হরলালের সহিত রোহিণীর বিবাদ বাধিল। সে উইল নিজের হাতে রাখিতে চায় বলিয়া উক্তি করিয়াছিল, 'আমিত চিরকাল আপনারই আজ্ঞাকারী'। এখানে বিবাহের কোন প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু সংশোধিত সংস্করণে হরলালের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিয়াছে উইল-চুরি 'আপনারই জন্য। আপনারই জন্য ইহা রহিল'। হরলাল টাকার প্রলোভন দেখাইলে সে উত্তর দিল 'লক্ষ টাকা দিলেও নয়। যাহা দিবে বলিয়াছিলে, তাই চাই'। হরলাল উত্তর দিল, 'যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে গৃহিণী করিতে পারিব না'।

উভয় সংস্করণে গুরুতর পার্থক্য ঘটিয়াছে। প্রথমটিতে দেখা যায় যে, রোহিণী হরলালকে হাতে রাখিতে চায় তাহার স্বার্থসিদ্ধি ও ভোগতৃপ্তির উদ্দেশ্যে। ব্যাপিকা বলিয়া তাহার যে অখ্যাতি ছিল তাহার সহিত তাহার একটি অখ্যাতিও জুটিয়াছিল। এই অখ্যাতি হেতু গোবিন্দলাল 'কুষ্ঠগ্রস্তমন তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন'। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে রোহিণীকে পূর্বের অপবাদ হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। অন্য কারণে নহে হরলালের প্রতি আকর্ষণ এবং বিবাহান্তে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা হেতু সে উইল চুরি করিয়াছিল।

রোহিণীর যে অখ্যাতি ছিল, 'বঙ্গদর্শনে' যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে গোবিন্দলাল তাহাকে বারুণীর ঘাটের রাণায় ক্রন্দনরতা দেখিয়া কদাপি সমবেদনা প্রকাশ করিতেন না। সংশোধিত সংস্করণে গোবিন্দলাল তাহাকে দেখিয়া মনে করিলেন যে, রোহিণী পাড়ার কোন মেয়েছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে। তিনি তাহার ব্যাপিকা সুলভ মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়াছেন। তথাপি তাঁহার মনে 'একটু দুঃখ' দেখা দিল। তিনি তাহাকে তাঁহার ন্যায় 'জগৎপিতার প্রেরিত সংসার-পতঙ্গ' মনে করিয়া ভগিনী-জ্ঞানে তাহার ক্লেশ অপনোদনের কথা ভাবিলেন। তিনি আরও ভাবিয়াছিলেন যে, এই স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, সে সংসারের আবর্তে পড়িয়া দুঃখ পাইতেছে। ইহাতে মনে হয় যে রোহিণী সম্পর্কে বদনামের কিছুটা কানাঘুষো তিনি হয়তো শুনিয়া

থাকিবেন।[১] রোহিণী রূপসী বিধবা, তাহার 'চালচলন ভারি' এবং সে ব্যাপিকা —এই হেতু গোবিন্দলালের মনে অনুমান-নির্ভর সংশয়ের ছায়াপাত ঘটিয়া থাকিতে পারে।

'বঙ্গদর্শন' সংস্করণে বর্ণিত হইয়াছে যে রোহিণী গোবিন্দলালের নিকটে হরলালের নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তির কথা স্বীকার করিয়াছিল। রোহিণী গোবিন্দলালের হস্তে সেই অর্থ দিলে তিনি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সংশোধিত সংস্করণে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উইল চুরির প্রশ্নে সে গোবিন্দলালকে বলিল :

না অনুরোধ করেন নাই—কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই—যাহা ইহজন্মে কখনও পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর মুখে প্রায়শ্চিত্তের কথা শুনিয়া বারুণীর জলে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। আর সংশোধিত সংস্করণে তিনি ভ্রমরের নির্দেশে ভগবৎপাদপদ্মে মনঃস্থাপন করিয়া শান্তি পাইয়াছিলেন। ঈশ্বর ধ্যানে তিনি ভ্রমরাধিক ভ্রমরকে পাইয়াছিলেন।

'বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস'

আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস বলিয়াছেন। তাঁহার এই বক্তব্য বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসত্রয়ের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিয়া বিচার করা যাইতে পারে। 'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস হইলেও এখানে তিনি মানবজীবনের প্রবাহ ও পরিণামকে এক সুউচ্চ কবি-কল্পনার দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর মধ্যে প্রণয়ের তীব্র আবেগ সঞ্চার, স্বামীর সুখের জন্য পতিগতপ্রাণা সূর্যমুখীর উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পাদন ও গৃহত্যাগ, পরিশেষে প্রত্যাবর্তন, অনুতপ্ত নগেন্দ্রের কুন্দনন্দিনীর প্রতি উপেক্ষা ও পতির মঙ্গলের জন্য কুন্দের আত্মহত্যা কার্যকারণ সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ঠ ঘটনার ধারায় বিশ্লেষিত না হইয়া কবিদৃষ্টির অভ্রান্ত আলোকে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাবলী বাস্তব জগতের স্থান ও কাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাস্তবাতিরিক্ত মহিমা লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দের চরিত্রকে এক অনির্বচনীয় গীতি কবিতার সুরে বাঁধিয়াছেন ও তাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবন-পরিণামকে এক সুউচ্চ কল্পনার জগৎ হইতে প্রত্যক্ষ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে

১। উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম : প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত

অবাকপটু কুন্দের মুখরতা, তাহার অতৃপ্ত জীবনের বেদনা জ্ঞাপন, দেবতাজ্ঞানে পতির উপরে তাহার ভক্তি ও তাঁহার সুখের জন্য 'আধিক্লিষ্ট মুখে মন্দ বিদ্যুন্নিন্দিত হাস্য'—জীবনের উপরে দিব্যবিভা বিকীর্ণ করিয়া জীবন স্বরূপের দিকটি ব্যক্ত করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বস্তুনিষ্ঠ ঔপন্যাসিকের ন্যায় বিশ্লেষণের সুযোগ না লইয়া মানবজীবনের নিগূঢ় রহস্যের দিকটি উন্মোচিত করিয়াছেন। টমাস হার্ডিও তাঁহার উপন্যাস সমূহ একই কবি-কল্পনার আলোকে জীবনকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] সেখানে নিয়তি চরিত্রসমূহের কৃত কার্যাবলীর মধ্য হইতে উদ্ভূত না হইয়া এক অদৃশ্য অথচ অমোঘ শক্তিরূপে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। 'বিষবৃক্ষেও' নিয়তি অনুরূপ ভাবে জীবনের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

কবি-কল্পনা আমাদের হৃদয়ের উপরে রূপাতীত মোহের আবেগ সৃষ্টি করিয়া জীবন-সত্যের পরিচয় দান কবিলেও বুদ্ধি-বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে পারে না।

উপন্যাসের আশ্রয় যেখানে বাস্তব-জীবন সেখানে কার্য-কারণ শৃঙ্খলিত ঘটনা-বিন্যাস, সামঞ্জস্যবোধ, সংঘাতের মাধ্যমে চরিত্রসমূহের বিকাশ এবং জীবন সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী অপরিহার্য দাবী লইযা দেখা দেয়।

এক সুখী ও পরস্পরনির্ভর দাম্পত্য জীবনে অতৃপ্ত বাসনা-কাতর সুন্দরী যুবতীর আবির্ভাবে যে ঝটিকাবর্ত সৃষ্ট হইল তাহাই 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' বিষয়। হরলাল স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে রূপসী রোহিণীর মনে সুসুপ্ত কামনাকে জাগাইয়া তুলিল কিন্তু আভিজাত্য মোহে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। ক্রন্দনরতা রোহিণীকে কুহুধ্বনি মুখর বারুণীতটে, বিকশিত পুষ্পোদ্যান হইতে দেখিয়া গোবিন্দলাল তাহার প্রতি সমবেদনায় কাতর হইলেন। বারুণীর জলে ভাস্করকীর্তিকল্প মূর্তি, পূর্ণচন্দ্র ও কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিয়া গোবিন্দলাল সৃষ্টির মূল মর্মবাণী করুণার কথা পাঠ করিলেন ও তাঁহার হৃদয় রোহিণীর প্রতি প্রসারিত করিলেন। রোহিণীর হৃদয়ও সমবেদনার স্পর্শে বিগলিত হইল। নিত্য কোকিল ডাকা পুষ্পবনে বারুণীর তীরে রোহিণী গোবিন্দলালকে নিদর্শন করে ও ইহাতে তাহার হৃদয়ে প্রণয়াসক্তি প্রবল হইয়া উঠিল।

ভ্রমর সুন্দরী নহে, কিন্তু বালিকাবধূ হইয়াও সে তাহার সরলতা, বিশ্বাসযোগ্য

১। Poetry is the constant attendant of Hardy's tragic Characters. It is not an intellectual poetry like Meredith's, it is much more primitive and magical and always it heightens the significance of the characters.

(The English Novel : Walter Allen)

নির্ভরতা ও নিষ্ঠার গুণে গোবিন্দলালের হৃদয়কে জয় করিয়াছিল। কিন্তু যে রূপতৃষ্ণা গোবিন্দলালের মনে অতৃপ্ত ছিল সুন্দরী কুহকিনী রোহিণীর সংস্পর্শে আসিয়া তাহা যেন—জ্বলিয়া উঠিল। গোবিন্দলালকে দেখিয়া রোহিণী প্রণয়াসক্ত হইল বটে কিন্তু ইহার পশ্চাতে কোন তপস্যা ছিল না, ছিল না আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষা। পুরুষচিত্ত জয় করিবার দুর্নিবার ইচ্ছা তাহাকে প্রণোদিত করিয়াছিল। এই জিগীষাবৃত্তি বাসনার রূপ ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালও যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহা প্রেমের জন্য নহে, রূপাসক্তির লালসায়। উভয়ের উক্তি হইতে এই দুই বিপরীত মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। উইল পুনর্বার রাখিতে যাইয়া রোহিণী ধরা পড়িলে গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাহাকে অন্তঃপুরে আনিলেন। সে মনে মনে বলিল 'আমিত মরিতে বসিয়াছি। কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব'। এই পরীক্ষার সঙ্কল্প তাহার জিগীষাবৃত্তির পরিচায়ক। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পরে অশ্রু-বিপ্লুতা, পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা ভ্রমরকে দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিলেন 'এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব'।

গোবিন্দলাল-ভ্রমরের দাম্পত্য বন্ধনের অবসান ও গোবিন্দলাল-রোহিণীর আসক্তিবৃদ্ধি কতকগুলি বহির্ঘটনার সহায়তায় ঘটিয়াছিল। অনুকুল প্রকৃতি পরিবেশ ও ঘটনাবলীর আনুকূল্য ব্যতীত তিনটি চরিত্রের পরিণাম এমন দ্রুতবেগে ঘটিতে পারিত না।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের একস্থানে রোহিণী প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, 'মনুষ্য বড়ই পরাধীন'। বাহিরের ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। বারুণী পুষ্করিণীর তীর, পুষ্পশোভিত উদ্যান এবং কোকিলের কুহুধ্বনি গোবিন্দলাল-রোহিণীর জীবনে প্রণয়াসক্তির উদ্দীপন-বিভাবের ন্যায় কাজ করিয়াছে। এখানে গোবিন্দলালের সহানুভূতি রোহিণীর মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল ও আবার জল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবার পরে সে অকপটে তাহার দারুণ তৃষ্ণা ও সম্মুখস্থ অপ্রাপণীয় শীতল জলের কথা জানাইয়াছিল। গোবিন্দলালের চিত্তে সংঘাত দেখা দিল। তাঁহার আত্মজয়ের সঙ্কল্প অন্তরের আলোড়নকে ব্যক্ত করে। প্রকৃতি যেন এক অলজ্ঘ্য শক্তিরূপে উভয়কে আকর্ষণ করিয়াছে। টমাস হার্ডিও তাঁহার *The Return of the Native* উপন্যাসে Egdon Health-এর গভীর শক্তি ও মানবজীবনের তুচ্ছতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতির প্রভাব এখানে অপ্রতিরোধ্য শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে। [বঙ্কিমচন্দ্রও বারুণীকে সজীব মূর্তিতে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহা

অজ্ঞাতসারে প্রণয়বৃত্তির বিকাশে সহায়ক হইয়াছে ও গোবিন্দলালের দুঃখ হইতে বাসনার রূপান্তরে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। বার বার উইল পরিবর্তন যেন উপন্যাসবর্ণিত তিনটি চরিত্রের ভাগ্য পরিবর্তন বিধিলিপির ন্যায় সাধিত করিয়াছে। তিনটি ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া পূর্বোক্ত চরিত্রত্রয়ের পরিণাম নির্দিষ্ট হইয়াছে। এইগুলি যথাক্রমে হইল অভিমানবশতঃ ভ্রমরের পিত্রালয়ে গমন, কৃষ্ণকান্ত রায়ের শেষবার উইল পরিবর্তন ও মৃত্যু ও গোবিন্দলালের মাতার কাশীযাত্রা। ইহাদের মধ্যে শেষের দুইটি ঘটনা যে অবস্থা সৃষ্টি করিল তাহাতে ভ্রমরের সহিত গোবিন্দলালের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল। কৃষ্ণকান্ত জীবিত থাকিতে ভ্রমরের অনুপস্থিতিতে অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণহেতু গোবিন্দলালের অধঃপতন ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার সমাজ-ভীতি আর রহিল না। মাতার কাশীবাস উভয়কে ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের প্রলোভনে প্রসাদপুরে আকর্ষণ করিল।

প্রথম খণ্ডের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে রোহিণী প্রেমবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা জানাইয়াছে। আবার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে গোবিন্দলালও ঈশ্বরের নিকটে আত্মজয়ের জন্য শক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহার পর হইতে ঘটনার পর ঘটনা আসিয়া গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণীর জীবনে যে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গপ্রবাহ সৃষ্টি করিল তাহাতে তাঁহারা জীবনের আশ্রয় হইতে বিক্ষিপ্ত হইলেন। বন্দরখালিতে গোবিন্দ-লালের যাত্রার পর হইতে যে ঘটনাসমূহ ঘটিল তাহা যেন নিয়তিনির্দিষ্ট। যেন এক অদৃশ্য শক্তি আসিয়া জীবনের গ্রন্থিসমূহ নির্মম হস্তে ছেদন করিয়া দিল। অভিমানবশে প্রেমাদর্শের অবমাননায় ভ্রমরের পিতৃগৃহে গমন, গোবিন্দলালের ক্ষুদ্র রোগের উপশম হেতু বিষ প্রয়োগ অর্থাৎ রোহিণীর প্রতি আসক্তি, উইল পরিবর্তন ও কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু, গোবিন্দলাল জননীর কাশীযাত্রা—এই সকল ঘটনা অনিবার্য প্রতিক্রিয়া চরিত্রসমূহের পরিণতির পথ নির্দিষ্ট করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বস্তুনিষ্ঠ মন লইয়া জীবনের গতি-প্রবাহের পরিচয় দিয়াছেন এবং পরিণামের চিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়াও তাঁহার বিশ্লেষণমুখী মনোভাব কোন আদর্শনিষ্ঠতা হেতু পরিত্যাগ করেন নাই। রোহিণীর মৃত্যু ও গোবিন্দলালের ভ্রমরাধিক ভ্রমর লাভ শিল্পের নিয়মে ঘটিয়াছে, কোন নৈতিক আদর্শ ঔপন্যাসিকের ধর্মকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। ঔপন্যাসিকরূপে, মানব-সমাজের এবং ব্যক্তি-জীবনের কল্যাণবাদই তাঁর নিজস্ব বিশেষত্ব। 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পর্যন্ত এই অনুভূতিই প্রধান।[১] এই অনুভূতি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন জিজ্ঞাসার পরিচায়ক, কিন্তু উপন্যাসে

১। বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ : ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র।

সেইহেতু তিনি শিল্পীর ধর্ম ত্যাগ করিয়া আদর্শবাদকে প্রাধান্য দেন নাই। 'বিষবৃক্ষ' কবি-কল্পনায় সুষমামণ্ডিত, কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' দাম্পত্যজীবনের অবসান, ইন্দ্রিয়ের ভোগতপ্ত রূপারতি এবং 'সৌন্দর্যবর্জ্জিত হৃদয়-জ্বালা' বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষের' রস সেদিনকার পাঠকগণ উপভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পালার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে না। অথচ বিষবৃক্ষের চাষ পূর্বেও হইত, একালেও হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে বিষবৃক্ষ সকল মানুষের গৃহ-প্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহারা বীজ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রূপাসক্তি কাহিনীর মধ্যে জটিল আবর্ত রচনা করিয়াছে আর চোখের বালিতে রাজলক্ষ্মীর অধিকার স্খলিত হইবার আশঙ্কাজনিত ঈর্ষা এবং বিনোদিনীর সংসারে বঞ্চনালাভের জ্বালা, কাহিনীর মধ্যে বেগ সঞ্চারিত করিয়াছে। ইহাদের প্রতিক্রিয়া প্রবৃত্তি-চালিত ও আশ্রয় নির্ভর মহেন্দ্রের জীবনে অসংযত কামনার রিপুকে কুৎসিতভাবে প্রকাশিত হইবার সুযোগ দিয়াছে।

বিহারীকে লিখিত দাম্পত্য সম্পর্কিত মহেন্দ্রের চিঠি বিনোদিনীর মনে জ্বালা সৃষ্টি করিয়াছিল। পরে আশার মুখে নবপ্রেমের ইতিহাস তাঁহার ক্ষুধিত-হৃদয়কে উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। বিহারী তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিয়াছেন যে এই অগ্নিশিখা গৃহের মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিতে পারে, আবার দাবানলও সৃষ্টি করিতে পারে। মহেন্দ্রের মনে প্রথমে যে বিরূপতা ছিল তাহা বিনোদিনীর রূপ ও বুদ্ধির দীপ্তিতে কাটিয়া গেল। আশার প্রতি বিহারীর শ্রদ্ধামিশ্রিত নীরব ও নম্র ভালবাসা, কোনদিনই বাহিরের কথাবার্তায় বা আচরণে ব্যক্ত হয় নাই। কিন্তু বিনোদিনীর দৃষ্টিতে ইহা ধরা পড়ে। দমদমের বাগানে চড়ি-ভাতি করিতে যাইয়া বিহারী বিনোদিনীকে নূতন ভাবে আবিষ্কার করিলেন। বাহিরে বিনোদিনী বিলাসিনী যুবতী, রঙ্গপ্রিয়া কিন্তু তাহার অন্তরে পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে। 'প্রকৃত—আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন; অবস্থাবিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া ওঠে সংসারের কাছে সেইটেই সত্য'। বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর শ্রদ্ধা যত বাড়িতে লাগিল, মহেন্দ্র ততই ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলিতে লাগিলেন। বিনোদিনী মহেন্দ্রের উপরে অধিকার স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন ভালবাসার জন্য নহে, আশার প্রতি ঈর্ষা-হেতু ও বিহারীকে পাইবার আশায়। যে মহেন্দ্রে তাহাকে সার্থকতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে তাঁহার প্রতি তাঁহার মনোভাব ছিল ঈর্ষা ও প্রেমের মিশ্রণ। তাহাকে কেহ ভালবাসে না,

ভালবাসে লজ্জাবতী ননির পুতুল আশাকে। মহেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হইয়া সংসারে দুঃখের ঝড় সৃষ্টি করিল। রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে মায়াবিণী বলিয়া মহেন্দ্রের ক্ষতির জন্য দোষারোপ করিলে সেও তাঁহার সম্মুখে মহেন্দ্রের মনে সুপ্ত পৌরুষকে জাগাইয়া তুলিল। বিনোদিনী তাঁহার সঙ্গে যাইতে, নূতন করিয়া সংসার রচনা করিতে সম্মত হইল। আসলে বিনোদিনী মহেন্দ্রকে ভালবাসিতে পারে নাই, কারণ দেখিয়াছে যে তাঁহার চরিত্রে বলিষ্ঠতা নাই, সংযম নাই, আছে প্রেমের ভিক্ষুকবৃত্তি। বিনোদিনী আশা-মহেন্দ্রের সংসারে যে অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ভালবাসিলে ঘটিতে পারিত না। বিহারী চিরকালই মহেন্দ্রের ছায়ার ন্যায় তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু রাত্রিবেলায় যেদিন তাঁহার গৃহে বিনোদিনী প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে গভীর প্রেম নিবেদন করিল সেইদিন বিহারী জাগরণের মধ্যে যেন নিজেকে নূতনভাবে খুঁজিয়া পাইলেন। বিনোদিনীর প্রেম বিহারীর মনে আশ্রয় না পাইলেও সেই স্মৃতি তাহাকে মহেন্দ্রের কামনা হইতে আত্মরক্ষার উপায় করিয়া দিল। কিন্তু এত করিয়াও বিহারীকে পাইবার উপায় নাই। বিনোদিনীর 'হৃদয় রক্তে ভাসিয়া গেল, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট সূচ্যগ্র পরিমাণ সরিয়া বসিল না।' বিহারী যখন তাহাকে পাইবার জন্য হৃদয় প্রসারিত করিলেন তখন সে বৈরাগ্যের ধূসর আবরণে নিজেকে আবৃত করিয়া বৈরাগ্যের পথ গ্রহণ করিল।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বহির্ঘটনাবলীর প্রভাবকে প্রাধান্য দেন নাই। তিনি প্রতিটি চরিত্রের মনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার মানসিক সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া, রহস্যময় ভাব ও রূপকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উপন্যাসের মধ্যে যে মন্থরতা সৃষ্ট হইয়াছে তাহা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। তথাপি গ্রন্থের উপসংহার আদর্শের সুরে সমাপ্ত হইয়াছে। বিনোদিনী লৌকিক প্রেমের ঊর্ধ্বে উঠিয়া আধ্যাত্মিক ভাবের বর্ণে তাহার প্রেম-বিবশ চিত্তকে রঞ্জিত করিয়াছে।

> আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে—আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রসন্ন। আজও তুমি তাই থাকো—আমিও দূরে থাকিয়া তোমার কর্ম করি।

আদর্শবাদের এই সুর উপন্যাসের বাস্তব-প্রতিষ্ঠাকে ভিন্ন এক জগতে আকর্ষণ করিয়াছে। বিহারী চরিত্রও এক ভোগবিমুখ রোমান্সসুলভ আদর্শের প্রভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। উপন্যাসের পরিণতি বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদে প্রভাবিত হইয়াছে।

'চোখের বালি' যদিও নির্মম সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ও ইহার চরিত্রসমূহ মনের

কারখানা ঘরে দৃঢ় ধাতুর মূর্তিতে জাগিয়া উঠিয়াছে, তথাপি রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য তাঁহার উপন্যাস সম্পর্কে নিঃসংশয়ে বলা যায় না। পরিণতি দুর্বল হওয়ায় দৃঢ় ধাতুর মূর্তি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা ও পরবর্তী উপন্যাসসমূহের দিগদর্শনস্বরূপ। উপন্যাসের মধ্যে আদর্শবাদের পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে কাহিনী বা চরিত্রের পরিণাম আদৌ প্রভাবিত হয় নাই। আদর্শবাদের একটি দিক হইল পরমদুঃখের দিনে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী কেদার বাবুর মুখে, নিষ্ঠাপরায়ণা, সেবাব্রতা ও আত্মসুখ বিসর্জনকারী মৃণালকে দেখিয়া সম্প্রদায়ভিত্তিক, বৃহৎ জন-সমাজ বিচ্যুত ব্রাহ্মধর্মের অনুপযোগিতা সম্পর্কে সংশয়, তাঁহাদের প্রচারের মধ্যে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অনুদার মনোভাব ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম-প্রচারকদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া তাঁহাদের দেশের গৌরব-হ্রাসের প্রয়াস এবং ধর্ম যে দল বাঁধিয়া মতলব আঁটিয়া পাওয়া যায় না সে সম্পর্কে তাঁহার সুস্পষ্ট প্রত্যয়। কেদার বসু সেবাপরায়ণা মৃণালের মাধ্যমে বিরাট ও বিপুল হিন্দু সমাজকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও তিনি ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক উপযোগিতার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। 'বস্তুতঃ বিদেশী বিধর্মীর হাতে আমাদের মত বিভীষণ আর ত কেউ নেই'— তাঁহার এই উক্তি অত্যন্ত অসত্য। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের চরিত্র ও কার্যকলাপ ইহার বিপরীত দিক প্রমাণিত করিবে। ধর্ম-সাধনা যে ব্যক্তির উপলব্ধির বিষয় সে-সম্পর্কে তাঁহারা অনবহিত ছিলেন না। কেদারবাবুর মনের চিন্তা একদিকে মৃণালের সেবাধর্ম ও অপরদিকে অচলার কার্যকে কেন্দ্র করিয়া বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি মৃণালের মুখে পথ-নির্দেশ লাভ করিলেন যে ক্ষমার ফল অপরাধী এক-মাত্র পায় না, ক্ষমা যিনি করেন তিনিও সুকৃতির অংশ লাভ করেন। তখন তাঁহার মনের মেঘ কাটিয়া গেল। তিনি যেন নূতন পথের সন্ধান পাইলেন।

আদর্শবাদের দ্বিতীয় দিকটি হইল মৃণালের মুখে সামাজিক বিধানে সম্পাদিত বিবাহের তুলনায় শাস্ত্রসম্মত হিন্দু বিবাহের উৎকর্ষের কথা প্রচার। হিন্দু বিবাহ ধর্ম, তাই স্বামী, স্ত্রীর নিকটে তাহা জীবনে ও মরণে নিত্য। যে স্ত্রী স্বামীকে ধর্ম-স্বরূপ অন্তরে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, পরীক্ষার চোরাবালিতে তাঁহার নিমজ্জন অবশ্যম্ভাবী। এই আলোকে বিচার করিলে দেখা যায় যে অচলা অন্তরকে তুচ্ছ ভাবিয়া, কারাগার মনে করিয়া বাহিরের জগৎকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন। এই হেতু বাহিরের সম্ভ্রমের খোলসকে আশ্রয় করিয়া তিনি সর্বনাশের অতলে ডুবিয়া গেলেন। মৃণালের জীবনে প্রেমের কোন অবকাশ ছিল না। সেবাব্রতে তাঁহার

জীবন উৎসর্গীকৃতা। কোন অগ্নিপরীক্ষার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। কিন্তু অচলার জীবনে যে সঙ্কট বারে বারে দেখা দিয়াছে, ধনী সুরেশের প্রতি পিতার পক্ষপাতিত্বে, বিবাহের পর পল্লীগৃহে সুরেশের উপস্থিতিতে, অসুস্থ মহিমকে সুরেশের গৃহে সেবা কালে তাঁহার আন্তরিক স্নেহের কথার কদর্থ করিয়া স্বামীর নিকট হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার দুঃসাহসিকতায় ও ঝড়-জলের রাত্রিতে সুরেশের শয়নগৃহে তাহার আত্মহত্যায়, এই সকল ঘটনা তাঁহার জীবনে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে মসীলিপ্ত করিয়া একাকার করিয়া দিয়াছে। অচলার যে পরিণামচিত্র সুরেশের মৃত্যুর পরে অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার জীবনে গতি নাই, প্রকৃতি নাই, রঙ ও মূর্তি নাই, ইহা তাঁহার ক্ষত লাঞ্ছিত জীবনের মর্মান্তিক ইতিহাস। ইহার জন্য অচলার সমাজ স্বাধীনতার পরিবেশকে বা সামাজিক বিধান-সম্মত বিবাহকে দায়ী করিলে জীবন-রহস্যের সদুত্তর পাওয়া যাইবে না। শাস্ত্রসম্মত বিবাহ হইলেও এই সঙ্কট দেখা দিত। শরৎচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যে যে ধর্ম ও সতীত্বের' প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন তাহার বিচার তিনি মতবাদের বাহিরে আসিয়া বস্তুনিষ্ঠভাবে চরিত্রসমূহের দিক হইতে নির্ধারণ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। অচলা সুরেশের নিকটে বিশেষ অবস্থায় আত্মসমর্পণ করিলেও মনের দিক হইতে তিনি শুচি ও সতী। ডিহরি প্রবাসের দিনগুলি যেভাবে তাহার কাটিয়াছে সেই পরম বেদনা ও বৈরাগ্যের মধ্যে তাহার চরিত্রের মহিমা অত্যুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অচলা চরিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়া শরৎচন্দ্র যে নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও গভীর সহানুভূতিবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। এই জাতীয় মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথ, রোহিণী বা বিনোদিনী চরিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়া দেখাইতে পারেন নাই।

সুরেশ আবেগসর্বস্ব, প্রবৃত্তিচালিত যুবক এবং মহিম সংযত, আত্মনিষ্ঠ ও মিতবাক্। এই দুই চরিত্র বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। তাঁহারা ব্যক্তিরূপে উদ্ভাসিত না হইয়া বিশিষ্ট চরিত্ররূপে পরিস্ফুট হইয়াছেন। ইঁহাদের চরিত্রের পরিচয় শরৎচন্দ্র আংশিকরূপে দেওয়ায় আমাদের মনে নানা প্রশ্ন থাকিয়া যায়। মহিম তাঁহার চরিত্রের চতুর্দিকে এমন এক রহস্যের জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন যাহার ফলে তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণরূপে আমরা পাই না। সুরেশের ভোগ-লোলুপতার অন্তরালে যে বৈরাগ্য-প্রবণ মন ছিল যাহার পরিচয় তাঁহার জীবন বিপন্ন করিয়া বারংবার পরোপকারবৃত্তি ও অবশেষে আত্মদানের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে ইহা তাঁহাকে আত্ম-সমীক্ষার অবকাশ পূর্বে কেন দেয় নাই তাহাও বিস্ময়ের বিষয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' কাহিনী-বিন্যাসে ও চরিত্র সৃষ্টিতে বস্তুনিষ্ঠার অভাবগত কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। এই হেতু এই উপন্যাসকে শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাসরূপে গ্রহণ করিতে কোন বাধা ঘটে না।

তুলনামূলক আলোচনা

ফ্লবেরের 'মাদাম বোভারি' (১৮৫৭), টমাস হার্ডির 'দি রিটার্ন অব দি নেটিভ' (১৮৭৮) ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)—এই উপন্যাস ত্রয়ে সমাজবহির্ভূত প্রেমের চিত্র ও করুণাত্মক পরিণাম বর্ণিত হওয়ায় তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ আছে। ফ্লবের ও হার্ডি উভয়ে তাঁহাদের নায়িকা এমা ও ইউসটাসিয়া ভাইকেকে রোমান্টিক ও প্রেম-পিপাসু নারীরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। রোহিণীর চরিত্রে রোমান্টিক স্বপ্নের পরিচয় না থাকিলেও তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা বসন্তের আতপ্ত নিশ্বাসে, নিসর্গের সুরভিত প্রফুল্লতায় ও প্রেমাস্পদের সহানুভূতির স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে তাহার হৃদয়বৃত্তিকে প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ঈশ্বরের নিকট সে প্রার্থনা জানাইয়াছিল 'আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না'। কিন্তু 'স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয়—থামিল না'। হরলাল তাহার চিত্তের কামনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। রূপযৌবনবতী রোহিণী তথায় প্রত্যাখ্যাতা হইয়া যখন গোবিন্দলালের নিকট সহানুভূতি লাভ করিল ও প্রত্যহ বারুণীতীরের কুহুধ্বনি-মুখর পুষ্পবনে তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ পাইল তখন তাহার হৃদয় অসহ্য যন্ত্রণা ও অনন্ত সুখে পরিপূর্ণ হইল। শার্ল বোভারি তাঁহার পরিণীতা স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার স্বপ্ন ও কামনাকে তৃপ্ত করিতে পারেন নাই। যে রোমান্টিক কল্পনা এমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত তাহা চরিতার্থ করিবার মত মন ও অবকাশ তাঁহার ছিল না। শার্ল স্ত্রীর মনোবেদনার সংবাদ রাখিতেন না, ইহাও ছিল এমার স্বামীর প্রতি আনুগত্যের অভাবের কারণ। আবার ইন্দ্রিয় কামনা, অর্থলোভ ও অচরিতার্থতার বেদনা তাঁহার মনকে অস্থির করিয়া তুলিত। লেওঁ প্রথম পর্যায়ে তাঁহার ভীরু প্রেমকে তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। প্রেমিকের চলিয়া যাইবার বেদনা প্রকাশ হইয়াছে নিসর্গের একটি চিত্রের মাধ্যমে। **'Still the river flowed, rippling slowly beneath the muddy bank'.** এমা কতবার লেওঁর নিকটে আত্মসমর্পনের কথা ভাবিয়াছেন, কিন্তু দুর্বলতা হেতু পারেন নাই। এইবার তাঁহার জীবনে আবির্ভূত হইলেন দ্বিতীয় নায়ক রোদোলফ। এমাকে লাভ করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প। যেদিন ক্ষুদ্র এক জলাশয় তীরে

তীরে এমা আত্মসমর্পণ করিলেন সেদিন তাঁহার জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। হৃদয় তাঁহার নিসর্গের আনন্দের সহিত একাত্মতা লাভ করিল।১

বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। তিনি গোবিন্দলাল ও রোহিণীর রূপতৃষ্ণা-জনিত মিলনকে অধঃপতন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কামনা-পীড়িত সম্ভোগের পরে যে অবসাদ ও ক্লান্তি দেখা যায় তাহার পরিচয় প্রসাদপুরের কুঠিতে জীবনযাত্রায় পরিস্ফুট করিলেও ইহার প্রমত্ত রূপভোগের উল্লাসের চিত্রটি উপেক্ষা করিয়াছেন। এমার জীবনে এই দিকটি ঔপন্যাসিক নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। রোদোলফ প্রেম-বিবশা এমাকে লইয়া বিদেশে যাইতে অনিচ্ছুক। কিন্তু এমার মনে জাগিয়া ওঠে স্বপ্ন। তিনি বলেন 'our life together will be like an eternal embrace that each day grows more close and more complete', রোদোলফের চলিয়া যাইবার পরে তাঁহার জীবনে পুনর্বার আসিলেন লেঅঁ। তাঁহাদের জীবনে শুরু হইল কামনা-বিহ্বল মিলনের অসংযত বিহ্বলতা। এমার জীবনে দেখা দিল ক্লান্তি ও অবসাদ। তিনি নিছক অভ্যাস বশে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। গৃহের জানালা বারংবার তাঁহার জীবনে মুক্তির ইঙ্গিত আনিয়াছে। তিনি সকলকে ঘৃণা করিতে শুরু করিলেন। যদি জানালা দিয়া বাহির হইয়া তিনি কোন নির্মেঘ নীলাকাশে নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিতে পারিতেন তবে আনন্দিত হইতেন।

জীবনযুদ্ধে পরাভূতা, ঋণভারে জর্জরিতা এমাকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করিতে হইল। শাল দুঃখে জর্জরিত হইলেন ও মৃত্যুর পূর্বে এমাও যেন নূতন করিয়া স্বামীর প্রতি প্রেমাকৃষ্টা হইলেন। এমার মৃত্যুর পরে সকল ঘটনা জানিতে পারিয়া শালের বেদনার অবধি রহিল না। সকলই ভাগ্যের দোষ—'c'est la faute de la fatalite' সমস্ত জীবন নিয়তি নিয়ন্ত্রিত, ইহাই গ্রন্থের সুর।

ফ্লবের বস্তুনিষ্ঠভাবে মাদাম বোভারি ও অন্যান্য চরিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। জীবনের প্রতি তাঁহার আনুগত্যহেতু, নীতি ও ধর্মের বিরুদ্ধতার অভিযোগে তাঁহাকে আদালতে যাইতে হয়। তিনি যেন নির্মমভাবে মাদাম বোভারি চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন। বস্তুনিষ্ঠা তাঁহার প্রবল কিন্তু মমতা ও সহানুভূতির অভাব তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসের দুইটি গুণ হইল রচনাশৈলীর উৎকর্ষ ও

১। 'A sweet influence seemed to come from the trees. She could feel her heart begin to beat again and the blood surging through her veins like a river of milk. Far off, beyond the wood and on the further hills she heared a long, and wordless cry, a voice that seemed to hang in the air'.

চরিত্রের রহস্য ও স্বরূপ প্রকাশের জন্য নিসর্গ চিত্রকে প্রতীকরূপে ব্যবহার। এমার্ক জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্য পরিস্ফুট করিবার জন্য ফ্লবের অঙ্কিত করিয়াছেন তরল চিত্র (liquid images) আবার মুক্তির স্বপ্ন প্রকাশের জন্য স্থানিক চিত্র (spatial images)।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে বারুণী পুষ্করিণী, পুষ্পোদ্যান ও বিশীর্ণা চিত্রা নদী-তীরের বৃক্ষসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। বারুণীতীর গোবিন্দলাল-রোহিণীর মনে উদ্দীপন-বিভাবের কার্য করিয়াছে ও তাঁহাদের মনে উদ্দাম রূপলালসা জাগাইয়া তুলিয়াছে। আবার ভ্রমরের মৃত্যুর পরে অনুতাপদগ্ধ গোবিন্দলাল সেই বারুণী-তটের পুষ্পোদ্যানে গেলেন। 'সে বাগানে আর ফুল ফোটে না, ফল ফলে না—বুঝি সুবাসও আর বয় না'। ইহা গোবিন্দলালের রিক্ত জীবনের প্রতীক।

অশ্বত্থ, কদম্ব, খর্জুর প্রভৃতি শোভিত, কোকিল পাপিয়াগণের গীতিমুখর চিত্রানদীর সন্নিকটে নির্জন রম্য অট্টালিকা সুরুচিবিগর্হিত চিত্রমালায় শোভিত। এখানে সঙ্গীতের আয়োজন ক্লান্তজীবনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে। এই চিত্র অসংযত ভোগলালসাময় জীবনের পরিচয় দেয়। কিন্তু 'ধীরে ধীরে শীর্ণ-শরীরা চিত্রা নদী বহিতেছে'—ইহা গোবিন্দলাল-রোহিণীর জীবনের অবসাদের চিত্র পরিস্ফুট করিয়াছে। যে ভাগ্যের কথা শার্ল বোভারি উল্লেখ করিয়াছেন তাহা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'ও এক বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। সেখানে বারংবার উইল পরিবর্তন নিয়তির রূপ ধারণ করিয়া প্রধান চরিত্রত্রয়ের ভাগ্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। 'মনুষ্য বড়ই পরাধীন'—এই সত্য গ্রন্থের মর্মবাণী-রূপে উচ্চারিত হইয়াছে।

টমাস হার্ডি জীবনকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ও ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল তাঁহার দার্শনিক নৈরাশ্যপূর্ণ মনোভাব। তিনি মানবজীবনের চিরন্তন প্রবাহকে প্রকৃতির পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া দেখিয়াছেন, ইহার ফলে তাঁহার উপন্যাসে জীবন-সত্যের প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাঁহার 'রিটার্ণ অব দি নেটিভ' ষষ্ঠ গ্রন্থ। ইহার কাহিনী সরল, বিন্যাসের ক্ষেত্রেও কোন জটিলতা দেখা যায় না। পূর্বে হীরক বিক্রেতা, বর্তমানে শিক্ষক ও প্রচারক ক্লিম ইওব্রাইটের সঙ্গে ইউস্টাসিয়া ভাই-এর বিবাহ হয়। কিন্তু ইউস্টাসিয়ার সঙ্গে ডামন উইলডেভে-র প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। এই প্রেম সমাজ-বহির্ভূত। ক্লিম ইওব্রাইট আদর্শবাদী ও বর্তমান জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন। তাঁহার বর্ণনায় হার্ডি লিখিয়াছেন :

People already feel that a man who lives without disturbing a curve of feature or setting a mark of mental concern anywhere upon

himself, is too far removed from modern perceptiveness to be a modern type.

ক্লিম হার্ডির নিকটে চিরন্তন মানব। কিন্তু ইউস্টাসিয়া রোমান্টিক মনোভাবাপন্ন বলিয়া মাদাম বোভারির ন্যায় পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনী চরিত্রে ইহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত অন্তেও তাহার মনোভাবের পরিবর্তন হয় নাই।

ইউস্টাসিয়ার আকাঙ্ক্ষা হইল প্রেমের তীব্র মদিরা পান।

Love was to her the one cordial which could drive away the eating loneliness of her days. And she seemed to long for the abstraction called passionate love more than for any particular lover.

রোহিণী চরিত্রের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়াছে। রোহিণীর নিঃসঙ্গ জীবনের অবলম্বন হইল প্রেম। ইহা কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য নহে। সে প্রেমবাসনার মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিতে চায়। হরলাল তাহার অন্তরে সুপ্ত বাসনাকে জাগাইয়া তোলে। তাই উইল চুরির দুঃসাহসিক কার্যে সে ব্যাপৃত হইয়াছিল। হরলাল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবার পরে, তাহার সদ্য-জাগ্রত নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা দুঃসহ হইয়া উঠিল। সে বারুণীর ঘাটে নিজের বালবৈধব্যকে ধিক্কার দিয়া ভাবিতেছিল ভ্রমরের সৌভাগ্যের কথা। সে ভাবিতেছিল :

দূর হৌক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই, কিন্তু আমার সকল পথ রুদ্ধ কেন? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি?

গোবিন্দলাল যখন আসিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন ও তাহার দুঃখের কথা জানিতে চাহিলেন তখন রোহিণী স্বভাবজ বুদ্ধি লইয়া তাঁহার অন্তরের পরিচয় পাইয়া বলিল 'আজ নহে। একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে'। রোহিণীর মনেও সাময়িকভাবে প্রেমানুভূতি জাগিয়াছিল। তাই সে উইল কৃষ্ণকান্তের গৃহে পুনর্বার রাখিতে যায়। গোবিন্দলালের আকর্ষণ সে আর দমন করিতে না পারিয়া ঈশ্বরের নিকটে তাহার অন্তরের প্রেমবহ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছে। তথাপি প্রেম তাহার হৃদয় জয় করিতে পারে নাই। তাহার চিত্ত কামনা-বহ্নিতে প্রজ্বলিত। নচেৎ কদাপি সে গিলটির গহনা লইয়া ভ্রমরকে দেখাইতে যাইত না। সে দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার করে নাই। ভোগপ্রমত্ত চিত্তে ঈপ্সিত বস্তু পাইতে চাহিয়াছে। হরলাল, গোবিন্দলাল ও নিশাকরকে তাই সে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিতে অধীরতা প্রকাশ করিয়াছে।

ইউস্টাসিয়ার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে হার্ডি লিখিয়াছেন :

She had pagan eyes, full of nocturnal mysteries, and their light, as it came and went, was partially hampered by their oppressive lids and lashes. তাহার উপস্থিতি 'tropical midnights'-এর সুরভিত নিশ্বাস বহন করিয়া আনে।

রোহিণীর ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সৌন্দর্যের প্রথাসিদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। গোবিন্দলাল জল হইতে যখন তাহাকে উদ্ধার করিলেন, মাত্র সেইস্থানে তাহার 'সুধাপরিপূর্ণ মদনমদোন্মাদ হলাহল—কলসীতুল্য' রাঙ্গা অধরদ্বয়ের বর্ণনা দিয়াছেন।

হার্ডি তাঁহার উপন্যাসে প্রকৃতিকে সজীবমূর্তি দান করিয়াছেন। এগডন হীথ্ উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের ন্যায় বিশিষ্ট ভূমিকা লাভ করিয়াছে। কাহিনীর মধ্যে উহা এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু সমসাময়িক কালের ঔপন্যাসিক মেরিডিথ প্রকৃতির যে রূপ অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কাহিনীর অলঙ্করণের কার্য করিয়াছে।

এমার দুর্ভাগ্য হইল যে, তিনি তাঁহার স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া পরাভূত হইয়াছেন। রোদোলফের প্রতি আকর্ষণের কারণ হইল যে, তিনি যেন এক 'traveller who has voyaged over strange lands'. পারিবারিক জীবনের নিরানন্দ পরিবেশ, স্বামীর স্থূলতা তাঁহাকে নিষিদ্ধ প্রেমের আকর্ষণে টানিয়াছিল।[১] কিন্তু স্বপ্ন ও বাস্তবের সংঘাতে তাহার জীবনপরিণাম ট্রাজেডির মহিমা লাভ করিয়াছে। মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি শান্তভাবে উদ্বিগ্ন স্বামীর প্রশ্নে উত্তর দিয়াছেন, 'it had to be, my dear'. রোহিণীর পরিণামে কোন মহিমা নাই, গোবিন্দলালের জীবনেও নাই। ভ্রমরের দোষত্রুটি যাহাই থাকুক, তাহার আদর্শনিষ্ঠা তাহাকে গৌরব দান করিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের সমালোচনা

রোহিণীর চরিত্র বিশেষতঃ তাহার পরিণামের শিল্পগত ত্রুটি লইয়া শরৎচন্দ্র কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিকের অভিমতের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। তিনি বলিয়াছেন :

১। 'The drabness of her homelife prompted fantastic dreams of luxury, luxurious tenderness, a longing for the pleasures of adultery'. প্রেমিকের নিকটে এমার আত্মসমর্পণ ছিল এক গভীর আবশ্যানুভূতি 'Une beatitude qui l'engourdissait'.

'রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তারপর পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে লাস চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক্ দিয়ে পাপের পরিণামের বাকি কিছু আর রইল না।

অনেকবারই আমার মনে হয়েছে, রোহিণীর চরিত্র আরম্ভ করবার সময় এ কল্পনা তাঁর (বঙ্কিমের) ছিল না। থাকলে এমন করে তাকে গড়তে পারতেন না। কেবল প্রেমের জন্যই নিঃশেষে, সংগোপনে বারুণীর জলতলে আপনাকে আপনি বিসর্জন দিতে পাপিষ্ঠাকে কদাচ এমন করে নিয়োজিত করতেন না।

গোবিন্দলালকে রোহিণী অকৃত্রিম এবং অকপটেই ভালবেসেছিল—সমস্ত হৃদয় প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, এবং এ প্রেমের প্রতিদান সে যে পায়নি তা'ও নয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের সুনীতির আদর্শে এ প্রেমের অধিকারী সে নয়। এ ভালবাসা তার প্রাপ্য নয়। সে পাপিষ্ঠা, তাই পাপিষ্ঠাদের জন্য নির্দিষ্ট নীতির আইনে বিশ্বাসঘাতিনী হওয়া চাই এবং হ'লও সে। তার পরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মিনিট পাঁচেকের দেখায় নিশাকরের প্রতি আসক্তি এবং পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু। মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ অহেতুক জবরদস্তি অপমৃত্যুতে…।'

তাহার গোবিন্দলালকে ভালবাসিবার যে শক্তি তাহা সাধারণ নারীতে অসম্ভব,—উইল বদলাইতে সে কৃষ্ণকান্তের মত বাঘের ঘরে ঢুকিয়াছিল—গোবিন্দলালের ভাল করিতে। 'বারুণী'র জলতলে প্রাণ দিতে গিয়াছিল সে এমনি প্রিয়তমের জন্য, আবার সেই রোহিণীই যখন কেবলমাত্র নীতিমূলক উপন্যাসের উপরোধেই এবং মুহূর্তের দৃষ্টিপাতে সমস্ত ভুলিয়া আর একজন অপরিচিত পুরুষকে গোবিন্দলালের অপেক্ষাও বহুগুণে সুন্দর দেখিয়া প্রাণ দিল, তখন পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় সপ্রমাণ করিয়া সাংসারিক লোকের সুশিক্ষার পথে হয়ত প্রভূত সাহায্য করা হইল কিন্তু আধুনিক লেখক তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না'[১]।

শরৎচন্দ্রের মত ও মন্তব্য অত্যন্ত কঠোর হইলেও তাহা গ্রন্থের শিল্পোৎকর্ষের দিক হইতে আলোচনা করা হইয়াছে। অস্কার ওয়াইল্ড একদা বলিয়াছিলেন যে, আর্ট জীবনকে অনুসরণ করে না, জীবন তাহাকে অনুসরণ করিয়া নিজেকে সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া তোলে। এই বিরোধাভাসের তাৎপর্য হইল যে, শিল্প যদি জীবনকে অনুসরণ করিবার প্রয়াস করে তবে তাহার ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়। জীবন হইতে

১। স্বদেশ ও সাহিত্য

উপাদান গ্রহণ করিলেও শিল্প তাহাকে স্বতন্ত্র ও সার্থকভাবে গড়িয়া তোলে। আরিস্টটল এই অর্থে প্লেটো কর্তৃক উত্থাপিত আর্টের অনুকরণের অভিযোগের উত্তরে ইমিটেসন অর্থাৎ জীবনের পুনর্বিন্যাস কথাটির উপরে গুরুত্ব দান করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি 'উত্তরচরিতে' লিখিয়াছেন :

> কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে। কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যের সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কবিগণ সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। 'অতএব সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য'।

শরৎচন্দ্রের বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা হইল যে, রোহিণী অকৃত্রিমভাবে গোবিন্দলালকে ভালবাসিয়াছিল ও প্রেমের জন্য বারুণীর জলে আত্মবিসর্জন করিয়াছিল। তাহার ভালবাসার যে অসাধারণ শক্তি তাহা সাধারণ নারীতে সম্ভব নহে।

রোহিণীর আরম্ভ ও পরিণতির মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে। ইহা হিন্দুধর্মের সুনীতির আদর্শের জন্য গ্রন্থকার করিয়াছেন। নিশাকরকে দেখিয়া তাহার আকর্ষণ ও বিশ্বাসহন্ত্রী হইবার জন্য তাহার অপমৃত্যু, পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় প্রমাণিত করিলেও তাহা শিল্প-বিরোধী। আধুনিক লেখক তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না।

উপন্যাসের চরিত্র মাত্রই অসাধারণ। বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষগোচর ও সুপরিচিত চরিত্র হুবহু উপন্যাসে স্থান পায় না। উপন্যাসের বর্ণিত চরিত্র বাস্তব-জীবনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে, কিন্তু তাহা তাহার অনুলিপিও নহে, বা প্রতিধ্বনিও নহে। বাস্তব ও উপন্যাসের সত্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। কেননা, যাহা ঘটে সব সত্য নহে। বাল্মীকির মন রামচন্দ্রের সত্যকার জন্মভূমি। বঙ্কিম-চন্দ্রও লিখিয়াছেন :

> যাহা সত্যের প্রকৃতি মাত্র নহে—তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না।

সাধারণ নারীর পক্ষে রোহিণীর ন্যায় ভালবাসা সম্ভব নহে, ইহা মানিয়া লইলেও স্বীকার করিতে হয় যে, উপন্যাসে তাহার চরিত্রের প্রেমের দিকটি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। জীবনের নানাদিক হইতে দৃষ্টি প্রত্যাহার করিয়া ঔপন্যাসিক

চরিত্রের একটি বিশেষ রহস্যময় দিকের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন। এই অর্থে বিনোদিনী, দামিনী, রাজলক্ষ্মী ও অচলার চরিত্র উদ্‌ভাসিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই স্বভাবানুকারী ও স্বভাবাতিরিক্ত বলিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

রোহিণী অকৃত্রিমভাবে ও অকপটে ভালবাসিয়াছিল, শরৎচন্দ্রের এই উক্তিও অতিরঞ্জিত। তাহার বৈধব্য জীবনের অবরুদ্ধ, অতৃপ্ত কামনা-বহ্নি তাহাকে পুরুষচিত্ত জয়ে ও ভোগে প্রেরণা দিয়াছে। হরলাল কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের পরে যখন সে অপ্রত্যাশিতরূপে অনিন্দ্যকান্তি, দাম্পত্যপ্রেমে একনিষ্ঠ গোবিন্দলালের নিকট হইতে সহানুভূতি লাভ করিল তখন সে আপন মনে ভবিষ্যতের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। সে বলিয়াছে 'একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।' করুণার অন্তরালে গোবিন্দলালের সুপ্ত রূপ-পিপাসার আকর্ষণ সে চিনিয়া লইতে ভুল করে নাই। কৃষ্ণকান্তের হস্ত হইতে গোবিন্দলাল কর্তৃক তাহার উদ্ধারে, তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ না হইবার প্রস্তাবে ও রোহিণীর স্বীকারোক্তিতে 'এ রোগের চিকিৎসা নাই, আমার মুক্তি নাই'—তাহার হৃদয় আশ্বাস লাভ করিয়াছে। ভ্রমরের প্রস্তাবে বারুণীর জলে সে যে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল তাহা 'প্রিয়তমের' হিতের জন্য নহে। অসহ্য প্রেমবহ্নিতে দগ্ধ হইয়া সে যখন বুঝিল 'সম্মুখেই শীতল জল কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিবে না, আশাও নাই', তখন সে নৈরাশ্যহেতু আত্ম-নিমজ্জনে বাধ্য হইয়াছিল।

সত্যকার প্রেমানুভূতির মধ্যে ত্যাগস্বীকারের মাহাত্ম্য থাকে, তপস্যার দীপ্তি থাকে। রোহিণীর মধ্যে তাহা ছিল না। গোবিন্দলাল ও তাহাকে লইয়া যে অপবাদ রটিল তাহার মূলে যে ভ্রমর এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া রোহিণী ভ্রমরকে যে গিণ্টির অলঙ্কারগুলি নির্লজ্জার ন্যায় দেখাইয়াছিল তাহা কোন প্রেমিকা পারিত না। বঙ্কিমচন্দ্র এই হেতু মন্তব্য করিয়াছেন 'রোহিণী না পারে এমন কাজ নাই।' সুতরাং তাহার মধ্যে যে বৃত্তিটি প্রবল তাহা হইল পুরুষের ভোগপ্রমত্ত আসঙ্গলোলুপতা, প্রেম নহে।

হার্ডির নায়িকা ইউস্টাসিয়ার মধ্যে কামনার তীব্র দহনজ্বালা ছিল, কোন বিশেষ প্রেমিকের প্রতি আকর্ষণ ছিল না। তিনি তাহার রূপ বর্ণনার একস্থানে লিখিয়াছেন, 'Assuring that the souls of men and women were visible essences, you could fancy the colour of Eustacia's soul to be flame-like.' তাহার ক্ষেত্রে এই অগ্নির দীপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার রহস্যময়ী দৃষ্টিতে, আর রোহিণীর মধ্যে তাহার 'কুণ্ডলীকৃতা দোলায়মানা মনোমোহিনী

কবরীতে', তরঙ্গে আন্দোলিত হংসীর ন্যায় গতিছন্দে ও মদনমদোন্মাদ, সুধাপরিপূর্ণ অধরদ্বয়ে।

নিশাকরকে দেখিয়া রোহিণীর আসক্তি অস্বাভাবিক নহে। বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন 'বাঘ গোরু মারে, সকল গোরু খায় না। স্ত্রীলোকও পুরুষকে জয় করে, কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য'। রোহিণীর ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল। কামনাবহ্নি রোহিণীকে পুরুষচিত্ত জয়ে প্রেরণা দিয়াছে, প্রেম-নিষ্ঠা তাহার অন্তরের সত্য বস্তু নহে। গোবিন্দলালকে পাইয়া রোহিণীকে উপলব্ধি করিতে হইয়াছিল যে, ভ্রমর তাঁহার অন্তরে, সে মাত্র বাহিরে। গোবিন্দলালের নিকটে নারীত্বের মর্যাদা লাভ করিলে তাহার মনের পরিবর্তন হইত কিনা বলা যায় না, কিন্তু না পাইয়া তাহার হৃদয় কোন আশ্রয় পায় নাই। নিশাকরের প্রতি আসক্তি তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও মৃত্যুও অপরিহার্য নিয়মে ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য অত্যন্ত সঙ্গত 'তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথাই আখ্যায়িকা লিখিলাম।'

পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় প্রদর্শনের নিমিত্ত গোবিন্দলাল-রোহিণীর মর্মান্তিক প্রেম-পরিণাম ঘটে নাই। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়া গোবিন্দলাল বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা 'ধন্বন্তরি-ভাণ্ড-নিঃসৃত সুধা' নহে, ইহা 'মন্দার-ঘর্ষণ-পীড়িত-বাসুকি-নিঃশ্বাস-নির্গত হলাহল'। এই হলাহল যে কত তীব্র তাহা বিরতিচিহ্নে বিচ্ছিন্ন দীর্ঘ বাক্যাংশে পরিস্ফুট হইয়াছে।

সুতরাং রোহিণীর জীবন কাহিনীর আরম্ভে ও পরিণামে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পীর বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক সহানুভূতি লইয়া সমাজবহির্ভূত প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সামাজিক প্রচলিত নীতি রক্ষার দাবীতে শিল্পবিধি না মানিয়া যদি তিনি রোহিণীর পরিণাম দেখাইতেন তবে তাহা দোষাবহ হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহা করেন নাই অথবা অ-সামাজিক কোন নীতিও মানিয়া লন নাই। শিল্পের দাবীতে যাহা ঘটিতে পারে তাহাই তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন।

বর্ণনারীতি

আধুনিক কালের উপন্যাস একান্তরূপে মননপ্রধান হইবার ফলে সংশ্লিষ্ট চরিত্র-সমূহের ভাব ও ভাবনা, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বঘটিত মানসিক প্রতিক্রিয়া, সংলাপে আবেগ অপেক্ষা সচেতন মনের বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ এবং ঔপন্যাসিকের জীবন-সম্পর্কে সুনিশ্চিত জিজ্ঞাসা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দেখা যায়

যে তিনি পারিপার্শ্বিক জীবনধারা সম্পর্কে সজাগ ও কৌতূহলী দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছেন। জীবনের নানাদিক সজীব মূর্তি ধারণ করিয়া কাহিনীকে বৈচিত্র্য-পূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনারীতিতে তাই একদিকে বাহিরের স্থান ও পাত্র-পাত্রীদের পরিচয় কৌতুকপূর্ণ মানবিক রসে ভরিয়া ওঠে, আবার অন্যদিকে তিনি বিশ্লেষণধর্মী মন লইয়া যে বর্ণনা করেন তাহা আখ্যায়িকা অথবা চরিত্রসমূহের মর্ম প্রকাশে সহায়ক হয়। প্রথমটিতে পাওয়া যায় কল্পনা-প্রবণ মনের ক্রীড়াশীলতা ও অন্যটিতে দার্শনিক মনের বিচার-নিপুণ সংযত মনোভাব। 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্রনাথের নৌকা-যাত্রাকে উপলক্ষ্য করিয়া নদীঘাটে সমবেত প্রাচীনাদের বক্তৃতা, মধ্যবয়স্কাগণের শিবপূজা, যুবতীগণের দ্রুত অবগাহন, গঙ্গাস্তবের ফাঁকে ফাঁকে ব্রাহ্মণ-ঠাকুর কর্তৃক চকিত দৃষ্টিতে নারীর রূপসুধা পানের প্রয়াস, আকাশে সাদা মেঘের গতিবিধি, তাহাদের নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখীদের ভাসিয়া চলা, বৃক্ষশাখায় বিহঙ্গমের কার্য-কলাপ—এই সকল মিলিয়া আস্বাদনযোগ্য চিত্ররস সৃষ্ট হইয়াছে ও ইহারা উপন্যাসবর্ণিত কাহিনীকে বৈচিত্র্য দান করিয়াছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বর্ণনায় মাঝে মাঝে ক্রীড়াশীলতার পরিচয় দিলেও তাহা আখ্যায়িকাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। এখানে পাঠকচিত্ত চতুর্দিক প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পায় না, বরং কাহিনীর মর্মে প্রবেশ করিবার আমন্ত্রণ লাভ করে।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের শয়নগৃহের বর্ণনা না দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অহিফেন-নেশায় পর্যঙ্কে বসিয়া 'মিঠেরকম' ঝিমাইবার কাহিনী বলিয়াছেন। তিনি ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতেছিলেন যে, হরলাল তিন টাকা তেরআনা দু-কড়া দু-ক্রান্তি মূল্যে তাঁহার সম্পত্তি কিনিয়া লইয়াছে। আবার গভীর নিশীথে নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহার মনে হইল যে, হরিঘোষের মোকদমায় জাল দলিল দাখিল করায় ঘোরান্ধকার জেলখানায় তিনি গিয়াছেন। চাবি খোলার শব্দ অল্প কানে গেল বটে, মনে হইল জেলের চাবি পড়িল। এই বর্ণনা জমিদার কৃষ্ণকান্তের জীবনকে আলোকিত করিয়াছে।

'বিষবৃক্ষে' যেমন বঙ্কিমচন্দ্র ঝড়, নগেন্দ্রের গৃহ, নগেন্দ্র-সূর্যমুখী এবং শ্রীশচন্দ্র-কমলমণির দাম্পত্য জীবন, ব্রহ্মচারী কর্তৃক সূর্যমুখীর উদ্ধার এবং বিভিন্ন চরিত্রের বয়স ও রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তিনি বর্ণনাকে সংযত, সংহত করিয়া ইহাকে আখ্যায়িকা ও চরিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত করিয়াছেন।

উপন্যাসে বারুণী পুষ্করিণী ও ইহার তটবর্তী কোকিলের ধ্বনিতে মুখরিত

পুষ্পোত্থান এক বিশিষ্ট ভূমিকা লাভ করিয়াছে। বসন্তের কোকিলের কুহুরব ও মানবজীবনে ইহার প্রতিক্রিয়া লঘু সুরে বর্ণিত হইলেও রোহিণীর মনে তাহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

অপরাহ্ণে বারুণীতে জল আনিতে যাইয়া কোকিলের ডাকে বিব্রত রোহিণী তাহাকে গালি দিলেও, ইহাকে ভুলিল না। বঙ্কিমচন্দ্র এই দৃশ্যের বর্ণনা দিয়া লিখিযাছেন :

কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি, যেন তাই হারাইয়া যাওয়ায় জীবনসর্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কি যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি, কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে।

এই কোকিলের ধ্বনির সঙ্গে নিঃশব্দ, নীল গগনের সুর বাঁধা। সরোবর তীরের নানা পুষ্পশোভিত উদ্যান, সুবভিত বাতাসের প্রবাহ এবং কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর গোবিন্দলালের সঙ্গে সুর বাঁধা। এই সুর তাহার মনকে অপ্রাপণীয়ের বেদনায় আকুল করিয়া তুলিল।

গোবিন্দলালও স্বচ্ছ সরোবর জলে ক্রন্দনরতা ভাস্করকীর্তিকল্প রোহিণীর ছায়া প্রত্যক্ষ করিলেন। ইহার সঙ্গে মিলিত হইল পূর্ণচন্দ্র ও কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া। এই সুন্দর পরিবেশে নির্দয়তা অসুন্দর। তাই তাঁহার চিত্ত হইতে করুণা উৎসারিত হইয়া প্রকৃতির পঞ্চমে বাঁধা সুরের সহিত মিলিল। গোবিন্দলালের বেদনা প্রকৃতি ও রোহিণীর মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিল। সুর মিলিল বলিয়া রোহিণী আত্মপ্রত্যয়ের সুবে গোবিন্দলালকে বলিল 'একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।' ম্যাথু আরনল্ড এইরূপ সুরের বর্ণনা দিয়া লিখিয়াছেন :

Listen, Eugenia—
How thick the bursts come crowding through the leaves!
Again—thou hearest!
Eternal passion!
Eternal pain!

বঙ্কিমচন্দ্র বারুণী পুষ্করিণী ও ইহার পুষ্পোত্থানের বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। নীল "কাচের আয়নার মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা বৃহৎ জলাশয়টি সুন্দর। ইহার পরে উদ্যানের ফ্রেম বড় জাঁকালো, নানা ফলের পাথর বসানো। পুষ্পোত্থানে শাখায় ও পাতায় স্তবকে স্তবকে নানা বর্ণের পুষ্প বিকশিত হইয়া আছে।

মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীওয়ালা একখানা বড় বড় হীরার মত অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে জ্বলিতেছিল। আর মাথার উপর আকাশ—সেও সেই বাগান ফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না।

আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর সেই ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল।

কোকিলের কুহুধ্বনি ইহার মধ্যে প্রাণের চাঞ্চল্য বিস্তার করিয়াছিল। বারুণী পুষ্করিণী, ইহার তটভূমিতে অবস্থিত সুশোভিত উদ্যান ও বসন্তকালের কোকিলের কুহুধ্বনি, সকলে মিলিয়া গোবিন্দলাল ও রোহিণীর মনে এক নব চেতনা উদ্দীপিত করিয়া উভয়কে অনিবার্যভাবে পরস্পরের নিকটে আনিয়াছে। করুণাবোধ ও নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনার মধ্যে এক বন্ধন রচিত হইল।

বারুণী পুষ্করিণী যেমন তাহার প্রগল্‌ভ শোভা লইয়া জীবনের নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে, তেমনি শীর্ণশরীরা চিত্রা, তাহার বিহঙ্গম সঙ্গীতমুখর বৃক্ষশোভিত উপবন ও মনুষ্য সমাগম বর্জিত প্রান্তরস্থিত রম্য অট্টালিকা যেন করুণ উপসংহারের ইঙ্গিত দিয়াছে। এখানে প্রকৃতি-শোভার বৈপরীত্যে ও জনশূন্যতার নির্জন অবকাশে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর আসন্ন জীবনের চিত্রটি পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহাকে কীটস্‌ Love's Satiety রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অশোক-বকুল-কুটজ-কুরুবক-কুঞ্জমধ্যে ভ্রমর-গুঞ্জন, কোকিল-কূজন সেই ক্ষুদ্র নদীতরঙ্গ চালিত রাজহংসের কলনাদ, যূথী জাতি মল্লিকা মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ, গৃহমধ্যে নীলকান্তপ্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব মাধুরী, গৃহ শোভাকারী দ্রব্যসমূহের বিচিত্র উজ্জ্বলবর্ণ এবং গায়কের বিশুদ্ধ স্বরসপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টি—'এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম'। 'ক্ষণিক' কথাটির তাৎপর্য হইল যে, চতুর্দিকের সৌন্দর্যের সহিত মনের সুর বাঁধা পড়ে নাই। নিঃস্ব মন ও অবসন্ন জীবন চতুর্দিকের ঐশ্বর্য হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। যৌবনধন্যা বারুণী ও বালচিহ্নিতা প্রৌঢ়া চিত্রার মধ্যে জীবনের যোগসূত্র আছে। একটিতে সূচনা ও অন্যটিতে পরিণাম।

রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে 'বিষবৃক্ষের' সঙ্গে 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' পার্থক্য দেখা যায়। অনুভূতি-প্রবণ কবি-মন লইয়া তিনি প্রথম গ্রন্থে রূপের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় উপন্যাসে মননজাত দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রথমে তিনি আত্ম-সমর্থনের সুরে বলিয়াছেন, 'আজিকালি রূপবর্ণনার বাজার নরম'। রোহিণীর 'যৌবন পরিপূর্ণ, রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল, শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ'। এই বর্ণনার মধ্যে মৌলিকত্ব নাই। সে প্রত্যহ বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়। পুনর্বার ঔপন্যাসিক তাহার রূপের প্রতি দৃষ্টি দান করিয়াছেন।

রোহিণীর কলসী ভারি, চালচলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম

নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতেপেড়ে ধুতি পরা, আরও কাঁধের উপর চারুবিনির্মিতা কালভুজঙ্গিনীতুল্য কুণ্ডলীকৃতা দোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী।

রোহিণী তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্যপরায়ণা হংসীর ন্যায় পালভরা জাহাজের ন্যায় ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে সরোবর-পথ আলো করিয়া চলিতেছিল। তাহার রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল। এই বর্ণনার মধ্যে তাহার কামনাতপ্ত হৃদয়ের রূপটি পরিস্ফুট হইয়াছে।

জল হইতে গোবিন্দলাল যখন তাহাকে উদ্ধার করিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা দিয়াছেন যে, তাহার চৈতন্য-আনয়নের জন্য 'সুধাপরিপূর্ণ, মদনমদোন্মাদ হলাহল কলসীতুল্য রাঙ্গা-রাঙ্গা মধুর অধরে অধর দিয়া ফুৎকার দিতে হইবে'। জল হইতে রোহিণীকে উদ্ধারের পরে তাহার বাত্যাবর্মবিধোত চম্পকের ন্যায় দেহ, বিশালদাম বিলম্বিত ঘোর-কৃষ্ণ কেশরাশি, যাহা হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় জল পড়িতেছে, সিক্ত ভ্রূযুগলের কৃষ্ণশোভা, অব্যক্তভাববিশিষ্ট ললাট, বান্ধুলী পুষ্পের লজ্জাস্থল অধরের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা বস্তুনিষ্ঠ এবং ইহার মাধ্যমে তিনি যেন কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ-মিশ্রিত মনোভাব লইয়া রোহিণী চরিত্রের কামনা-পরিপূর্ণ, ভোগ-লুব্ধ অচরিতার্থ বাসনার দিকটি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। শিল্পীর বেদনা এখানে অনুপস্থিত। বালবিধবা হীরার ক্ষেত্রেও অনুরূপ রীতি অনুসৃত হইয়াছে।

হীরা আবার সুন্দরী—উজ্জ্বলশ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা। দেখিতে খর্বাকৃতা; মুখখানি যেন মেঘঢাকা চাঁদ; চুলগুলি যেন সাপ ফণা ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে।

উভয়ক্ষেত্রে বর্ণনার মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। রোহিণী যুবতী কিন্তু তাহার বয়সের কোন উল্লেখ নাই। সে নিজেও বলিয়াছে 'আমার নবীন বয়স, নতুন সুখ'। গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে যখন সে গতপ্রাণা হইল তখন ভৃত্যেরা আসিয়া দেখিল 'বালক-নখরবিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে'। এখানে ঔপন্যাসিকের কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।[১]

ভ্রমর কালো। সূর্যের নবীনালোক তাহার উজ্জ্বল, কোমল, শ্যামচ্ছবি মুখকান্তির উপরে পড়িয়া তাহার লীলাচঞ্চল চক্ষুদ্বয় ও গণ্ডদেশ প্রভাসিত করিল। 'হাসি চাহনিতে সেই আলোতে, গোবিন্দলালের আদরে আর প্রভাতের বাতাসে

১। মাদাম বোভারির মৃত্যুদৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে 'As the death-rattle became more marked, the Church man hastened his prayers. They mingled with Bovary's stifled sobs, and at times all other sounds seemed to vanish in the low murmur of Latin syllables which rang out like a passing-bell'. এখানেও কথঞ্চিৎ ব্যঙ্গপ্রবণতা সত্ত্বেও ঔপন্যাসিকের মমতা গভীরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

—মিলিয়া গেল'। বিনোদিনী রোহিণীর প্রসঙ্গে তাহাকে বলিয়াছেন, 'তুমি হাজার লোক গৌরবর্ণ নও, পুরুষমানুষের মন ত' কেবল কথায় পাওয়া যায় না, একটু রূপ গুণ চাই'। তাহার সুখে সকলে ঈর্ষান্বিত ছিল। অপরাজিতাতে পদ্মের আদর? আবার তাহার উপরে মল্লিকার সৌরভ?

বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরের বালিকাস্বভাবকে পরিস্ফুট করিবার জন্য তাহার রঙ্গ-তামাশা, রান্নাঘরে যাইয়া রাঁধুনীকে রূপকথা বলিবার জন্য উপরোধ, স্বামী মহালে গেলে তাহার বেশভূষায়, কাজকর্মে ও আহারে ঔদাসীন্য, ক্ষীরির মুখে অপবাদ শুনিয়া তাহাকে মারধোর প্রভৃতির বর্ণনা দিয়াছেন। আবার যখন সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিল তখন সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা ভাবিয়াছে মৃত্যুর কথা। স্বামী পরিত্যক্তা ভ্রমর তখন সংযতবাক, আদর্শনিষ্ঠ তপস্বিনী। যতই তাহার মৃত্যুর দিন অগ্রসর হইল ততই সে হইয়া উঠিল হাস্যময়ী ও প্রফুল্লমূর্তি। 'নিভিবার আগে প্রদীপ হাসিল'। ভ্রমরের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বাহিরের বর্ণনা সংযত করিয়া তাহার অন্তর্লোককে পরিস্ফুট করিয়াছেন।

গোবিন্দলালের মনে রূপতৃষ্ণা প্রবল বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রূপবর্ণনা করিয়াছেন। সেই রূপ প্রতিভাত হইয়াছে তাঁহার মনে।

[illegible] নিবিড় কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজি নির্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে, —কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে।

এই প্রথাসিদ্ধ রূপবর্ণনার সঙ্গে মানসিক দীপ্তির সংযোগ ঘটায় ইহা বাহিরের বস্তুরূপে উপেক্ষিত হয় নাই।

হাস্যরস

আমোদ ও কৌতুক হইল হাস্যরসের দুই অঙ্গ। উভয়ক্ষেত্রে আমরা হাসি বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমোদ হইল স্বেচ্ছাবৃত স্বল্প পীড়ন। ইহাতে চেতনা শক্তি জড়তা কাটাইয়া জাগ্রত হয়। কৌতুকও সুখাবহ দুঃখ বটে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে আছে প্রচলিত নিয়মভঙ্গ-জনিত আনন্দ অথবা অসঙ্গতি দর্শনে সুখানুভব। স্বাভাবিক প্রত্যাশার মধ্যে অসঙ্গতি কার্যে বা বাক্যে প্রকাশিত হইলে তাহা হাস্যরস উত্থিত করিয়া তোলে। ইচ্ছা ও অবস্থায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিলে আমরা আনন্দ পাই বটে, কিন্তু তাহা আবার মাত্রা অতিক্রম করিলে দুঃখের কারণ হয়। ফলস্টাফের প্রণয়ের স্বপ্নে ব্যর্থতা ও নিপীড়ন হাস্যরস সৃষ্টি করে, কিন্তু অযোধ্যায় প্রত্যাগত রামচন্দ্রের স্বপ্ন প্রজাবৃন্দের সংশয়ে ব্যর্থ হইলে, সীতা-বর্জনের কাহিনী করুণ রসে অভিষিক্ত হয়। সুতরাং

'কমেডির হাস্য এবং ট্রাজেডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে'।

হাস্যরস জীবনের গ্লানি অপসারিত করিয়া ইহাকে নির্মল ও বিশুদ্ধ করিয়া তোলে। ইহার মধ্য দিয়া আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাই। ইহা তাই আত্মসমীক্ষার সুযোগ দেয়। বট্‌মের গর্দভে পরিণত হইয়া অসঙ্গত কার্যকলাপ প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনের অসঙ্গতির দিকে সঙ্কেত জানায়। আবার বিশুদ্ধ হাস্যরসের পশ্চাতে অশ্রু স্তম্ভিত হইয়া থাকে। চার্লস ল্যাম্ নিজেকে লইয়া যে কৌতুক করিয়াছেন অথবা অহিফেনপ্রসাদে কমলাকান্ত যে আচরণ বা মন্তব্য করিয়াছেন তাহা কৌতুকাবহ হইলেও তাঁহাদের জীবনের নিঃসঙ্গতা-জনিত বেদনা আমাদের চক্ষুদ্বয়কে অশ্রুসিক্ত করে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসকে ভাঁড়ামির পর্যায় হইতে উদ্ধার করিয়া সাহিত্যে স্থান দেন। কিন্তু এই কথা মানিয়া লইলে রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক', মধুসূদনের দুইটি প্রহসন ও দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশীতে' প্রকাশিত বিরোধ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপমূলক হাস্যরসকে মূল্য দেওয়া হয় না। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব হইল তিনি সকল শ্রেণীর হাস্যসরকে স্থূল হস্তাবলেপ হইতে উদ্ধার করিয়া সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার মধ্যে আচার-আচরণের অসঙ্গতি, প্রচলিত আদর্শবোধ হইতে জীবনযাত্রায় বৈপরীত্য, ইচ্ছা ও উপায়ের মধ্যে বিরোধ, বুদ্ধিমার্জিত সংলাপের আশ্রয়ে মত ও মন্তব্য প্রকাশ এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সহায়তায় হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রে ইহা সঙ্গতির সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে।

হরলাল উইলের মুসাবিদা লেখক ব্রহ্মানন্দকে আসল উইলের পরিবর্তে জাল উইল রাখিয়া দিবার জন্য একহাজার টাকা দিতে চাহিলেন। একদিকে যাবজ্জীবন দণ্ডভোগের সমূহ ভীতি ও অন্যদিকে অর্থলোভ ব্রহ্মানন্দকে বিব্রত করিয়া তুলিল। তিনি জ্বর ও উদর পীড়ায় আক্রান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় ফলাহারের আকর্ষণ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ইচ্ছা ও উপায়ের মধ্যে এই বিরোধ কৌতুকরস সৃষ্টি করে।

উইল চুরির রাত্রে আট ঘটিকায় রোহিণীর ডাক শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিল 'কে নন্দী ? ঠাকুরকে এই বেলা কোরক্লোজ করিতে বল'। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার মৌতাত প্রসাদে দেখিতেছিলেন যে, মহাদেবের নিকট হইতে এক কৌটা আফিম লইয়া ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিলেন। আবার, রোহিণীকে দেখিয়া তাঁহার

মনে হইল যে, সে অথবা তাহার খুল্লতাত আফিম চাহিতে আসিয়াছে। আফিম জীবন অপেক্ষাও মূল্যবান। ইহা হয়ত দধীচিও দান করিতেন না।

রোহিণী নিত্য অপরাহ্নে বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়, কেননা ব্রহ্মানন্দের গৃহে চাকরাণী নাই। যাহার চাকরাণী নাই তাহার গৃহে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল ও ময়লা নাই। যে গৃহে অনেক চাকরাণী তথায় নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটে, নিত্য রাবণবধ হয়। পরিচারিকার দল নূতন করিয়া মহাকাব্যের যুদ্ধপর্ব রচনা করিয়া থাকে। রোহিণী দল বাঁধিয়া হালকা হাসিতে হালকা জল আনিতে যায় না।

নিশীথে যেদিন রোহিণী আসল উইল পুনঃস্থাপন করিতে কৃষ্ণকান্তের গৃহে গেল তখন দ্বারবানেরা চারপাইয়ে বসিয়া অর্ধরুদ্ধ কণ্ঠে পিলুরাগিণীর পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিল। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার পাহারাদার হরিকে ডাকিলেন কিন্তু তখন সে সুখানুসন্ধানে অন্যত্র গিয়াছিল।

রোহিণীর ধরা পড়িবার সংবাদ চাকরাণী মহলে সকালে বহু শাখান্বিত বিস্তার লাভ করিল। শোনা গেল সে ডাকাতের দল লইয়া নাকি আসিয়াছিল। এমনিতর সংবাদস্ফীতি ক্ষীরি চাকরাণীর মুখ হইতে চতুর্দিকে ছড়াইল। সংবাদটি হইল গোবিন্দলাল কর্তৃক রোহিণীকে অলঙ্কার দান। সংবাদটি নানাস্থানে দান করিবার পরে সে সুস্থ হইয়া অবগাহন করিল ও এই সংবাদ কলঙ্ককলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণের মহলে আরও পল্লবিত আকার ধারণ করিল। সুরধুনী তাঁহার কপালে আঘাত করিয়া যথোচিত মর্মবেদনায় ভ্রমরকে জানাইলেন যে, গোবিন্দলাল রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছেন। তিনি সদুপদেশ দিয়া বলিলেন 'মেজবাবুকে অষুধ কর। তুমি হাজার হোক গৌরবর্ণ নও, একটু রূপগুণ পুরুষচিত্ত বশীভূত করিতে প্রয়োজন।'

মহিলা-মহলে পরার্থপরতার অভাব ছিল না, অধ্যবসায়ও তাহাদের ছিল অপরিসীম। সুতরাং সকলে দল বাঁধিয়া দুঃখিনী, বিরহকাতরা বালিকাকে মর্মপীড়ায় কাতর হইয়া জানাইল যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রণয়াসক্ত। মহিলাদের মধ্যে পরোপকারের মনোভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক, কেননা গোবিন্দলাল অপরাজিতাকে পদ্মের সমাদর জানান। 'আবার তার উপর মল্লিকার সৌরভ'? সকলে এলোচুলে ত্বরিত গতিতে এই সংবাদ জানাইতে আসিল যে, তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। সমবেদনা অপেক্ষা ভ্রমরের দুঃখ উপভোগ করা ছিল তাহাদের নিষ্কাম ব্রত।

গোবিন্দলাল এক বৎসর হইল নিরপরাধা ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

কন্যার দুঃখে পিতা মাধবীনাথের অন্তর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কন্যাকে রাজগ্রামে রাখিয়া হরিদ্রাগ্রামের অন্ধকার চালাঘরে অবস্থিত ডাকঘরে আসিলেন। ডেপুটি পোস্টমাস্টারবাবু মাহিনা পান পনের টাকা আর পিয়ন সাত টাকা। ডেপুটিবাবু আপনাকে হর্তা-কর্তা বিধাতাপুরুষ বলিয়া ভাবেন ও পিয়নের সঙ্গে দূরত্ব রাখিতে চান। তিনি সর্বদা তাহাকে তর্জন-গর্জন করেন, পিয়নও সাত আনার ওজনে উত্তর দেয়। মাধবীনাথকে দেখিয়া পোস্টমাস্টার তাঁহাকে বসিতে বলিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে ত্রিপাদমাত্রাবশিষ্ট চেয়ারে উপবেশন করিয়া আছেন, তাহা ব্যতীত অপর কোন আসন ঘরে নাই। পিয়ন ভাঙ্গা টুলের উপর হইতে বইপত্র নামাইয়া তাঁহাকে বসিতে দিলেন। মাধবীনাথ তামাক খাইবার ছলে পিয়নকে বিদায় দিলেন। সেও বখশিসের লোভে দ্রুত প্রস্থান করিল। পোস্টমাস্টার প্রথমে কোন সংবাদ দিতে গড়িমসি করিতেছিল, পরে অর্থলোভে ও মাধবীনাথের পরিচয় পাইয়া ভীতিহেতু আর তঞ্চক করিলেন না। মাধবীনাথ জানিলেন যে, গোবিন্দলাল রোহিণীসহ প্রসাদপুরে আছে। তিনি পোস্টমাস্টারের কম্পমান হস্তে দশ টাকা দিলেন ও পিয়নের জন্য একটি টাকা রাখিলেন। পোস্ট-মাস্টার তাহা আত্মসাৎ করিলেন। সংবাদ সমর্থনের জন্য তিনি ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও তাঁহার নিকটে নোট আছে এই কথা বলিয়া ও অনতিদূরে রুলধারী কনস্টেবলের কান্তমূর্তি দেখাইয়া ডাকঘর হইতে গৃহীত সংবাদের সমর্থন পাইলেন। এই দুইটি ঘটনা হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রসাদপুরে নিঃসঙ্গ প্রাসাদে ওস্তাদজী তাম্বুরার কান মুচড়াইতেছেন ও রোহিণী তবলায় ঘা দিয়া সুর মিলাইবার সহায়তা করিতেছে।

ওস্তাদজী গুম্ফশ্মশ্রুর অন্ধকার মধ্য হইতে কতকগুলি তুষারধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া বৃষভদুর্লভ কণ্ঠস্বর বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর নির্গত করিতে করিতে সে তুষারধবল দন্তগুলি বহুবিধ খিঁচুনিতে পরিণত হইতে লাগিল এবং ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাশি তাহার অনুবর্তন করিয়া নানাপ্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল। তখন যুবতী খিঁচুনি-সন্তাড়িত হইয়া সেই বৃষভদুর্লভ রবের সঙ্গে আপনা কোমল কণ্ঠ মিলাইয়া গীত আরম্ভ করিল।

মনে হয় এখানে বঙ্কিমচন্দ্র যেন ওস্তাদের সঙ্গীত ও তানবিস্তারকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। অথচ ইহার কিছু পরেই তিনি 'গায়কের বিশুদ্ধ স্বরসপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টির' প্রশংসা করিয়াছেন। উভয় বর্ণনার মধ্যে সঙ্গতির অভাব শিল্পের ত্রুটি প্রমাণিত করে।

নিশাকর যেভাবে অর্থদানে ভৃত্যদ্বয়কে প্রথমে বশীভূত করিয়াছেন ও সোনাকে

চাকুরী দিবার প্রলোভনে জয় করিয়া রোহিণীর গোপন অভিসারের বার্তা গোবিন্দলালকে পাঠাইলেন তাহাও নিঃসন্দেহে কৌতুকাবহ।

মাধবীনাথের উৎকোচে বশীভূত আদালতে সাক্ষীদের কার্যকলাপ কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছে। ফিচেল খাঁর সাজানো মামলা ফাঁসিয়া গেল। একজন সাক্ষী অকপটে বলিল যে, ফিচেল খাঁর প্রহারে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে স্বীকৃতি দিতে সে বাধ্য হইয়াছিল। ভ্রাতার সঙ্গে জমি লইয়া মারামারির ফলে তাহার পিঠের দাগগুলি সে অনায়াসে ফিচেল খাঁর উপরে চাপাইয়া দিল। দ্বিতীয় সাক্ষী পিঠে রাঙ্গচিত্রের আঠা দিয়া ঘা করিয়াছিল। সে তাহা জজ সাহেবকে দেখাইল। বিচারক গোবিন্দলালকে মুক্তি দিলেন ও ফিচেল খাঁর আচরণ সম্পর্কে তদারক করিবার নির্দেশ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে দিলেন।

লিপিকুশলতা ও ত্রুটি

'কৃষ্ণকান্তের উইলের' কাহিনী দুইটি খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে আছে একত্রিংশতম পরিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। উপসংহারে একটি পরিশিষ্ট যুক্ত করিয়া উপন্যাসবর্ণিত কাহিনীকে লেখক পরিণতির মধ্যে সমাপ্ত করিয়াছেন। উপন্যাসের দুইটি খণ্ড যেন পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ, প্রথমটিতে বর্ণিত হইয়াছে কুহকিনী রূপসী রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের চিত্তে করুণার ধারা বাহিয়া রূপাসক্তিজনিত বাসনার দুর্বার প্রকাশ ও ইহার ফলে ভ্রমরকে ত্যাগ ও রোহিণীকে লইয়া ভোগারতি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে মোহভঙ্গ ও অবসাদের ফলে রোহিণীর মর্মান্তিক পরিণাম, গোবিন্দলালের বিচারে মুক্তিলাভ, ভ্রমরের ক্ষমাহীন মনোভাব ও মৃত্যু। পরিশিষ্টে বর্ণিত হইয়াছে দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পরে সন্ন্যাসীবেশে হরিদ্রাগ্রামে গোবিন্দলালের আগমন, স্বুবর্ণময়ী ভ্রমর প্রতিমা দর্শন ও উত্তরাধিকারী শচীকান্তের নিকটে ভ্রমরাধিক ভ্রমর লাভের কাহিনী বর্ণনা। গোবিন্দলাল ইহার পরে হরিদ্রাগ্রাম চিরতরে ত্যাগ করিলেন। আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। 'মেঘদূতে' যেমন অলকাপুরীতে আসিয়া কাহিনী শেষ হইয়াছে, এখানেও গোবিন্দলাল ভগবৎপাদপদ্মে মনঃস্থাপন করিবার পরে আখ্যায়িকা সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। 'বিষবৃক্ষে' প্রলোভন-অংশ অপেক্ষা প্রায়শ্চিত্ত পর্বের কাহিনী দীর্ঘতর, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' আবার প্রলোভন-অংশ সুবিস্তৃত কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত পর্ব দ্রুত-বর্ণিত, সংক্ষিপ্ত, অমোঘ ও ট্রাজেডির মহিমান্বিত। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্র মূল কাহিনীর সমান্তরাল ধারায় দেবেন্দ্র ও হীরার গৌণ-কাহিনী সংযোজিত

করিয়াছেন। কিন্তু এই উপন্যাসে মূল কাহিনী শাখা-প্রশাখা পরিহার করিয়া গ্রীক নাটকের ন্যায় একমুখীন ধারায় দ্রুতগতিতে পরিণামে আসিয়া পৌছিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কাহিনী হইতে একমুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি জীবনের বৈচিত্র্যের প্রতি প্রসারিত করেন নাই। জীবন-শিল্পীর নিকটে মানবজীবনের একটি করুণ অধ্যায় নিয়তি চালিত হইয়া অপ্রতিরোধ্য গতিতে পরিণামে আসিয়া সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। 'মনুষ্যজীবন বড়ই পরাধীন'—ইহার তাৎপর্য হইল যে, মানুষের জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এমন ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হয় যাহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে স্থির থাকিতে দেয় না, ভাসাইয়া লইয়া যায়। হয়ত উক্ত ঘটনাবলী একটু এদিক-ওদিক হইলে সমূহ ক্ষতি হইত না। যে ঘটনাবলীর উপরে মানুষ কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারে না তাহাই নিয়তির ছদ্মবেশে আসিয়া দেখা দেয় ও সর্বস্ব দাবী করিয়া বসে।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ঘটনাবলী এমন দ্রুত ও অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়াছে যে, তাহাদের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া প্রধান চরিত্র-ত্রয়কে স্থির থাকিতে দেয় নাই। মানবজীবনে ইহাই পরম রহস্য।

গোবিন্দলাল ও ভ্রমর দাম্পত্যজীবনে সুখী ছিল। ভ্রমর গোবিন্দলালকে দেখিয়া মনে করিত 'এত রূপ' এবং গোবিন্দলাল তরুণীবধূকে দেখিয়া ভাবিতেন 'এত গুণ'। কত নিত্য নূতন, স্নেহপূর্ণ, রঙ্গপূর্ণ, সুখপূর্ণ সম্বোধন করিয়াও গোবিন্দলালের আশা মিটিত না। ভ্রমরের সুখ দেখিয়া গ্রামের স্ত্রীলোকগণ সকলে হিংসায় জ্বলিত। অপরাজিতাতে পদ্মের সমাদরে তাহাদের ঈর্যার অন্ত ছিল না। অর্থহীন ডাকাডাকি ও বকাবকির মধ্যে তাঁহাদের প্রেম নিত্যনবীন রূপ লইয়া দেখা দিত। কিন্তু গোবিন্দলালের অন্তরে যে রূপ-পিপাসার বুভুক্ষা ছিল তাহা হয়ত জীবনযাত্রার সাধারণ প্রবাহের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পাইত না। রোহিণী বালবিধবা, যুবতী, রূপে পরিপূর্ণা। দেহের তট-বন্ধন অতিক্রম করিয়া রূপ যেন তাহার বাহিরে উছলিয়া পড়িতেছিল। এই রূপসী তাহার বিদ্যুদ্দামকটাক্ষ কখনও মার্জারের উপরে, কখনও-বা কোকিলের উপরে পরীক্ষা করিয়া জীবন কাটাইত, কিন্তু হরলাল আসিয়া তাহার অন্তরের কামনাকে জাগাইয়া তুলিল, অথচ তাহাকে গ্রহণ করিল না। তাহার মনে জাগিয়া উঠিল অপ্রাপনীয়কে লাভ করিবার বেদনা। সে তাই বারুণী তীরে বসিয়া হিসাব-নিকাশ করিতে বসিল। ভ্রমরের সুখ কোন্ গুণের জন্য, আর তাহার জীবনে সকল পথ রুদ্ধ কেন?

রোহিণীর জীবনে বালবৈধব্য হেতু বেদনাবোধের তীব্রতা ও নিজের জীবনকে

অপরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিবার প্রয়াস আসিয়াছে হরলালের প্রলোভনের সূত্র ধরিয়া। কৃষ্ণকান্ত যে উইল রচনা করিলেন তাহাতে ন্যায্য অংশ পাইয়াও হরলালের মন উঠিল না। তাহার অবাধ্যতায় ও বিধবা বিবাহের ভীতি প্রদর্শনে কৃষ্ণকান্ত আরও দুইবার উইল পরিবর্তন করিলেন। শেষবারের পরিবর্তনে হরলাল একেবারে বঞ্চিত হইলেন। তখন জাল উইল রাখিয়া কৃষ্ণকান্তের আসল উইল হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে সে রোহিণীকে ব্যবহার করিতে যাইয়া তাহার মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইয়া তুলিল। রোহিণী তাই ভাবিয়াছে 'কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপাল শূন্য'। এখানে ভ্রমরের চিত্রটি তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে।

বসন্তকালের পুষ্পসুরভিত ও কোকিলের গীতিমুখরিত উদ্যানে বারুণী পুষ্করিণীর তটে ক্রন্দনরতা রোহিণীকে দেখিয়া সংসার-পতঙ্গের দুঃখ নিবারণে গোবিন্দলাল সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল করুণা, কিন্তু ইহা যে রূপ-পিপাসার ছদ্মবেশে দেখা দিয়াছে তাহা নিশ্চিতরূপে জানা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। 'সৃষ্টি করুণাময়ী, মনুষ্য অকরুণ'—প্রকৃতির পাঠ সঠিকভাবে পড়িতে জানিলে তিনি বুঝিতেন যে, প্রকৃতি সৃষ্টির পথ বিচিত্র ছলনা জালে আকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। মায়াবিনী রোহিণী প্রকৃতির সৃষ্টি বলিয়া গোবিন্দলালের মনের অভ্যন্তরে যেন সহসা প্রবেশ করিতে পারিয়া বলিয়াছে, 'একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে'।

গোবিন্দলালকে নিত্য বারুণীর তীরে পুষ্পোদ্যানে রোহিণী দেখে ও তাঁহার রূপ তাহার হৃদয়পটে মুদ্রিত হইয়া যায়। সে প্রেমিকের মঙ্গলের জন্য জাল উইলের পরিবর্তে আসল উইল রাখিতে যাইয়া ধরা পড়ে। এবারে তাহার প্রেরণা আসিয়াছিল অন্তর হইতে। আবার গোবিন্দলাল তাহাকে কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া তাঁহার করুণাবৃত্তিকে প্রকাশিত করেন। রোহিণী আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া ভাবিল 'আমিত মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব।' রোহিণীর প্রেমে জিগীষাবৃত্তি প্রবল হইয়া দেখা দিল। তাহার সহিত কথোপকথনে গোবিন্দলাল বুঝিলেন, 'যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এই ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে'। তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিল।

ভ্রমর গোবিন্দলালের মুখে শুনিল যে, রোহিণী তাঁহাকে ভালবাসে। সে বালিকাসুলভ মন লইয়া ভ্রমরকে মরিতে নির্দেশ দিল। যেহেতু রোহিণীর তখন দারুণ পিপাসা, অথচ সম্মুখের শীতল জল সে স্পর্শ করিতে পারিবে না, সে তাই গভীর নৈরাশ্যে বারুণীতে আত্ম-নিমজ্জনের প্রয়াস করিয়াছিল। গোবিন্দলাল

তাহাকে উদ্ধার করিয়া তাহার 'মদনমদোন্মাদ সুধা পরিপূর্ণ' অধরে অধর দিয়া জীবন সঞ্চার করিলেন। রোহিণীর কামনার তীব্র জ্বালা তাঁহার হৃদয়ে সংক্রামিত হইল। 'নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ এই চাতকের লোচন-পথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল'। তথাপি ভ্রমরের প্রতি কর্তব্যবোধে গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভুলিবার জন্য বন্দরখালি মহালে গেলেন। ভ্রমরের প্রিয়-বিচ্ছেদ-জনিত কাতরতার সুযোগ লইয়া ক্ষীরি চাকরাণীর দল ও রটনা-কৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণ গোবিন্দলালের রোহিণীর প্রতি আকর্ষণ লইয়া যে ইতিহাস রচনা করিল তাহাতে মানসিক ভারসাম্য বিচলিত ভ্রমর স্বামীকে কঠোর ভাষায় পত্র লিখিয়া পিত্রালয়ে গমন করিল। ইহার ফল হইল বড় ভয়ঙ্কর। গোবিন্দলাল প্রত্যাবর্তন করিয়া ভ্রমরকে শাস্তি দিতে চাহিয়া রোহিণীর চিন্তাকে স্থান দিলেন। যাহা ছিল স্মৃতিমাত্র, তাহা দুর্বার বাসনায় পরিণত হইল।

ভ্রমর যদি গোবিন্দলালকে বন্দরখালিতে যাইতে না দিত তবে 'বাচনিক বিবাদে' মনের মেঘ অপসারিত হইত। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু ও মৃত্যুর পূর্বে শেষবারের মত উইল পরিবর্তন করিয়া সম্পত্তির অর্ধাংশ ভ্রমরকে দান, গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের ভাগ্যস্রোতকে বিপরীত দিকে প্রবাহিত করিয়া দিল। আবার গোবিন্দলালের মাতার কাশীবাসের সঙ্কল্প পুত্র ও পুত্রবধূর আন্তরিক বিচ্ছেদকে সম্পূর্ণতা দান করিল।

পর পর ঘটনার ধারা আসিয়া যে আবর্ত রচনা করিল তাহাতে গোবিন্দলাল-ভ্রমর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উদ্দেশ্যহীন জীবন-পরিণামের দিকে ভাসিয়া গেলেন। মুক্তবেণীর পরে যুক্তবেণী কোথাও দেখা যায় না, এখানেও দেখা গেল না।

প্রলোভন ও পদস্খলন গোবিন্দলালকে ঠেলিয়া দিল রোহিণীর নিকটে এবং ভ্রমর তাহার দৈবাহত জীবনের দুঃখকে সম্বল করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ঘটনাপ্রবাহেরও ভাটার দিক আছে। সেই ইতিহাস শুরু হইয়াছে গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে, প্রসাদপুরে অবস্থিত গোবিন্দলালের জীবনে ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা দিল। রোহিণীকেও বুঝিতে হইল যে সে গোবিন্দ-লালের অন্তরে স্থান পায় নাই, কেননা ভ্রমর অন্তরে, সে বাহিরে। রোহিণীর অন্তরে প্রণয় ছিল না, ছিল অচরিতার্থ কামনা। ইহা জিগীষার রূপে গোবিন্দ-লালকে জয় করিয়াছিল, আবার রূপবান নিশাকরকে দেখিয়াও সে প্রলুব্ধ

হইয়াছিল। ইহার পরিণাম হইল অনুশোচনাকাতর গোবিন্দলালের হস্তে রোহিণীর মৃত্যু, গোবিন্দলালের বিচার ও মুক্তিলাভ।

বিচ্ছেদের ছয় বৎসর পরে নিঃস্ব গোবিন্দলাল ভ্রমরকে অর্থসাহায্য চাহিয়া পত্র দিলেন। 'আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি, আমায় তুমি স্থান দিবে কি ?'—এই উক্তির মধ্যে অনুশোচনাদগ্ধ, ভাগ্যহত গোবিন্দলালের পরিত্যক্ত ছিন্নসূত্র কুড়াইয়া লইবার আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ভ্রমরের ক্ষমাহীন দাম্পত্য জীবনের আদর্শ তাঁহার সেই প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান করিল। উভয়ের শেষ সাক্ষাৎকার হইল সপ্তম বৎসরের ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত্রিতে। মৃত্যুর পূর্বে স্বামীর পদধূলি লইয়া সে আশীর্বাদ চাহিয়া বলিল যেন, সে জন্মান্তরে সুখী হইতে পারে। ইহা যন্ত্রণা-কাতর মানবী-কন্যার শান্তির জন্য আকুলতাকে ব্যক্ত করে। স্বামীকে লইয়া জন্মান্তরে নূতন জীবন আরম্ভ করিবার কোন স্বপ্ন তাহার মধ্যে আর ছিল না। ইহার পর ঘটিয়াছে গোবিন্দলালের প্রায়শ্চিত্ত। অবশেষে সন্ন্যাস-জীবনে ভগবৎ পাদপদ্মে জীবন-মন সমর্পণ করিয়া তিনি ভ্রমরাধিক ভ্রমরকে লাভ করিয়াছেন।

উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের বর্ণিত ঘটনাবলী একের পর এক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উইল পরিবর্তন হইতে শুরু করিয়া গোবিন্দলালের মাতার কাশীযাত্রা যেন এক অদৃশ্য, অভাবনীয় ও অমোঘ নিয়মে ঘটিয়া গিয়াছে এবং ইহাদের ধারা গোবিন্দলাল-ভ্রমর ও রোহিণীর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তাঁহারা নিয়তিচালিত হইয়া যেন পরিণাম অভিমুখে ধাবিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ড হইল উপসংহার। প্রথম খণ্ডের বিস্তার এখানে আসিয়া সঙ্কুচিত, সংহত ও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে।

সুতরাং 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' লিপিকুশলতা অসাধারণ। একটিমাত্র কাহিনীকে অনুসরণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মানব-জীবনের এক মর্মান্তিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। মর্মান্তিক এই অর্থ যে, মানুষের জীবন স্ব-বশীভূত নহে। সে যেন বাহিরের শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আবার যে দুঃখ মানুষ পায় তাহা তাহার স্বভাব হেতু। গোবিন্দলালের রূপলালসা, ভ্রমরের অনুচিত অহমিকাবোধ ও রোহিণীর বাস্তবাতিরিক্ত প্রত্যাশা তাহাদের জীবনে দুঃখ আনিয়াছে, কিন্তু তাহাদের স্বভাবে ছিল উহাদের বীজ। আখ্যায়িকার প্রবাহে আমরা বীজের পরিণাম দর্শন করিয়া বিস্মিত হই।

গ্রন্থে ত্রুটির দিক বিশেষ নাই বলিলেও চলে। তথাপি রোহিণী সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন মনে ওঠে। বারুণীর ঘাটে তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া গোবিন্দলাল তাহাকে বলিলেন যে, সে যেন তাহার দুঃখের কথা এখানে জানাইতে না

পারিলেও পরে গৃহের স্ত্রীলোকগণের দ্বারা জানায়। রোহিণী বলিল, 'একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে'। আবার গোবিন্দলাল যখন উইল চুরির অপরাধে ধৃতা রোহিণীকে অন্তঃপুরে আনিয়া জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করিলেন তখন সে আগাগোড়া গোবিন্দলালকে 'তুমি' নহে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া উত্তর দিয়াছে। কিন্তু আবার জল হইতে উদ্ধার করিবার পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সে গোবিন্দলালকে 'আপনি' ও 'তুমি' এই দুই ভাবে সম্বোধন করিয়াছে। তাহার এইরূপ রীতি হরলালের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। তাঁহার সহিত সম্ভ্রমার্থক রীতিতে কথোপকথন শুরু করিয়া পরমুহূর্তেই অন্তরঙ্গতার সুরে নামিয়া আসিয়াছে। আবার সুর বদল হইয়াছে। সে বলিয়াছে, 'কি বলুন—আমি প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব'। গ্রাম-সুবাদের দাবীতে 'তুমি' বলিলে অশোভন হইত না, কিন্তু গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে তাহার সুরের আকস্মিক পরিবর্তন সঙ্গত ও সুরুচিপূর্ণ বলিয়া মনে হয় না। রোহিণী অন্তরঙ্গ হইতে চাহে ইহা তাহার প্রমাণ।

উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কোন চরিত্রের বয়স উল্লেখ করেন নাই। 'বিষবৃক্ষে' তিনি প্রত্যেকের বয়স ও রূপগুণের পরিচয় দিয়াছেন। এখানে মাধবীনাথ ব্যতীত কাহারও বয়সের উল্লেখ নাই, রূপের বর্ণনাও প্রথাসিদ্ধ। একমাত্র ভ্রমরের রূপ গোবিন্দলালের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হওয়ায় তাহা বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। মাধবীনাথের পরিচয় প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বয়স একচত্বারিংশৎ বৎসর, দেখিতে তিনি বড় সুপুরুষ। তাঁহার রূপ-বর্ণনার অবকাশ সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দৃষ্টিতে স্বামীবিরহ-কাতরা, বিশীর্ণা ভ্রমরের পরিচয় দান করিতে চাহিয়াছেন। মাধবীনাথ 'দেখিলেন—সেই শ্যামাসুন্দরী, যাহার সর্বাবয়ব সুললিত গঠন ছিল—এক্ষণে বিশুষ্কবদন, শীর্ণশরীর, প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্ন—নয়নেন্দীবর'।

ওস্তাদ দানেশ খাঁর সঙ্গীত-নৈপুণ্যের বর্ণনার ক্ষেত্রে সঙ্গতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। যাঁহার কণ্ঠরবকে তিনি বৃষভদুর্লভ ও তান বিস্তারকে বহুবিধ খিঁচুনি বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন পরে আবার সেই ওস্তাদের 'বিশুদ্ধ স্বরসপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টির' প্রশংসা করিয়াছেন। ওস্তাদ বোধ হয় সুরের গুরু, কিন্তু বঙ্কিম তাঁহার পরিবেশন প্রণালীকে লঘু ব্যঙ্গ করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কসরৎ বাস্তবিক পীড়াদায়ক। তবে এই ত্রুটিসমূহ সামান্য। ইহার ফলে উপন্যাসের উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

ট্র্যাজেডি রূপে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'

ট্র্যাজেডির করুণ পরিণাম কদাপি দৈবচক্রান্তে সংঘটিত হয় না। অশেষ গুণালঙ্কৃত মানুষের চরিত্রের এমন একটি গোপন রন্ধ্রপথ থাকে যে পথে কলি প্রবেশ

করিবার সুযোগ পায়। তখন সেই মানুষ এমন একটি কার্য করেন যাহা তাঁহার ও অপরাপর ব্যক্তিগণের জীবনে দুঃখবহ পরিণাম আনয়ন করে। তখন শত চেষ্টা করিয়াও তিনি সর্বনাশা পরিণতির হস্ত হইতে রক্ষা পান না। যে প্রতিকূল অব[illegible] ঘনাইয়া আসে তাহাকে নিয়তি নাম দিলেও ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, মূলতঃ উহা তাঁহার কৃতকার্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। যিনি মৃত্যুর আশ্রয় লাভ করিলেন তিনি দুঃখভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, কিন্তু যিনি বাঁচিয়া রহিলেন তাঁহাকে পলে পলে দুঃখের তীব্রতার আলোড়নে তলাইয়া যাইতে হয়।

নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল উভয়ে রূপবান ও গুণবান পুরুষ। দাম্পত্য জীবনে উভয়ে সুখী। সূর্যমুখী সুন্দরী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, সুতরাং নগেন্দ্রের দিক হইতে রূপ-পিপাসার আকর্ষণ অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। তথাপি কুন্দনন্দিনীর মধ্যে তিনি এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করিলেন যাহা তাঁহার সংযম ও স্থৈর্যকে বিচলিত করিল। গোবিন্দলাল যতই রোহিণীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করিলেন ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, এতকাল তিনি গুণের সেবা করিয়াছেন, এইবারে তিনি রূপের সেবা করিবেন। কিন্তু রোহিণীর প্রতি মোহাচ্ছন্ন হইবার পূর্বপর্যন্ত তিনি ভ্রমরের মধ্যে গুণরাশি প্রত্যক্ষ করিতেন এবং সেই গুণসমূহ রূপমূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার চিত্তকে প্রসন্ন করিত। ভ্রমর গোবিন্দলালের মধ্যে দেখিত রূপ, কিন্তু সেই রূপ ছিল গুণের বহিঃপ্রকাশ। ভ্রমর গোবিন্দলালের স্নেহপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি ও প্রমত্ত চক্ষু দেখিয়া ভাবিত যে, এই সমুদ্র সে কদাপি ইহজীবনে সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিবে না আর গোবিন্দলাল ভ্রমরের চাহনি দেখিয়া সংসার ভুলিয়া যাইত। তবে নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল উভয়ের ক্ষেত্রে প্রমত্ততার কারণ হইল নূতনের প্রতি দুর্দমনীয় বাসনা। ইহার আকর্ষণে পুরাতন অনেক ক্ষেত্রে ভাসিয়া যায়। নূতন অনন্তের অংশ, অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত। এই নূতনের রূপ-মোহে নরেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল ও সীতারাম ভাসিয়া গিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথের মধ্যে রূপমোহ দেখা দিলেও তিনি কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়া দাম্পত্য জীবনকে বৈধ স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন। তিনি কদাপি অবৈধ ভোগ-লালসার ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে সম্মত হইতেন না, কুন্দও হইত না। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগের পরে তাঁহার মোহ ভঙ্গ হইল, যিনি আবার পুরাতনকে পাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে কিন্তু ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। যে কারণে হরলাল রোহিণীকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই, সেই কারণ অর্থাৎ আভিজাত্যবোধ গোবিন্দলালের মনেও ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তাই তিনি রোহিণীকে ভোগের ক্ষেত্রে রাখিয়া দিয়াছিলেন। প্রসাদপুরের

জীবনযাত্রায় দেখিতে পাই যে, ভ্রমর গোবিন্দলালের চিত্তে প্রবল প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। রোহিণীকে গ্রহণ করিবার পরে তাঁহার মন হইতে রূপমোহ বহুলাংশে বিদূরিত হইয়াছিল। কিন্তু রোহিণীর কটাক্ষের মাধুর্য তিনি ভুলিতে না পারিলেও তাঁহাকে বুঝিতে হইয়াছিল যে, এই রূপতৃষ্ণা মন্দার ঘর্ষণ-পীড়িত বাসুকি নিঃশ্বাস-নির্গত হলাহল।

গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে এই রূপমোহ ধাপে ধাপে স্পষ্ট হইয়াছে। রোহিণীকে বারুণীর ঘাটে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহার মনে দেখা দিল দুঃখবোধ। 'সংসার-পতঙ্গ' রোহিণীর দুঃখ নিবারণের জন্য তাঁহার মন সচেষ্ট হইল। দ্বিতীয় পর্যায়ে রোহিণীর প্রণয় জ্ঞাপনে গোবিন্দলালের হৃদয়ে দয়ার উচ্ছ্বাস দেখা দিল। কিন্তু ইহা যে তাঁহার বাসনার ছদ্মবেশে দেখা দিয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তৃতীয় পর্যায়ে রোহিণীর মুখে তাহার দারুণ তৃষ্ণার কথা জানিতে পারিয়া গোবিন্দলালের আত্মসংযম বিচলিত হইয়াছে। তিনি ভ্রমর ও তাঁহার বিপদের কথা স্মরণ করিয়া আত্মজয়ের সংকল্প করিয়াছেন। কিন্তু বন্দরখালি হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে ভ্রমরকে গৃহে না দেখিয়া গোবিন্দলালের রোহিণী-সম্পর্কে দুঃখবোধ প্রবল বাসনায় রূপান্তরিত হইল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু ভোগজীবনের সুযোগ আনিয়া দিল।

রোহিণীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ স্তরসমূহ লক্ষ্য করা যায়। উইল চুরির পরে গোবিন্দলালের নিকট হইতে সহানুভূতি লাভে তাহার মধ্যে দেখা দিল করুণা ও অনুশোচনা। ইহার পরে জাল উইল রাখিতে যাইয়া সে ধরা পড়িল। এইবারে গোবিন্দলালের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার মধ্যে বাসনা-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইহার পরে তাহার মধ্যে আর কোন কর্তব্যবুদ্ধি ছিল না, সমাজ-ভীতিও রহিল না।

নগেন্দ্র ও গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে ত্রুটি হইল যে, তাঁহাদের জীবনে কদাপি আত্মসংযমের জন্য চেষ্টা করিতে হয় নাই। প্রবৃত্তি-তাড়িত মনকে সংযত করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক তাহা তাঁহাদের ঘটে নাই। 'অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল ; পূর্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না'। রোহিণীর ক্ষেত্রে ত্রুটি হইল যে, সে বুঝিতে পারে নাই যে, সকল সুখেরই সীমা আছে। সে মনে করিয়াছিল যে, গোবিন্দলালকে পাইলে তাহার জীবনের সার্থকতা ঘটিবে। কিন্তু যখন সে তাঁহাকে লাভ করিল তখন দেখিল যে, তিনি অপ্রাপণীয়। ভ্রমর তাঁহার মন অধিকার করিয়া আছে। গোবিন্দলালের প্রতি সত্যকার প্রণয় রোহিণীর ছিল না। সে চাহিয়াছিল জয়পতাকা উড়াইতে। শ্রেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে? রোহিণীর চরিত্রে কোন নৈতিক ভিত্তি না থাকায় সে পুরুষকে জয় করিতে চাহিয়াছে এবং ইহার জন্য

তাহাকে চরম মূল্য দিতে হইয়াছে। তাহার মৃত্যু তাহার কার্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ভ্রমরের ক্ষেত্রে ত্রুটি হইল তাহার অহমিকাবোধ। সতীত্বের আদর্শ তাহার মধ্যে প্রবল সংস্কার রূপে দেখা দিয়াছিল। সত্যকারের মমতা ও প্রীতিবোধ থাকিলে সে ক্ষমাগুণে ও ঔদার্যে গোবিন্দলালকেও সুখী করিতে পারিত, নিজেও সুখী হইত। ইহা না করিয়া এক কল্পিত সতীধর্মের আদর্শে সে নিজের মনকে পাষাণ করিয়া তুলিয়াছিল। মৃত্যুকালেও ক্রন্দনরত স্বামীকে দেখিয়া তাহার মন দ্রবীভূত হয় নাই। সে জন্মান্তরে সুখী হইবার জন্য আশীর্বাদ চাহিয়াছে মাত্র। বিচারবুদ্ধির অভাবহেতু বন্দরখালিতে গোবিন্দলালকে তাহার কঠোর ভাষায় পত্রপ্রেরণ ও পিত্রালয়ে গমন উভয়ের বিচ্ছেদকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

তথাপি ভ্রমর ও রোহিণী মৃত্যুর মধ্য দিয়া শান্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু 'গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য'। ভ্রমরের মৃত্যুর পরে যে মানসিক যন্ত্রণা তিনি ভোগ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার চরিত্রকে ট্রাজেডির মহিমা দান করিয়াছে। মানসিক দৃঢ়তা লইয়া তিনি অসহনীয় দুঃখ ভোগ করিয়াছেন।

ভ্রমরের দেহাবসানের বারো বৎসর পরে অজ্ঞাতবাস-পর্ব শেষ করিয়া হরিদ্রাগ্রামে গোবিন্দলাল আবার আসিলেন। ভাগিনেয় শচীকান্তকে তিনি বলিলেন যে, ভগবৎপাদপদ্মে মনঃস্থাপন করিয়া তিনি শান্তি পাইয়াছেন। এখন ঈশ্বর তাঁহার নিকটে ভ্রমর, ভ্রমরাধিক ভ্রমর। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র চিরাচরিত অনুশোচনা ও দুঃখের মধ্যে গ্রন্থের সমাপ্তি না করিয়া আধ্যাত্মিক প্রশান্তির মধ্যে কাহিনীর উপসংহার করিয়াছেন। গোবিন্দলালের এই পরিণতি তাঁহার জীবনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে। সকল ক্ষয়-ক্ষতির ঊর্ধ্বে জীবনের মহিমা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তথাপি ট্রাজেডির সুর তাহার জীবনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

চরিত্র-চিত্র

কৃষ্ণকান্ত রায়

হরিদ্রাগ্রামের কৃষ্ণকান্তের জমিদারির আয় বিপুল, মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। বিষয় উভয় ভ্রাতার অর্জিত হইলেও, রামকান্তের মৃত্যুর পরে তিনি ইচ্ছা করিলে ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালকে ফাঁকি দিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি ন্যায্যতঃ সম্পত্তি ভাগ করিতে যাইয়া সংসারে যে অশান্তির আগুন সৃষ্টি করিলেন তাহাতে রায় পরিবার ধ্বংস হইল। জ্যেষ্ঠ

পুত্র হরলাল যেমন অবাধ্য, তেমনি স্বার্থপর। সে পিতাকে বিধবা-বিবাহের ভীতি প্রদর্শন করিলে ফল বিপরীত হইল। কৃষ্ণকান্ত স্নেহশীল পিতা, কিন্তু কর্তব্যপালনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তৃতীয়বারে উইল পরিবর্তন করিয়া তিনি হরলালকে বঞ্চিত করিলেন, কিন্তু তাঁহার শিশুপুত্রকে একপাই লিখিয়া দিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র বিনোদলাল তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি মত পরিবর্তন করিলেন না। কৃষ্ণকান্তের এই কার্য তাঁহার কর্তব্যবোধ ও নীতিজ্ঞানের পরিচয় দেয়। হরলালের ভীতি প্রদর্শনের উত্তরে তিনি তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার ত্যজ্যপুত্র। 'তুমি এই বিবাহ (বিধবা) করিলে আমি উইল বদলাইব বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না'। কৃষ্ণকান্তের চরিত্রের এইরূপ দৃঢ় মনোবল ও পারিবারিক হিতসাধনের প্রয়াস তাঁহার শেষবার উইল পরিবর্তনের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। গোবিন্দলালকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। রোহিণী সম্পর্কিত অনেক কথা তাঁহার কানে উঠিয়াছিল। ইহাতে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন, কেননা গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক রটিলে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। কিন্তু পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি আর গোবিন্দলালকে কিছু বলিতে পারিলেন না। তবে মৃত্যুর পূর্বে যে উইল তিনি পরিবর্তন করিলেন তাহাতে সম্পত্তির অর্ধাংশ ভ্রমর পাইবে, তাহার অবর্তমানে গোবিন্দলাল পাইবে। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের শুভ চিন্তা করিয়া এই পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত তাঁহাকে ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া গেলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের ন্যায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ইহার অপরদিক চিন্তা করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে সম্পত্তির অধিকারিণী করিলে গোবিন্দলালের পতন আরও দ্রুত হইবে। স্ত্রীর অন্নদাস হইয়া না থাকিবার অজুহাতে উভয়ের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইবে। এই উইল পরিবর্তন যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের ভাগ্যেরও পরিবর্তন ঘটাইবে ইহা কৃষ্ণকান্ত ভাবিতে পারেন নাই। ইহার ফলে গোবিন্দলালের জীবনে যে পরিবর্তন ঘটিল তাহাতে তাঁহার ও ভ্রমরের দাম্পত্য জীবনের চরম বিপর্যয় সাধিত হইল।

কৃষ্ণকান্ত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। অহিফেনের নেশায় কমলাকান্ত বিশ্বরূপ দর্শন করিতেন, আর কৃষ্ণকান্ত দেখেন যে, তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি হরলাল তিন টাকা তের আনা দু-কড়া দু-ক্রান্তি মূল্যে কিনিয়া লইয়াছে। তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন যে, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু বৃষভারূঢ় মহাদেবের নিকট হইতে এক কৌটা আফিম কর্জ লইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন। রোহিণীর ডাক শুনিয়া তাঁহার মনে হইল যে, ইহা নন্দীর কণ্ঠস্বর। তিনি বলিলেন, 'ঠাকুরকে এই

'বেলা ক্ষৌরক্লোজ করিতে বল'। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, সাংসারিক হিসাবী বুদ্ধির জোরে কৃষ্ণকান্ত তাঁহার সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। গভীর নিশীথে তাঁহার মনে হইল যে, তিনি হরিঘোষের মোকর্দমায় জাল দলিল দাখিল করায় জেলখানায় গিয়াছেন। চাবি খোলার শব্দ অল্প কানে যাওয়ায় তাঁহার মনে হইল যে, জেলের চাবি পড়িল। জমিদারি-সংক্রান্ত কাজে তিনিও কুটিল পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, নচেৎ, এই জাতীয় স্বপ্ন দেখিবেন কেন? কমলাকান্ত যেখানে দেখেন যে, সংসার একটি বড় বাজার অথবা মনুষ্যমাত্রই পতঙ্গ অথবা ঢেঁকিশালায় সকলে পিষ্ট হইতেছে, সেখানে কৃষ্ণকান্তের মামলা-মোকর্দমা, তমসুক ও জাল দলিলের স্বপ্ন নিঃসন্দেহে তাঁহার বিষয়বুদ্ধিকে প্রমাণিত করে।

তবে অহিফেন প্রসাদে তাঁহার মধ্যেও রসিকতাবোধের অভাব নাই। রোহিণীকে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা প্রভৃতি নামে সম্বোধন, আফিমের জন্য তাহার ও ব্রহ্মানন্দ ঘোষের প্রার্থনা অনুমান করিয়া তাঁহার মানসিক প্রতিক্রিয়া, রোহিণীর জন্য গোবিন্দলালের সহানুভূতি দর্শনে তাঁহার সরস মন্তব্য ও পরিশেষে তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য একজন চাকরাণী সহ রোহিণীকে মেজবৌমা ভ্রমরের নিকটে প্রেরণ তাঁহার রহস্য-বোধের পরিচয় দান করে।

আফিমের মৌতাত জমিলে কৃষ্ণকান্ত ত্রিভুবনগামী অশ্বে আরূঢ় হইয়া নানাস্থান পর্যটন করেন। 'চাঁদ কোথায় উদয় না হয়'—রোহিণীর চাঁদপানা মুখ তাঁহার অন্তরেও ঢুকিয়াছিল, নচেৎ তিনি কেন দেখিবেন যে, ইন্দ্রাণীর স্কন্ধে রোহিণীর মুখ স্থাপিত ও মহাদেবের গোয়াল হইতে ষাঁড় চুরি করিতে যাইয়া রোহিণী-রূপিণী শচী ধরা পড়িয়াছে। গোবিন্দলাল লজ্জায় রোহিণীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারিতেছে না। কৃষ্ণকান্তও নানা কথা তুলিয়া মূল বিষয়টি চাপা দিতে চাহিয়াছেন। পরে তিনি নিজেই রোহিণীর কথা তুলিয়া বলিলেন, 'আর তোমরা যদি এমনই বিবেচনা কর যে, উহার দোষ নাই—তবে ছাড়িয়া দাও'। যৌথ পরিবারের কর্তারূপে কৃষ্ণকান্তের চরিত্রটি বড় সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। বিষয়বুদ্ধি তাঁহার প্রবল, কর্তব্যবোধে তিনি অটল, আবার স্নেহশীলতায় তাঁহার চরিত্রটির মধুর। তাঁহার মৃত্যুর পরে দেশের লোক তাই বলিয়াছে 'একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে'। তিনি বিষয়ী লোক হইলেও খাঁটি লোক ছিলেন এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট দান করিতেন। তাই তাঁহার মৃত্যুতে অনেকে কাতর হইয়াছিল।

গোবিন্দলাল

অশেষ গুণালঙ্কৃত পুরুষও একটিমাত্র ত্রুটির জন্য চরিত্রের ভারসাম্য হারাইয়া শোকাবহ পরিণামের মধ্যে জীবনের অবসান ঘটাইয়া থাকে। উক্ত ত্রুটিপথে

কৃতকর্মের রূপ ধরিয়া নিয়তি প্রবেশ করে এবং সেই নিয়তির হস্ত হইতে তাহার উদ্ধার পাইবার কোন উপায় থাকে না। তাহার পতন যেমন আকস্মিক, পরিণামও তদ্রূপ দুঃখকর। গোবিন্দলাল সেই জাতীয় ভাগ্যহত পুরুষ যাহার জন্য সকলে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া থাকে। নগেন্দ্রনাথের ন্যায় গোবিন্দলাল সর্বগুণালঙ্কৃত না হইলেও তিনি শিক্ষিত, মার্জিত রুচিসম্পন্ন, উদার যুবাপুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্র এই সুদর্শন পুরুষের পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন, 'তাঁহার অতি নিবিড় কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজি নির্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে,—কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে'। অন্যত্র তাঁহাকে মূর্তিমান স্কন্দবীরের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। দাম্পত্য জীবনে নগেন্দ্রনাথের ন্যায় গোবিন্দলালও ছিলেন সুখী। ভ্রমর সূর্যমুখীর ন্যায় তপ্তকাঞ্চনবর্ণা না হইলেও তাহার গুণরাজি শ্যামল কান্তির উপরে মাধুর্য বিস্তার করিয়াছিল। গোবিন্দলাল তাহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন। তাহার একান্তরূপে পতিনির্ভরতা, সরলতা ও বালিকাস্বভাব তাঁহাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অন্তরে যে অতৃপ্ত রূপ-তৃষ্ণা ছিল, যাহা ভ্রমরের দ্বারা পূর্ণ হয় নাই, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। অনুকূল অবকাশে রোহিণীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া তাঁহার কামনা জ্বলিয়া উঠিল। ধর্মাধর্ম ও কর্তব্যজ্ঞান ভুলিয়া তিনি লালসার বহ্নিতে নিজেকে সমর্পণ করিলেন। এই বহ্নির দাহে সীতারাম, তাঁহার পরিবার ও রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু কামনা-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া গোবিন্দলালের মধ্যে আসিল অবসাদ ও ক্লান্তি। রোহিণীকে পাইয়া তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, ভ্রমর তাঁহার অন্তরে সম্রাজ্ঞীর ন্যায় অধিষ্ঠিতা, রোহিণী নিতান্ত ভোগ্য-দ্রব্যরূপে বাহিরে অবস্থিতা। রূপজমোহের পরিণতি হইল আত্মানুশোচনা ও বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের প্রয়াস।

গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে পদস্খলন ধীরগতিতে অথচ অনিবার্যভাবে ঘটিয়াছিল। তাঁহার অন্তরের প্রলোভন জাগিয়া উঠিবার পক্ষে বাহিরের ঘটনাবলী উদ্দীপন বিভাবের কাজ করিয়াছে। বাহিরের অনুকূল সহায়তা না থাকিলে গোবিন্দলালের পক্ষে সমাজ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া ও নীতিধর্মকে লঙ্ঘন করিয়া কামনার মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করা সম্ভব হইত না। নগেন্দ্রনাথের শিক্ষিত মন কদাপি সমাজ-বহির্ভূত প্রেমকে গ্রহণ করিত না। তিনি তাঁহার আকাঙ্ক্ষাকে সমাজ-বন্ধনের মধ্যে তৃপ্ত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া অবৈধ ভোগে মত্ত হইতে কোন বাধা ঘটে নাই। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু ও মাতার কাশীযাত্রা তাঁহার মনকে দাম্পত্যজীবনের কর্তব্যবোধ হইতে মুক্তি দিয়াছে।

নগেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকর্ষণ যেমন অকস্মাৎ প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল, গোবিন্দলালের ক্ষেত্রেও রূপলালসা, দুঃখবোধ, সহানুভূতি এবং স্মৃতির স্তর পার হইয়া বাসনারূপে জ্বলিয়া উঠিল। 'পূর্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না'—'নগেন্দ্রের ন্যায় গোবিন্দলালের জীবনেও দুঃখের দীক্ষা ঘটে নাই। 'অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল'—এই দুঃখ তাঁহাদের জীবনকে ছিন্নমূল করিয়া অসীম বেদনার সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল।

বারুণী পুষ্করিণী তীরে পুষ্পশোভিত উদ্যানে, কোকিলের সঙ্গীত-মুখরিত বসন্তকালের অপরাহ্নে ক্রন্দনরতা রোহিণীকে দেখিয়া গোবিন্দলালের মনে হইল যে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষের অকরুণতা বড় নির্মম। 'সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ'। তিনি তাই জগৎ-পিতা প্রেরিত মনুষ্য-পতঙ্গের দুঃখ নিবারণের জন্য ব্যাকুলতা বোধ করিলেন। রোহিণী তাঁহার হৃদয়কে জানিতে পারিয়া নিশ্চয়তার সুরে বলিল 'একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে'। প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশ গোবিন্দলালের হৃদয়কে করুণায় দ্রবীভূত করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতি যে বিচিত্র ছলনাজালে সৃষ্টির পথ আকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ইহা বুঝিবার শক্তি গোবিন্দলালের ছিল না।

পরদুঃখকাতরতাহেতু গোবিন্দলাল উইল চুরির দণ্ড হইতে রোহিণীকে রক্ষা করিতে গেলেন। রোহিণী তাঁহাকে চিনিতে ভুল করে নাই। সে মনে মনে বলিল, 'আমি ত মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব'। ইহা প্রেমিকার মনোভাব নহে, ছলনাময়ী নারীর জিগীষার আকাঙ্ক্ষা। সে গোবিন্দলালকে বলিল যে, তাহার রোগের চিকিৎসা নাই, মুক্তিও নাই। গোবিন্দলাল বুঝিলেন যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এই নারীর ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। তখন তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।

গোবিন্দলালের জীবনে সত্যকার সংঘাত দেখা দিল রোহিণীকে জল হইতে উদ্ধার করিয়া পুনর্জীবন দান করিবার পরে। রোহিণী অকপটে তাহার হৃদয়ের অতৃপ্ত দারুণ তৃষ্ণা ও অনধিগম্য শীতল জলের কথা জানাইল। গোবিন্দলাল বিজনকক্ষে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। 'তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্ম-জয় করিব'।

ভ্রমরের নিকটে সত্য গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহার অন্তরের দুর্বলতা পরিস্ফুট হইয়াছে। ভ্রমরের মনে সংশয়ের কালো মেঘ উদিত হইল। গোবিন্দলালের চিত্তে 'নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ' আবির্ভূত হইল। কিন্তু ভ্রমরের

নিকটে কৃতঘ্ন হইবেন না. এইজন্য রোহিণীকে ভুলিবার আশায় তিনি বন্দরখালি মহালে যাত্রা করিলেন। ইহার পরে ক্ষীরি চাকরাণীর প্রগলভতায়, রটনা কৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণের আগ্রহে ও হিতোপদেশে, রোহিণীর নির্লজ্জার ন্যায় গিল্টি করা সোনার গহনা প্রদর্শনে, ভ্রমরের মন স্বামীর প্রতি কঠিন হইয়া উঠিল। সে স্বামীকে লিখিল যে, যতদিন তিনি ভক্তির যোগ্য, ততদিন তাহারও ভক্তি। তাহার দর্শনে আর তাহার সুখ নাই। গোবিন্দলাল ফিরিয়া গৃহে ভ্রমরকে পাইলেন না। তখন রোহিণীর স্মৃতি বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল অধঃপতনের ধাপে ধাপে নামিতে শুরু করিলেন। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু ও মাতার কাশীধামে যাইবার সঙ্কল্প গোবিন্দলালের দাম্পত্য জীবনের শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন করিল। ভ্রমরের অশ্রুকাতর প্রার্থনা, ধর্মবোধ অথবা সমাজ-সংস্কার, কোন কিছু গোবিন্দলালকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। ভ্রমর জানাইল যে, তাঁহাকে তাহার জন্য কাঁদিতে হইবে। 'তুমি আমারই—রোহিণীর নও'।

রোহিণীকে পাইয়া গোবিন্দলালকে বুঝিতে হইল যে, এই রূপতৃষ্ণা বাসুকি নিঃশ্বাস নির্গত হলাহল তুল্য, ইহার মধ্যে সুধার আশ্বাস নাই। রোহিণী বাহিরে, অন্তরে ভ্রমর একেশ্বরী। তাই নিশাকরের মুখে প্রায় দুই বৎসর পরে ভ্রমরের নাম শুনিয়া গোবিন্দলাল কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রন্দন ব্যতীত তাঁহার কোন উপায় ছিল না। রোহিণীর বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি তাহাকে চরম দণ্ড দিলেন, এই দণ্ডের অংশ তাঁহারও।

ছয় বৎসর পরে নিঃস্ব অবস্থায় গোবিন্দলাল ভ্রমরের কৃপা ভিক্ষা করিয়া পত্র দিলেন। কিন্তু যে উত্তর আসিল তাহা কোমলতাবর্জিত ও বড় নিষ্করুণ। উভয়ের মিলনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইল। ভ্রমরের মৃত্যুকালে গোবিন্দলাল আসিলেন। ভ্রমর তাঁহার পদধূলি লইয়া জন্মান্তরে সুখী হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইল। ভ্রমর মৃত্যুতে শান্তি লাভ করিল, কিন্তু গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য।

দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পরে গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে উপস্থিত হইলেন। ভাগিনেয় শচীকান্ত প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে স্বুবর্ণনির্মিত ভ্রমরমূর্তি দেখিয়া তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। শচীকান্তকে তিনি বলিলেন যে, ভগবৎপাদপদ্মে মনঃ স্থাপন করিয়া তিনি শান্তি পাইয়াছেন। এখন তিনিই তাঁহার সম্পত্তি, তাঁহার ভ্রমরাধিক ভ্রমর।

নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের পরিণতির ইতিহাসে ভিন্নতা দেখা যায়। উভয়ে রূপমোহে আকৃষ্ট হইয়া দাম্পত্যবন্ধন হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। তথাপি নগেন্দ্র-নাথের ক্ষেত্রে রূপমোহ তাঁহাকে অসামাজিক জীবনে আকৃষ্ট করে নাই। সূর্যমুখী

কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাদের সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সূর্যমুখীর অভিমানবশতঃ গৃহত্যাগ ও নগেন্দ্রনাথের মোহাবসান, পুনর্বার উভয়ের মধ্যে মিলনের পথ প্রসারিত করিল। নগেন্দ্রনাথের মোহ সাময়িক ভ্রান্তিবশতঃ ঘটিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে বাহিরের অনুকূল ঘটনাবলী নিয়তির রূপ ধরিয়া তাঁহাকে সর্বনাশের অতল গহ্বরে আকর্ষণ করিল। ভ্রমর ও রোহিণী মৃত্যুর মধ্যে শান্তি লাভ করিল কিন্তু গোবিন্দলাল অশেষ দুঃখ সহ্য করিয়া অবশেষে ভগবৎ পাদপদ্মে মন স্থাপন করিলেন এবং লৌকিক দুঃখ-যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইলেন। অনুতাপজর্জর গোবিন্দলালের পক্ষে এই পরিণতি অত্যন্ত স্বাভাবিক। সীতারাম গোবিন্দলাল অপেক্ষাও প্রচণ্ড লালসায় তাড়িত, রাজ-ধর্মচ্যুত ও নীতিভ্রষ্ট। তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইল, জয়ন্তী এবং শ্রী অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। সীতারাম মহিষী, পুত্রকন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ সহ বৈরীশূন্য স্থানে আশ্রয় পাইলেন, কিন্তু কল্পনা করা যায় যে শত্রু আক্রমণের কালে তাঁহার নৈতিক জীবনের পুনরুজ্জীবন ও ঈশ্বরে বিশ্বাস তাঁহার পরবর্তী জীবনকে বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল। উভয় ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভাব রোমান্সের পরিচয় দিলেও তাহা বাস্তব জীবন হইতে বিচ্যুত নহে। ট্রাজেডির সুর উভয়ের জীবনে বর্তমান।

মাধবীনাথ

ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ সুপুরুষ, তাঁহার বয়স একচত্বারিংশৎ বৎসর। অনেকে তাঁহার প্রশংসা করিত আবার অনেকে বলিত যে, তাঁহার ন্যায় দুষ্ট লোক আর নাই। তাঁহার চতুর বুদ্ধির কথা সকলে স্বীকার করিত এবং যে তাঁহার প্রশংসা না করিত সে-ও তাঁহাকে ভয় করিত। রাজগ্রামে তাঁহার গৃহ এবং তিনিও সম্পদশালী ব্যক্তি।

গোবিন্দলালের গৃহত্যাগের পরে ভ্রমর তাঁহাকে ধর্মকর্ম করাইবার কথা জানাইল। সে পিতাকে বলিল, 'দিন ফুরাল ত আর বিলম্ব করিব কেন'? মাধবীনাথ কন্যার দুঃখে গভীর আঘাত পাইলেন। তাঁহার যন্ত্রণা ঘোরতর ক্রোধে রূপান্তরিত হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যেমন করিয়া হউক তাঁহার কন্যার সর্বনাশকারীর সমুচিত দণ্ড দিবেন। ভ্রমরকে তিনি তাঁহার গৃহে লইয়া যাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন ও কন্যার কার্যকারকবর্গের নিকটে আসিলেন। সেখানে দেওয়ানজীর নিকটে কোন সংবাদ পাইলেন না। তিনি জানিলেন যে,

গোবিন্দলালের এখন অজ্ঞাতবাসপর্ব চলিতেছে। চতুর মাধবীনাথ অনুমান করিলেন যে, ব্রহ্মানন্দ নিশ্চিত রোহিণীর সংবাদ রাখে। তিনি দরিদ্র, সুতরাং রোহিণীর নিশ্চিত নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকেন। কিন্তু এই সাহায্য রেজেস্টারী চিঠি মারফৎ আসিয়া থাকে। গ্রামের ডাকঘরে যাইয়া তিনি স্বল্পবেতনপ্রাপ্ত ডেপুটি পোস্টমাস্টারের সহিত কথোপকথন শুরু করিলেন। পিয়নকে তিনি তামাক খাইবার অছিলায় অন্যত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া ও আপনার ক্ষমতার কথা বলিয়া তিনি পোস্টমাস্টারকে অভিভূত করিলেন। গ্রাম্য পোস্টমাস্টার বুঝিলেন যে, জ্ঞাতব্য সংবাদ না দিলে তাঁহার ডাকঘরে আগুন জ্বলিবে ও সরকারী অর্থ অপহরণের জন্য তাঁহার ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইবে। মাধবীনাথ জানিতে পারিলেন যে, সকল পত্র যশোহর জিলার প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে। আবার তিনি ব্রহ্মানন্দকে চোরাই নোট রাখিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে রোহিণীর পত্র দেখিয়া লইলেন ও সকল জিনিস অবগত হইলেন। ইহার পরে তিনি তাঁহার অনুগত নিশাকরকে লইয়া প্রসাদপুরে উপস্থিত হইলেন।

মাধবীনাথের উদ্দেশ্য ছিল যে, নিশাকরকে দিয়া গোবিন্দলালের নিকটে ভ্রমর কর্তৃক তাঁহাকে কতকগুলি বিষয়ের পত্তনির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাঁহার অনুমোদন প্রার্থনা করা। মাধবীনাথ সম্ভবতঃ গোবিন্দলালের বর্তমান মানসিক অবস্থা জ্ঞাত হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে নিশাকরের প্রতি রোহিণীর আকর্ষণ পট-পরিবর্তন করিয়া দিল। ভ্রমরের নাম দুই বৎসর পরে শুনিয়া গোবিন্দলাল নির্জন কক্ষে কাঁদিতে লাগিলেন। রূপাকর্ষণ তাঁহার মানসিক অবসাদে পরিণত হইয়াছিল। এখন ছিল মাত্র রোহিণীর সঙ্গে অভ্যাসের বন্ধন, ইহার মধ্যে আনন্দ ছিল না, কোন তৃপ্তি ছিল না। নিশাকর রোহিণীর জন্য চিত্রার বাঁধা ঘাটে অপেক্ষা করিবার কথা জানাইয়া অপর এক ভৃত্য মারফৎ গোবিন্দলালকে সংবাদ জানাইল ও উপযুক্ত অবসরে সরিয়া পড়িল। মাধবীনাথ নিশাকরের মুখে সংবাদ জানিয়া পরিণতির জন্য গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন। গোবিন্দলাল চরম আত্মানুশোচনায় রোহিণীকে হত্যা করিলেন।

পঞ্চম বৎসর গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়া বিচারার্থ যশোহরে প্রেরিত হইলেন। ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে পিতাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিল ও বলিল 'বাবা এখন যা করিতে হয়, কর। দেখিও, আমি আত্মহত্যা না করি'। মাধবীনাথ কন্যার অর্থ যৎসামান্য ব্যয় করিবার কথা বলিয়া গোবিন্দলালকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। চতুর মাধবীনাথ অর্থদ্বারা সাক্ষীদিগকে বশীভূত করিলেন। সাক্ষীদের

প্রদত্ত জবানবন্দীর বিপরীত কথাবার্তায় উকিল-সরকার অপ্রতিভ হইলেন। বিচারক গোয়েন্দা ফিচেল খাঁর উপরে অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে মাধবীনাথকে দেখিয়া গোবিন্দলাল সব বুঝিলেন। জেল হইতে মুক্ত হইবার পরে মাধবীনাথ আর গোবিন্দলালকে পাইলেন না। ভ্রমরের মৃত্যুর পরদিন গোবিন্দলালের সঙ্গে মাধবীনাথের দেখা হইল বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। কিন্তু বারুণী পুষ্করিণী তীরে মূর্ছিত গোবিন্দলালকে দেখিয়া তাঁহারও দয়া হইল। তিনি তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। সুস্থ হইয়া গোবিন্দলাল গ্রাম ত্যাগ করিলেন।

উপন্যাসে মাধবীনাথের ভূমিকা দীর্ঘ না হইলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার চাতুর্যে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর মধ্যে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইয়াছে ও গোবিন্দলালের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। তিনি হয়ত জামাতা ও কন্যার মধ্যে পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করিতেন, কিন্তু ভাগ্য তাঁহার অনুকূল ছিল না। ভ্রমরের ক্ষমাহীন কঠিন সঙ্কল্প ও দুষ্কৃতকারীর প্রতি অপ্রসন্নতা প্রত্যাশিত মিলনে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল। গৌণচরিত্রের জন্য সৃষ্ট হইয়াও মাধবীনাথ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করিয়াছেন।

রোহিণী

বাংলা উপন্যাসে তিনটি চরিত্র লইয়া সর্বাধিক আলোচনা হইয়াছে। এই চরিত্রগুলি হইল রোহিণী, অচলা ও বিমলা। তিনটি চরিত্রের কার্যকলাপ প্রচলিত আদর্শে পরিমাপযোগ্য নহে। ইহাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া ও আচরণ অত্যন্ত জটিল, সুতরাং মনস্তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যাযোগ্য। তথাপি রোহিণীকে লইয়া যত আলোচনা হইয়াছে অন্য কাহাকেও লইয়া তাহা হয় নাই।

রোহিণী বালবিধবা, রূপসী। তাহাকে সাধারণের পর্যায়ে ফেলা যায় না। কেননা সে বুদ্ধিমতী, আত্মসচেতন এবং সে অন্য সকল নারী হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে। হরলাল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইবার পরে গোবিন্দলালের সহানুভূতিস্পর্শে তাহার মানসিক সত্তার জাগরণ ও তাঁহার প্রতি আকর্ষণ, নৈরাশ্য-পীড়িত হইয়া বারুণী পুষ্করিণীতে নিমজ্জন ও গোবিন্দলালের প্রয়াসে পুনর্জীবন লাভ, ঘটনাবলীর আনুকূল্যে গোবিন্দলালকে লাভ ও স্বল্পকালীন ভোগজীবনের অন্তে তাহার চরম দণ্ডপ্রাপ্তি—পাঠকদের মনে প্রশ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রকেও বহুবার শুনিতে হইয়াছিল 'রোহিণীকে মারিলেন কেন?' কিন্তু পাঠকবর্গ এই

উত্তর দেন নাই যে, রোহিণীর পরিণতি কি হইতে পারিত। রোহিণী সকাতর অনুরোধ করিয়াছিল 'মারিও না মারিও না। আমার নবীন বয়স, নতুন সুখ'। সুতরাং গোবিন্দলাল যদি তাহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতেন তবে তাহা তাঁহার বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত মানসিক অবস্থায় স্বাভাবিক হইত কি না—এই কথা তাঁহারা ভাবেন নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে, রোহিণীর প্রেম সমাজ-বহির্ভূত হইলেও ইহার মধ্যে গভীরতা আছে এবং তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ড সামাজিক বিধান অনুযায়ী ঘটায় প্রেমের মূল্যকে স্বীকার করা হইল না। সামাজিক নীতি ও শিল্পের নীতি এক হইতে পারে না। সামাজিক নীতির নিয়মে বিধবা রোহিণীর প্রেম ও গোবিন্দলালের সঙ্গে তাহার বাস দণ্ডযোগ্য। কিন্তু শিল্পীর দৃষ্টিতে ব্যক্তি যথোচিত মূল্য লাভ করে বলিয়া নীতির প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। সুতরাং রোহিণীর মূল্যবোধের বিচার করিতে হইবে তাহার প্রেমের গভীরতার দ্বারা, নীতিবোধের দ্বারা নহে।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র রোহিণীর অপঘাত মৃত্যুর উল্লেখে বলিয়াছেন যে, ইহা সামাজিক নীতি রক্ষার জন্য সংঘটিত হইয়াছে। রোহিণীর সত্যকার গভীর ভালবাসা গোবিন্দলালের জন্য ছিল, তাঁহার জন্য সে আত্ম-বিলুপ্তির পথ বাছিয়া লইয়াছিল, কিন্তু এই প্রেমের মূল্য না দিয়া ঔপন্যাসিক সামাজিক কল্যাণের জন্য রোহিণীকে অপসারিত করিলেন। সমাজ-বিন্যাস অথবা সামাজিক নীতিবোধ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত যাহাই হউক না কেন, শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন নাই। তাঁহার মতে 'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে'। তিনি বলিয়াছেন 'সৌন্দর্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য'। তবে ইহা স্বভাবানুকারী হইলে চলিবে না, স্বভাবাতিরিক্ত হইবে। এক কথায় সৌন্দর্য যেখানে ভাব অপেক্ষা রূপসৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করে তথায় ইহার সার্থকতা। ইহাকে তিনি রসোদ্ভাবন বলিয়াছেন।

এখন বিচার্য বিষয় হইল যে, গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর সত্যকার প্রণয় সৃষ্ট হইয়াছিল কিনা এবং তাহার পরিণাম স্বাভাবিক কিনা।

হরলাল তাহাকে বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া তাহার মনের সুপ্ত কামনা জাগ্রত করিয়াছিলেন। সেই কামনার বশবর্তী হইয়া সে উইল-চুরি রূপ দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হইয়াছিল। প্রেমের জন্য এই জাতীয় কাজ অপরের পক্ষে অসাধ্য হইত। কুন্দ অথবা লবঙ্গলতার পক্ষে ইহা অসম্ভব ছিল। প্রেমের জন্য নারী দুঃসাহস গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু চৌর্যকার্যে ব্রতী হইতে পারে না। হরলাল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইবার পরে রোহিণী আপনার ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যহেতু বারুণী

ঘাটে কাঁদিতে লাগিলে গোবিন্দলাল তাহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। রোহিণী তাঁহাকে বলে যে, একদিন তাঁহাকে তাহার কথা শুনিতে হইবে। ইহা প্রেমের বাণী নহে, জিগীষাবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। বারুণীতটের পুষ্পোদ্যানে বসন্তকালের আতপ্ত পরিবেশে রোহিণী গোবিন্দলালকে প্রত্যহ দেখিয়াছে ও তাঁহার রূপ তাহার হৃদয়পটে গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহার মনের কথা জানিতে পারিলে তাহার ছায়া মাড়াইতেন না। রোহিণীর জীবনভার দুঃসহ হওয়ায় সে মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। গোবিন্দলাল পরদুঃখকাতরতাহেতু তাহাকে উইল-চুরির কলঙ্ক ও দণ্ড হইতে রক্ষা করিলেন। রোহিণী বিনা-সঙ্কোচে তাঁহাকে বলিলেন যে. তাহার এই রোগের অর্থাৎ প্রণয়াসক্তির চিকিৎসা নাই, মুক্তিও নাই। গোবিন্দলাল তাহার হৃদয়ের কথা বুঝিলেন ও তাঁহার মনে দয়ার উচ্ছাস উদ্বেল হইয়া উঠিল। রোহিণী যখন বুঝিল যে, গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন তখন সে বড় সুখী হইল। কিন্তু তাহার মনে আত্ম-পরিতৃপ্তির আনন্দ ছাড়া গোবিন্দলালের দাম্পত্য-জীবনের কথা মনে হইল না। আবার জল হইতে উদ্ধারের পরে সে অসঙ্কোচে গোবিন্দলালকে বলিয়াছে 'রাত্রিদিন দারুণ তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে,—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহ জন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই'। এই উক্তিও কামনাজর্জর রমণীর, ইহার মধ্যে ভীরু প্রণয়ের মাধুর্য নাই, বেদনা-কম্পিত আত্মনিবেদনের সৌরভ নাই।

রোহিণীর জীবনে ক্ষণিকের জন্য প্রেমের বেদনা দেখা দিয়াছিল। গোবিন্দ-লাল উভয়ের মঙ্গলের জন্য তাহাকে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। সে স্থির করিল হরিদ্রাগ্রাম স্বর্গ, ইহা গোবিন্দলালের মন্দির। ইহাকে ত্যাগ করিয়া তাহার কোথাও যাওয়া চলিবে না। সে ঈশ্বরের নিকটে কাতর প্রার্থনা জানাইল 'আমি বিধবা, আমার ধর্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু'? তাহার যন্ত্রণা দুঃসহ বলিয়া বোধ হইল। সেই হেতু নৈরাশ্যপীড়িতা রোহিণী তাহার প্রেমাস্পদকে ভ্রমরের জানিয়া ও অপ্রাপণীয় মনে করিয়া বারুণীর জলে ডুবিতে গিয়াছিল। কিন্তু সংজ্ঞা লাভের পরে গোবিন্দলালকে সে রাত্রিদিন তৃষ্ণার কথা বলিল। 'পঞ্চশরের-বেদনা মাধুরী' দ্বারা ইহা বাসররাত্রি রচনার আকাঙ্ক্ষা নহে, ইহা বঞ্চিতা রমণীর তপ্ত কামনার প্রকাশ। ইহার মধ্যে আছে জয়ের আকাঙ্ক্ষা, দুর্ভাবনা, দুঃস্বপ্নসম রাত্রিদিন প্রেমিকাকে ঘিরিয়া থাকিবার অভিপ্রায়। ইহা রাহুর প্রেম। ইহারই বহিঃপ্রকাশ হইল ভ্রমরকে তাহার গিল্টি করা গহনা দখাইবার নির্লজ্জতায়। যে মনোভাব হেতু একদা গোবিন্দলাল সম্পর্কে সে

ভাবিয়াছিল 'আমি ত মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব', সেই মনোভাবের বশবর্তী হইয়া সে ভ্রমর সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছিল 'যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব'।

গোবিন্দলালের সহানুভূতির পথ ধরিয়া রোহিণীর হৃদয়ে বাসনানল প্রজ্বলিত হইল। ঘটনাবলীর অনুকূল সহায়তায় সে গোবিন্দলালকে লাভ করিল। 'স্ত্রীলোকও পুরুষকে জয় করে—কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য'। কিন্তু গোবিন্দলালকে পাইয়া রোহিণীকে বুঝিতে হইল যে, সে তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই। অন্তর তাঁহার ভ্রমরময়—সে নিতান্ত বাহিরে। সে ভোগের সামগ্রী-রূপে উদাহৃত হইয়াছে, কিন্তু গোবিন্দলালের অন্তরে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। তাই নিশাকর যখন তাহার রূপ লইয়া উপস্থিত হইল তখন রোহিণী দেখিল 'মনুষ্যমধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান'। সুতরাং সে শিকারীর ন্যায় তাহাকে পাইতে চাহিল। 'নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে'। ইহার পরিণাম হইল তাহার মৃত্যু।

সুতরাং এই অনুমান অযথার্থ যে, গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর গভীর ভালবাসা ছিল। রোহিণীর কামনা জিগীষাবৃত্তির রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুও অহেতুক জবরদস্তি নহে, ইহা তাহার ভোগলালসাপূর্ণ জীবন-প্রবাহের অনিবার্য পরিণাম।

ভ্রমর

বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরের মৃত্যুর পরে গোবিন্দলাল প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি যদি ভ্রমরের নিকটে আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন তবে সে তাঁহাকে ক্ষমা করিত, কেননা 'রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী,—রমণী ঈশ্বরের কীর্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া, সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া'। ভ্রমর সম্পর্কে এই উক্তি প্রমাণিত করে যে, সে বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-কন্যা।

ভ্রমর পতিপরায়ণা, পতিনির্ভরা; বিশ্বাসনিষ্ঠ সরলতা তাহার চরিত্রের গুণ। আট বৎসর বয়সে তাহার গোবিন্দলালের সহিত বিবাহ হইয়াছিল এবং প্রথম যৌবনে, সতেরো বৎসর বয়সে রোহিণীর রূপমুগ্ধ গোবিন্দলাল তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পতি ব্যতীত ভ্রমর আর কিছু জানে না। সে অভিমানবশতঃ পিত্রালয়ে গিয়াছিল, তজ্জন্য সে স্বামীর পায়ে পড়িয়া মার্জনা ভিক্ষা করিল। সে বলিল 'ক্ষমা কর, আমি বালিকা'। রূপোন্মত্ত গোবিন্দলাল উত্তর দিলেন 'আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব'। ভ্রমর চৌকাঠ বাধিয়া মূর্ছিতা হইল।

ভ্রমর রূপসী নহে, কিন্তু তাহার গুণরাজি তাহাকে বিশিষ্ট সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছিল। তাহার রূপ চক্ষুকে নহে, মনকে তৃপ্তির আশ্বাসে ভরিয়া তোলে। এই হেতু গোবিন্দলাল অপরাজিতাতে পদ্মের সমাদর জানাইতেন, কেননা তাহা 'পদ্মের সৌরভে পূর্ণ'। দাম্পত্যবন্ধন উভয়ের মধ্যে গভীর ছিল। ভ্রমর সংসার অনভিজ্ঞা বালিকা বধূ, হাস্যে, চাপল্যে ও প্রাণের প্রবাহে পরিপূর্ণা। সে যদি সূর্যমুখীর ন্যায় সংসার সম্পর্কে অবহিত হইতে পারিত তবে গোবিন্দলালের মানসিক চাঞ্চল্যের কারণ জ্ঞাত হইয়া তাঁহার পদস্খলন রুদ্ধ করিতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভ্রমরের মধ্যে ছিল বিচারবুদ্ধির একান্ত অভাব। সে সিদ্ধান্ত করিত আকস্মিক প্রেরণায়। ইহাই তাহার জীবনে দুঃখের কারণ হইয়া দেখা দিল। স্বামী সম্পর্কে তাহার মনে বালিকাসুলভ এমন এক কল্পিত আদর্শবোধ ছিল যে, সামান্য আঘাতে তাহার মধ্যে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হইত। গোবিন্দলাল যখন উইল-চুরির কলঙ্ক হইতে রোহিণীকে রক্ষা করিতে চলিলেন তখন স্বামীর পরদুঃখকাতরতা তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সে এই পরদুঃখকাতরতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে চাহে নাই। গোবিন্দলালের মুখে যেদিন সে শুনিল যে, রোহিণী তাঁহাকে ভালবাসে, তখন সে বালিকাসুলভ মনোভাব লইয়া তাহাকে গালি দিল এবং ক্ষীরি চাকরাণীর দ্বারা তাহাকে বারুণী পুষ্করিণীতে সন্ধ্যাবেলায় ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ দিল। ইহা তাহার অসহিষ্ণু চপল বালিকা মনের পরিচায়ক। তাহার সাত রাজার ধন এক মাণিকের প্রতি কেহ লোলুপ দৃষ্টি দিবে তাহা তাহার নিকটে অসহ্য। জলনিমগ্না রোহিণীকে উদ্ধার করিয়া গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইলে ভ্রমর গোবিন্দলালকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি দুই বৎসর পরে উত্তর দিবার কথা বলিলেন। ভ্রমরের মন হইতে কালো মেঘখানা অপসারিত হইল না। সদাহাস্যময়ী ভ্রমরের মধ্যে এই প্রথম মানসিক পরিবর্তনের পদক্ষেপ।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভুলিবার জন্য মহালে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। পূর্ণযৌবন কালে তাঁহার মনোবৃত্তিসকল উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গতুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণাও অত্যন্ত তীব্র। রোহিণী তাঁহার মধ্যে এই তৃষ্ণা জাগাইয়া তুলিয়াছে। তথাপি তিনি ভ্রমরের নিকটে কৃতঘ্ন হইবেন না এইজন্য বিষয়কর্মে মনোনিবেশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ক্ষীরিচাকরাণীর দল ও রটনাকৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকণ্ঠা কুলকামিনীগণ রোহিণী ও গোবিন্দলালের প্রণয়কাহিনীকে পল্লবিত করিয়া বাহিরে এবং ভ্রমরের নিকটে শাখাপ্রশাখা সহ বিবৃত করিল। সুরধুনী ভ্রমরকে বলিলেন যে, পুরুষের মন জয় করিতে রূপগুণ প্রয়োজন। সকলে নানা অবস্থায় ছুটিয়া আসিয়া ভ্রমরের দুর্ভাগ্যের কথা ঘটা করিয়া তাহাকে জানাইয়া গেল।

প্রচণ্ড আঘাতে ভ্রমরের মন ভাঙিয়া পড়িল। সে স্বামীকে পত্রে জানাইল যে, যতদিন তিনি ভক্তির যোগ্য, ততদিন তাহারও ভক্তি। 'এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই।' ভ্রমর যদি ধীরভাবে বিবেচনা করিতে পারিত তবে সে কদাপি রটনাতে আস্থা স্থাপন না করিয়া স্বামীর প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রতীক্ষা করিত কিংবা তাহাকে সব কথা জানাইয়া তাঁহার কথা জানিতে চাহিত। কিন্তু ভ্রমরের মধ্যে বালিকাসুলভ অস্থিরতা ও কল্পিত আদর্শবাদের প্রতি আস্থাবশতঃ সে অবিবেচনাপ্রসূত পত্র লিখিল এবং অভিমানবশতঃ গোবিন্দলালের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া পিত্রালয়ে গমন করিল। ভ্রমর যদি স্বামীকে বিদেশে যাইতে না দিত তবে বাচনিক বিবাদে মনের মালিন্য দূর হইত। ভ্রমর রাগ করিয়া যাহা করিয়া বসিল তাহাতে উভয়ের সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত হইল। মুক্তবেণীর পরে যুক্তবেণী আর দেখা যায় না। গোবিন্দলালও ফিরিয়া আসিল ভ্রমরকে শিক্ষাদানের জন্য স্বেচ্ছায় আপনার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। রোহিণীর স্মৃতি বাসনায় রূপান্তরিত হইল। অধঃপতনের পথ যেরূপ মনোমুগ্ধকর তেমনি পিচ্ছিল। রূপতৃষ্ণা দীর্ঘদিন তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছিল। কর্তব্যের বন্ধন স্খলিত হওয়ায় ভ্রমরের প্রতি আনুগত্য তাহার শিথিল হইয়া পড়িল। কৃষ্ণকান্তের শেষবারে উইল পরিবর্তন ও গোবিন্দলালের মাতার কাশীবাসের সঙ্কল্প দাম্পত্য-জীবনের বন্ধনকে ছিন্ন করিতে সহায়তা করিল। আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, পদপ্রান্তে ভূলুণ্ঠিতা বনিতার কাতর ক্রন্দন তাঁহার মনকে অভিভূত করিতে পারিল না। সম্পত্তি লইয়া স্বামীর মনোভাব পরিবর্তিত হইয়াছে ভাবিয়া ভ্রমর পিতার পরামর্শে গোবিন্দলালকে সমুদয় সম্পত্তি দান করিল। কিন্তু কামনামত্ত গোবিন্দলাল দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ভ্রমরের সকাতর অনুনয়ের উত্তরে তিনি বলিলেন যে, তিনি আর আসিবেন না, ধর্মও তাঁহার নিকটে মিথ্যা। ভ্রমরের পতিপ্রেমে কোন খাদ ছিল না। তাই সে গোবিন্দলালকে গৃহত্যাগের পূর্বে দৃপ্ত কণ্ঠে জানাইল :

> বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর—কিন্তু মনে রাখিও, উপরে দেবতা আছেন, মনে রাখিও, একদিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও একদিন তুমি খুঁজিবে। এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায়?

ভ্রমর তাহার সতীত্ব-গৌরবে বলিয়াছিল 'তুমি আমারই—রোহিণীর নও'। পরম দুঃখের আঘাতে বালিকা-বধূর রূপান্তর ঘটিল। সে সর্বকালের উপেক্ষিতা নারীমূর্তিতে দেখা দিল। গোবিন্দলাল ফিরিলেন না, চোখের জল মুছিতে মুছিতে তিনি বাহিরে আসিলেন। অকৃত্রিম প্রীতির সম্পর্ক ছিন্ন করা কঠিন।

ইহার পরে ভ্রমরের ইতিহাস বড় দুঃখের, ইহা মৃত্যু সাধনার ইতিবৃত্ত। গোবিন্দলাল ছয় বৎসর পরে ভ্রমরের নিকটে আশ্রয় চাহিয়া পত্র দিলেন। ভ্রমর তাঁহাকে নিজ গৃহে আসিয়া সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য অনুরোধ করিল। পরিশেষে লিখিল 'আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই'। সে গঙ্গাতীরে গৃহ নির্মাণ করিয়া থাকিবে জানাইল। ক্ষমাহীন কাঠিন্যে ভ্রমরের মন তখন বিমুখ। দ্বিতীয় পত্রেও কোন স্নেহের সুর নাই, দুর্ভাগ্যপীড়িত স্বামীর প্রতি কোন মমতার বাণী নাই। সে পাঁচশত টাকা স্বামীর ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রতিমাসে অনুমোদন করিল, কেননা 'অধিক টাকা পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা'। আবার উপসংহারে তাঁহাকে দেশে আসিয়া বসবাসের অনুরোধ জানাইল, কারণ তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।

স্বামীর পরস্ত্রীতে আসক্তি ও অবশেষে স্ত্রী-হত্যা ভ্রমরের মনকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল। একদা যে ছিল পতির উপরে একান্ত নির্ভরশীলা স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা ও প্রতিপালিতা, যে ছিল কথার ভিখারী, সে কঠিন আঘাতে স্বামীর প্রতি প্রেমে বিমুখ, কিন্তু কর্তব্যে সজাগ হইয়া উঠিল। মৃত্যুর পূর্বে স্বামীর পদধূলি লইয়া সে প্রার্থনা করিল 'আশীর্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই'। কিন্তু স্বামীর মঙ্গলের জন্য তাহার কোন প্রার্থনা উচ্চারিত হইল না।

ভ্রমর অবিচার পাইয়াছে সত্য, কিন্তু সে তাহার অবিবেচনাপ্রসূত কার্যের জন্য বিচ্ছেদ ত্বরান্বিত করিয়াছিল এবং পরেও স্বামীকে গ্রহণ না করিয়া উভয়ের মধ্যে মর্মান্তিক ব্যবধান রচনা করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন 'স্ত্রী আলোক, পুরুষ ছায়া।' আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারিত'? ভ্রমরের ক্ষেত্রে এই সত্য প্রমাণিত হইল না। আলো তাহার নিজস্ব দীপ্তিতে মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিল ও অবশেষে ইহার শিখায় দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইল।

তথাপি ভ্রমরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যেন পারিবারিক জীবনের সংহতিরূপিণী শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। ভ্রমরের আলোকে গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'প্রফুল্ল' সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের দুঃখসাধনার রূপ উভয়ে হয়ত রামায়ণের জানকী চরিত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

গৌণ চরিত্রসমূহ

হরলাল—হরলাল কৃষ্ণকান্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি যেমন অবাধ্য তেমনি স্বার্থপর। পিতার উইলের কথা জানিতে পারিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে ইহার পরিবর্তনের কথা বলিলেন। তাঁহার মতে গোবিন্দলালের কোন প্রাপ্য

থাকিতে পারে না। আর মা-বোন তাঁহাদের প্রতিপাল্য বলিয়া শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী হইবে। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার স্বার্থান্ধ রূপ-প্রত্যক্ষ করিয়া উইল পরিবর্তন করিলেন ও তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট করিলেন মাত্র এক আনা। হরলাল পিতাকে বিধবা-বিবাহের ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে আট আনা দিতে চিঠি লিখিলেন। কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠ কৃষ্ণকান্ত তাঁহাকে জানাইলেন যে, বিধবা-বিবাহ করিলে তাঁহার অনিষ্ট ব্যতীত কোন ইষ্ট হইবে না। কৃষ্ণকান্ত তাঁহাকে শাস্তিদান মানসে উইল পুনর্বার পরিবর্তন করিয়া হরলালকে কিছু না দিয়া তাঁহার শিশুপুত্রের জন্য এক পাই নির্দিষ্ট করিলেন। হরলাল একদিন উইল-লেখক ব্রহ্মানন্দের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পাঁচশত টাকা আগাম দিলেন ও কার্য সিদ্ধ হইলে আরও সম-পরিমাণ অর্থ দিতে চাহিলেন। ব্রহ্মানন্দকে দিয়া তিনি একটি জাল উইল প্রস্তুত করাইলেন। ইহাতে জ্যেষ্ঠ পুত্র হরলাল বারো আনা, তাঁহার পুত্র এক পাই, কনিষ্ঠ বিনোদলাল তিন আনা ও গোবিন্দলাল এক পাই পাইবে। ইহাতে হরলালের অর্থলিপ্সা, স্বার্থবুদ্ধি ও আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ উইল পরিবর্তনের কৌশল শিক্ষা করিয়াও শেষ পর্যন্ত ইহা বদলাইতে পারিলেন না। তিনি টাকা ফেরৎ দিলেন। হরলাল তাঁহাকে মূর্খ, অকর্মা ও স্ত্রীলোকের অধম বলিয়া গালি দিয়া রন্ধনরতা রূপসী রোহিণীর নিকটে গেলেন। একদা তিনি তাহাকে কতিপয় দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই ঋণ পরিশোধের দাবীতে তাহাকে তিনি উইল-চুরির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। রোহিণী তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু কোনক্রমে বিশ্বাসঘাতকের কার্য করিতে সম্মত হইল না। সহস্র মুদ্রার পুরস্কারের প্রলোভনও তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। চতুর হরলাল তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। রোহিণীর মনের অবরুদ্ধ কামনা প্রজ্বলিত হইল। সে জাল উইল রাখিয়া দিল। কিন্তু চুরি করা উইল রোহিণী প্রতিশ্রুতি-পালন ব্যতীত হরলালকে দিতে অস্বীকার করিল। সে বলিল 'যাহা দিবে বলিয়াছিলে, তাই চাই'। কিন্তু হরলাল যাহাই হউক, তাঁহার মধ্যে আভিজাত্যের গৌরব ছিল। তিনি তাই রোহিণীকে বলিলেন 'যে চুরি করিয়াছে তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না'। ক্রুদ্ধা রোহিণী তাঁহাকে শঠ, নীচ বলিয়া গালাগালি দিয়া বিদায় দিল। হরলাল বুঝিলেন, উপযুক্ত হইয়াছে। রোহিণীও তাহা বুঝিল। কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া হইল বিভিন্ন। হরলাল স্বার্থপর। তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইল না বটে, কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি তাঁহার মধ্যে রহিল না। কিন্তু হরলাল তাহার মধ্যে যে কামনার অনল প্রজ্বলিত করিলেন তাহা

রায়-পরিবারে দাবানল সৃষ্টি করিয়া সর্বনাশ সাধন করিল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পরে হরলাল আসিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন। কিন্তু উইলের বয়ান পড়িয়া ও সাক্ষীদিগের সহি দেখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হরলাল উপন্যাসে গৌণ চরিত্র হইয়াও স্বার্থসিদ্ধির জন্য অজ্ঞাতসারে যে শিখা প্রজ্বলিত করিলেন তাহাই শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ অগ্নির রূপে চতুর্দিক ভস্মীভূত করিয়াছে।

ব্রহ্মানন্দ—উপন্যাসে তাঁহার ভূমিকা বড় নহে। রোহিণী তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা, তাঁহার গৃহে থাকে। এই হেতু যে তাঁহার প্রসঙ্গ আসিয়াছে তাহাই নহে, হরলালের জাল উইল রচনা ও তাঁহার নিকট হইতে মাধবীনাথের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ—উপন্যাসের এই দুইটি অতি প্রয়োজনীয় ঘটনার জন্য ব্রহ্মানন্দের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। উক্ত দুইটি ঘটনা উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া পরিবর্তন সূচিত করিয়াছে।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ দরিদ্র ব্যক্তি। তাঁহার হাতের অক্ষর ভাল বলিয়া কৃষ্ণকান্তের উইল লেখা কার্যে তাঁহার আহ্বান আসে। দুঃখে-কষ্টে তাঁহার দিন কাটিয়া যায়। হরলাল আসিয়া তাঁহাকে সহস্র মুদ্রার লোভ দেখাইয়া প্রলুব্ধ করিল। তিনি তাঁহার হাতে আগাম পাঁচ শত মুদ্রা দিলেন ও কার্য সিদ্ধ হইলে বাকী টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। জাল উইল লেখা হইলে হরলাল তাঁহাকে উইল বদলাইবার হস্ত-কৌশল শিখাইয়া দিলেন। ব্রহ্মানন্দের ইহা আয়ত্ত করিতে অধিক সময় লাগিল না। তিনি রোগপীড়িত ব্রাহ্মণের ন্যায় উৎকৃষ্ট ফলাহারের লোভ ছাড়িতেও পারেন না, আবার মনে তাঁহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ভীতিও আছে। শেষ পর্যন্ত 'মীমাংসা করিতে না পারিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের মত উদরসাৎ করিবার দিকেই মন রাখিলেন'। কিন্তু সন্ধ্যার পরে তিনি আসিয়া হরলালকে অর্থ ফেরৎ দিলেন। হেঁয়ালির সুরে তিনি তাঁহাকে বলিলেন যে, চাঁদ পাড়িতে গিয়া বাবলা গাছে তাঁহার আঙ্গুল ছিঁড়িল। সাহসের অভাবে তিনি উইল বদলাইতে পারেন নাই। হরলাল তাঁহাকে মূর্খ, অকর্মা ও স্ত্রীলোকের অধম বলিয়া ভৎর্সনা করিলেন।

গোবিন্দলাল যখন বন্দরখালিতে, তখন ভ্রমর নানামুখে রোহিণীর প্রতি তাঁহার স্বামীর প্রণয়-কাহিনী ও তাহাকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দানের কথা শুনিয়া তাঁহাকে কঠোর ভাষায় পত্র লিখিল। ব্রহ্মানন্দ ঘোষও তাঁহার পত্রে জানাইলেন যে বধূমাতা ভ্রমর রোহিণীকে অলঙ্কার দানের কথা রটনা করিয়াছে। তিনি তাঁহাকে ইহার বিহিত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন, 'নইলে আমি এখানকার বাস উঠাইব'।

ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ গ্রামের ডাকঘরে যাইয়া ডেপুটি পোস্টমাস্টারের নিকট হইতে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর বর্তমান অবস্থানের কথা অবগত হইলেন। তিনি 'নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর' করিবার জন্য ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার নিকটে জাল নোট আছে এই ভীতি প্রদর্শন করিয়া ও দূরে কনস্টেবলকে দেখাইয়া তাঁহাকে লিখিত রোহিণীর পত্র হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইলেন। পরে ব্রহ্মানন্দকে বলিলেন 'এ নম্বরের নোট নহে। কোন ভয় নাই—তুমি ঘরে যাও'। ব্রহ্মানন্দ মৃতদেহে প্রাণ পাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিল। ব্রহ্মানন্দ সরল, নির্বিরোধী ব্যক্তি, তাঁহার চরিত্রে কোন জটিলতা নাই। পূর্ণরূপে তাঁহার চরিত্র চিত্র অঙ্কিত করিবার কোন অবকাশ ঘটে নাই, উপন্যাসে প্রয়োজনও দেখা দেয় নাই।

অপরাপর চরিত্র

গৃহের চাকরাণী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন যে, যাঁহার গৃহে চাকরাণী নাই তাঁহার গৃহে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল ও ময়লা নাই। 'চাকরাণী নামে দেবতা এই চারিটির সৃষ্টিকর্তা'। আবার যে গৃহে অনেক চাকরাণী তথায় নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, নিত্য রাবণবধ। জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহে পরিচারিকাবর্গের অভাব নাই। ইহাদের মধ্যে অন্যতমা ক্ষীরি। গোবিন্দলাল বন্দরখালি গেলে ভ্রমর আহারাদি ত্যাগ করিল, বেশ বিন্যাসে অমনোযোগী হইল এবং কবিরাজ প্রদত্ত ঔষধপত্র জানালা দিয়া ফেলিয়া দিল। এই বাড়াবাড়ি ক্ষীরির নিকটে অসহ্য হইলে সে বলিল যে, যাঁহার জন্য তিনি কান্নাকাটি করিতেছেন তিনি হয়ত রোহিণীর ধ্যান করিতেছেন। সে পাঁচী চাঁড়ালনীকে সাক্ষী মানিয়া বলিল যে, বাবু সেদিন অনেক রাত্রে বাগান হইতে আসিয়াছিলেন। এই ঘটনা তাহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট নহে, কানে আসিয়াছে মাত্র। ইহাকে সে অতিরঞ্জিত করিয়া গোবিন্দলালের নামে প্রচার করিতে দ্বিধা করিল না। ভ্রমরের হস্তে নির্যাতিত হইয়া ক্ষীরি রাগে গর গর করিয়া বাহির হইল। ভ্রমর তাহার ঠকামি কানে তুলিল না, ইহা তাহার নিকটে অসহ্য বোধ হইল। ইহাই কলিকাল, নচেৎ একরত্তি মেয়ে তাহার কথায় বিশ্বাস করে না। ক্ষীরোদা ঘাটের পথে পাচিকা হরমণি ঠাকুরাণীকে পাইল। তাহাকে সে ফলাও করিয়া গোবিন্দলালের প্রণয়াসক্তির কথা জানাইল। তখন উভয়ে রসের হাসি হাসিয়া প্রস্থান করিল। ইহার পরে রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারী, পারী যাহার সে সাক্ষাৎ পাইল

তাহাকে রোহিণী গোবিন্দলালের কাহিনী অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করিল। ইহা সত্যরক্ষার খাতিরে বাড়াইয়া বলা নহে। অতিরঞ্জনের মধ্যে কল্পিত সত্যের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং এই সূত্র ধরিয়া গোবিন্দলাল কর্তৃক অপরিমেয় অলঙ্কার দানের কথা উঠিয়া পড়িল এবং সকলে হিতৈষিণী রূপে ভ্রমরের নিকটে আসিয়া জানাইয়া গেল যে, তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। ক্ষীরি তাই ভ্রমর-গোবিন্দলালের বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

ডাকঘরের **ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার** ও তাঁহার **পিয়নের** চরিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবতা বোধের পরিচয় দিয়াছেন। এই বাস্তবতা জীবনের অনুকরণ জাত নহে, ইহার মধ্যে আছে জীবন-রস রসিকের কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি ও রসসৃষ্টি। ইহাতে চরিত্র দুইটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ডেপুটি পোস্টমাস্টারবাবু অন্ধকার চালাঘরে মাসিক পনেরো টাকা বেতনভোগী হইয়া কাজ করেন। আমকাঠের ভাঙ্গা টেবিলে তাঁহার ফাইল ও চিঠিপত্র, নিক্তি ও ডাকঘরের মোহর। তিনি ত্রিপাদমাত্রাবশিষ্ট অতি প্রাচীন চৌকীতে বাসিয়া সাত টাকা মাহিনার পিয়নের উপরে তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়াস করেন। তিনি মনে করেন যে, তিনি উহার বিধাতাপুরুষ, উভয়ের মধ্যে আসমান-জমীন ফারাক। কিন্তু পিওনও সাত আনার ওজনে উত্তর দিয়া থাকে। মাধবীনাথ তথায় উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে সম্ভ্রম অথবা তুচ্ছার্থক সুরে সম্বোধন করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। মাধবীনাথ তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দের নিকটে পত্রাদি আসে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে ডেপুটি পোস্টমাস্টারবাবু আপনার পদমর্যদা সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিলেন। তিনি গম্ভীর সুরে উত্তর দিলেন 'ডাকঘরের খবর আমাদের বলিতে বারণ আছে'। মাধবীনাথ যেইমাত্র পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইলেন তখন তাঁহার ওজন করা কাজ বন্ধ হইল। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার চিঠি ডাকঘরে আসে। কিন্তু আর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি অসম্মত হইলেন, কেননা যাহা বলিয়াছেন তাহার টাকা না দিলে তিনি নীরব থাকিবেন। প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য পৃথক টাকা দিতে হইবে। মাধবীনাথ তখন নিজের পরিচয় দিয়া তাঁহার লাঠিয়ালের সংবাদ দিলেন। তিনি বলিলেন যে, ঠিক ঠিক সংবাদ না পাইলে তিনি ডাকঘরে আগুন দিবেন ও আদালতে প্রমাণ করিবেন যে, সরকারী টাকা আত্মসাৎ করিবার জন্য ডেপুটি পোস্টমাস্টার ঘরে আগুন দিয়াছেন। তখন তিনি সকল কথা ভীতিবশতঃ ও প্রাপ্তির লোভে জানাইলেন। তিনি পরিশ্রম করিয়া মাধবীনাথের জিজ্ঞাস্য সকল বিষয়ের উত্তর দিলেন ও রসিদ দেখাইলেন। মাধবীনাথ যাইবার পূর্বে তাঁহাকে দশ টাকা ও তামাক আনিবার অছিলায়

প্রেরিত হরিদাস পিয়নের জন্য একটি টাকা দিলেন। বলা বাহুল্য ডেপুটি পোস্ট-মাস্টার সকলই আত্মসাৎ করিলেন।

নিশাকর—উপন্যাসে যাঁহারা গৌণচরিত্র বলিয়া আখ্যাত, অনেকক্ষেত্রে তাঁহারা কাহিনীর সঙ্কট সৃষ্টিতে অথবা ইহার মোচনে অথবা পরিণতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কৃত কার্যকলাপের ফলাফল জটিল আবর্ত সৃষ্টি করে কিংবা উপসংহারকে ত্বরান্বিত করে। মাধবীনাথের আত্মীয় নিশাকর এই জাতীয় চরিত্র। তিনি মাধবীনাথ হইতে আট দশ বৎসর বয়ঃকনিষ্ঠ। তাঁহার পৈতৃক বিষয় আছে এবং তিনি গীতবাদ্য করিয়া সময় আনন্দে অতিবাহিত করেন। নিষ্কর্মা বলিয়া পর্যটনে তাঁহার অনুরাগ আছে। এই অবস্থায় মাধবীনাথ তাঁহাকে নীলকুঠি কিনিবার অছিলায় যশোহরে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। প্রসাদপুরের কুঠিতে আসিয়া নিশাকর রাসবিহারী দে ছদ্মনামে উপস্থিত হইয়া গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে সোনা ও রূপো ভৃত্যদ্বয়কে বলিলেন। তাহারা বাবুকে এই সংবাদ দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন নিশাকর টাকা বাহির করিলে রূপো তাহা ছোঁ মারিয়া লইয়া উপরে গেল। তিনি সোনাকেও একটি টাকা দিলেন। উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে নিশাকর রূপসী রোহিণীকে দেখিলেন। রোহিণী তাঁহার চোখ-মুখের সৌন্দর্য দেখিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে প্রলুব্ধ হইল। চারি চক্ষুর মধ্যে মিলন হইল। নিশাকর রূপোর বিলম্ব দেখিয়া উপরে যে ঘরে গোবিন্দলাল, রোহিণী ও ওস্তাদ দানেশ খাঁ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হইলেন। নিশাকর তাঁহার ছদ্মনাম ও বাসস্থান বরাহনগরের পরিচয় দিয়া তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপিত করিলেন। গোবিন্দলাল তাঁহার সহিত কথোপকথনে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু ধমকে উঠিয়া যাইবার লোক নিশাকর নহেন। গোবিন্দলাল তাঁহাকে দুই-চার কথায় বক্তব্য শেষ করিতে বলিলেন। ওস্তাদজী সঙ্গীতে বিঘ্ন হওয়ায় তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলে নিশাকর তাঁহাকে ধর্মবিরুদ্ধ একটি কথা বলিয়া নিরস্ত করিলেন। নিশাকর বলিলেন যে, তাঁহার ভার্যা ভ্রমর তাঁহাকে বিষয় পত্তনি দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অনুমতিসাপেক্ষ। তিনি তাঁহার ঠিকানা জানেন না, পত্র লিখিতেও ইচ্ছুক নহেন। প্রায় দুই বৎসর পরে ভ্রমরের নাম শুনিয়া গোবিন্দলাল অন্যমনস্ক হইলেন,—তাঁহার সেই ভ্রমর। গোবিন্দলাল দ্বিতীয়বার সকল কথা শুনিয়া বলিলেন যে, বিষয় তাঁহার স্ত্রীর, তাঁহার দিক হইতে কোন বিধি-নিষেধ নাই। নিশাকর নামিয়া গেলে রোহিণী তাহার নিকটে রূপোকে পাঠাইলেন যাহাতে তিনি কোন নিভৃত স্থানে

তাহার জন্য অপেক্ষা করেন। নিশাকর বলিলেন যে, তিনি এখানে প্রতীক্ষা করিতে সাহস করেন না, কারণ এখানে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেও প্রতিকারের উপায় নাই। তিনি বরং নদীর ধারে বাঁধা ঘাটের নিকটে বকুল গাছ দুইটির নীচে বসিয়া থাকিবেন। রূপো এই সংবাদ লইয়া রোহিণীর নিকটে গেলে নিশাকর সোনার সহিত আলাপ করিয়া তাহাকে বেশী টাকার চাকুরী গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ করিল। সোনা সম্মত হইল, কেননা মুনিব ঠাকরুণের অধীন সে আর থাকিতে চাহে না। নিশাকর সোনাকে দিয়া রোহিণীর গোপন অভিসারের সংবাদ গোবিন্দলালকে পাঠাইলেন। রোহিণী আসিলে নিশাকর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এত রাত্রি হইল কেন'? রোহিণী উত্তর দিল যে, না দেখিয়া শুনিয়া সে আসিতে পারে না। গোবিন্দলালকে দেখিয়া নিশাকর সরিয়া পড়িল।

সোনাকে দিয়া সংবাদ দানের পরে নিশাকরের মনে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল। দুষ্টের দমন ও বন্ধুকন্যার জীবন-রক্ষার্থে এই কাজ করিয়া তাঁহার মন প্রসন্ন হইল না। মাধবীনাথও সকল কথা শুনিয়া বলিলেন 'কাজ ভাল হয় নাই; একটা খুনোখুনি হইতে পারে'। নিশাকরের এই দৌত্যকার্যের ফলে উপন্যাসের পরিণাম-অংশ দ্রুত সম্পাদিত হইয়াছে ও কারুণ্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। নিশাকর নিয়তির ন্যায় গোবিন্দলাল ও রোহিণীর জীবনে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিয়া কাহিনীর সমাপ্ত অংশকে মর্মান্তিক করিয়া তুলিয়াছে।

'প্রমীলা ভবন'
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড,
বারাসাত।

শ্রীভবানীগোপাল সান্যাল

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিদ্রাগ্রামে এক ঘর বড় জমীদার ছিলেন। জমীদারবাবুর নাম কৃষ্ণকান্ত রায়। কৃষ্ণকান্ত রায় বড় ধনী ; তাঁহার জমীদারীর মুনাফা প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বিষয়টা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা রামকান্ত রায়ের উপার্জ্জিত। উভয় ভ্রাতা একত্রিত হইয়া ধনোপার্জ্জন করেন। উভয় ভ্রাতায় পরম সম্প্রীতি ছিল, একের মনে এমত সন্দেহ কস্মিন্‌কালে জম্মে নাই যে, তিনি অপর কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইবেন। জমীদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল। উভয়ে একান্নভুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছিল—তাহার নাম গোবিন্দলাল। পুত্রটির জন্মাবধি, রামকান্ত রায়ের মনে মনে সঙ্কল্প হইল যে, উভয়ের উপার্জ্জিত বিষয় একের নামে আছে, অতএব পুত্রের মঙ্গলার্থ তাহার বিহিত লেখাপড়া করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কেন না, যদিও তাঁহার মনে নিশ্চিত ছিল যে, কৃষ্ণকান্তের কখনও প্রবঞ্চনা অথবা তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করার সম্ভাবনা নাই, তথাপি কৃষ্ণকান্তের পরলোকের পর তাঁহার পুত্রেরা কি করে, তাহার নিশ্চয়তা কি ? কিন্তু লেখাপড়ার কথা সহজে বলিতে পারিলেন না—আজি বলিব, কালি বলিব, করিতে লাগিলেন। একদা প্রয়োজনবশতঃ তালুকে গেলে সেইখানে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

যদি কৃষ্ণকান্ত এমত অভিলাষ করিতেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহা হইলে তৎসাধনপক্ষে এখন আর কোন বিঘ্ন ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের এরূপ অসদভিসন্ধি ছিল না। তিনি গোবিন্দলালকে আপন সংসারে আপন পুত্রদিগের সহিত সমানভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, এবং উইল করিয়া আপনাদিগের উপার্জ্জিত সম্পত্তির যে অর্দ্ধাংশ ন্যায়মত রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, তাহা গোবিন্দলালকে দিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুই পুত্র, আর এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হরলাল, কনিষ্ঠের নাম বিনোদলাল, কন্যার নাম শৈলবতী। কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল করিলেন যে, তাঁহার পরলোকান্তে, গোবিন্দলাল আট আনা, হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেকে তিন আনা, গৃহিণী এক আনা, আর শৈলবতী এক আনা সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন।

হরলাল বড় দুর্দ্দান্ত। পিতার অবাধ্য এবং দুর্ম্মুখ। বাঙ্গালীর উইল প্রায় গোপনে থাকে না। উইলের কথা হরলাল জানিতে পারিল। হরলাল, দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পিতাকে কহিল, "এটা কি হইল? গোবিন্দলাল অর্দ্ধেক ভাগ পাইল, আর আমার তিন আনা।"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "ইহা ন্যায্য হইয়াছে। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ তাহাকে দিয়াছি।"

হর। গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্যটা কি? আমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি সে লইবার কে? আর মা বহিনকে আমরা প্রতিপালন করিব—তাহাদিগের বা এক এক আনা কেন? বরং তাহাদিগকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী বলিয়া লিখিয়া যান।

কৃষ্ণকান্ত কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বাপু হরলাল! বিষয় আমার, তোমার নহে। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দিয়া যাইব।"

হর। আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে—আপনাকে যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে দিব না।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে চক্ষু আরক্ত করিয়া কহিলেন, "হরলাল, তুমি যদি বালক হইতে, তবে আজি তোমাকে গুরু মহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম।"

হর। আমি বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের গোঁফ পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে এই উইলও সেইরূপ পুড়াইব।

কৃষ্ণকান্ত রায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বহস্তে উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তৎপরিবর্ত্তে নূতন একখানি উইল লিখাইলেন। তাহাতে গোবিন্দলাল আট আনা, বিনোদলাল পাঁচ আনা, কর্ত্রী এক আনা, শৈলবতী এক আনা, আর হরলাল এক আনা মাত্র পাইলেন।

রাগ করিয়া হরলাল পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গেলেন, তথা হইতে পিতাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই ;—

"কলিকাতায় পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি মানস করিয়াছি যে, একটি বিধবাবিবাহ করিব। আপনি যদ্যপি উইল পরিবর্ত্তন করিয়া আমাকে ॥০ আনা লিখিয়া দেন, আর সেই উইল শীঘ্র রেজিষ্টরি করেন, তবেই এই অভিলাষ ত্যাগ করিব, নচেৎ শীঘ্র একটি বিধবাবিবাহ করিব।"

হরলাল মনে করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকান্ত ভয়ে ভীত হইয়া, উইল পরিবর্ত্তন করিয়া হরলালকে অধিক বিষয় লিখিয়া দিবেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের যে উত্তর পাইলেন, তাহাতে সে ভরসা রহিল না। কৃষ্ণকান্ত লিখিলেন,

"তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিবাহ করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ করিলে আমি উইল বদলাইব বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না।"

ইহার কিছু পরেই হরলাল সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি বিধবাবিবাহ করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্ত রায় আবার উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। নূতন উইল করিবেন।

পাড়ায় ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নামে একজন নিরীহ ভালমানুষ লোক বাস করিতেন। কৃষ্ণকান্তকে জ্যেঠা মহাশয় বলিতেন। এবং তৎকর্তৃক অনুগৃহীত এবং প্রতিপালিতও হইতেন।

ব্রহ্মানন্দের হস্তাক্ষর উত্তম। এ সকল লেখাপড়া তাহার দ্বারাই হইত। কৃষ্ণকান্ত সেইদিন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "আহারাদির পর এখানে আসিও। নূতন উইল লিখিয়া দিতে হইবে।"

বিনোদলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন, "আবার উইল বদলান হইবে কি অভিপ্রায়ে?"

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "এবার তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে শূন্য পড়িবে।"

বিনোদ। ইহা ভাল হয় না। তিনিই যেন অপরাধী। কিন্তু তাঁহার একটি পুত্র আছে—সে শিশু, নিরপরাধী। তাহার উপায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। তাহাকে এক পাই লিখিয়া দিব।

বিনোদ। এই পাই বখরায় কি হইবে?

কৃষ্ণ। আমার আয় দুই লক্ষ টাকা। তাহার এক পাই বখরায় তিন হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে একজন গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চলিতে পারে। ইহার অধিক দিব না।

বিনোদলাল অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কর্তা কোন মতে মতান্তর করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রহ্মানন্দ স্নানাহার করিয়া নিদ্রার উদ্যোগে ছিলেন, এমত সময়ে বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন যে, হরলাল রায়। হরলাল রায় আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিলেন।

ব্রহ্ম। সে কি, বড়বাবু যে? কখন বাড়ী এলে?

হর। বাড়ী এখনও যাই নাই।

ব্র। একেবারে এইখানেই? কলিকাতা হইতে কতক্ষণ আসিতেছ?

হর। কলিকাতা হইতে দুই দিবস হইল আসিয়াছি। এই দুই দিন কোন স্থানে লুকাইয়া ছিলাম। আবার নাকি নূতন উইল হইবে?

ব্র। এই রকম ত শুনিতেছি।

হর। আমার ভাগে এবার শূন্য।

ব্র। কর্ত্তা এখন রাগ করে তাই বলছেন, কিন্তু সেটা থাকবে না।

হর। আজি বিকালে লেখাপড়া হবে? তুমি লিখিবে?

ব্র। তা কি করব ভাই! কর্ত্তা বলিলে ত "না" বলিতে পারি না।

হর। ভাল তাতে তোমার দোষ কি? এখন কিছু রোজগার করিবে?

ব্র। কিলটে চড়টা? তাই ভাই, মার না কেন?

হর। তা নয়, হাজার টাকা।

ব্র। বিধবা বিয়ে ক'রে নাকি?

হর। তাই।

ব্র। বয়স গেছে।

হর। তবে আর একটি কাজ বলি। এখনই আরম্ভ কর। আগামী কিছু গ্রহণ কর।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দের হাতে হরলাল পাঁচশত টাকার নোট দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ নোট পাইয়া উলটিয়া পালটিয়া দেখিল। বলিল, "ইহা লইয়া আমি কি করিব?"

হর। পুঁজি করিও। দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও।

ব্র। গোওয়ালা-ফোওয়ালার কোন এলাকা রাখি না। কিন্তু আমায় করিতে হইবে কি?

হর। দুইটি কলম কাট। দুইটি যেন ঠিক সমান হয়।

ব্র। আচ্ছা ভাই—যা বল, তাই শুনি।

এই বলিয়া ঘোষজা মহাশয় দুইটি নূতন কলম লইয়া ঠিক সমান করিয়া কাটিলেন। এবং লিখিয়া দেখিলেন যে, দুইটিরই লেখা একপ্রকার দেখিতে হয়।

তখন হরলাল বলিলেন, "ইহার একটি কলম বাক্সতে তুলিয়া রাখ। যখন উইল লিখিতে যাইবে, এই কলম লইয়া গিয়া ইহাতে উইল লিখিবে। দ্বিতীয় কলমটি লইয়া এখন একখানা লেখাপড়া করিতে হইবে। তোমার কাছে ভাল কালি আছে?"

ব্রহ্মানন্দ মসীপাত্র বাহির করিয়া লিখিয়া দেখাইলেন। হরলাল বলিতে লাগিল, "ভাল, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া যাইও।"

ব্র। তোমাদিগের বাড়ীতে কি দোওয়াত কলম নাই যে, আমি ঘাড়ে করিয়া নিয়া যাব?

হর। আমার কোন উদ্দেশ্য আছে—নচেৎ তোমাকে এত টাকা দিলাম কেন?

ব্র। আমিও তাই ভাবিতেছি বটে—ভাল বলেছ ভাইরে!

হর। তুমি দোওয়াত কলম লইয়া গেলে কেহ ভাবিলেও ভাবিতে পারে, আজি এটা কেন? তুমি সরকারী কালি কলমকে গালি পাড়িও; তাহা হইলেই শোধরাইবে।

ব্র। তা সরকারী কালি কলমকে শুধু কেন? সরকারকে সুদ্ধ গালি পাড়িতে পারিব।

হর। তত আবশ্যক নাই। এক্ষণে আসল কর্ম্ম আরম্ভ কর।

তখন হরলাল দুইখানি জেনেরাল লেটর কাগজ ব্রহ্মানন্দের হাতে দিলেন। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "এ যে সরকারী কাগজ দেখিতে পাই।"

"সরকারী নহে—কিন্তু উকীলের বাড়ীর লেখাপড়া এই কাগজে হইয়া থাকে। কর্ত্তাও এই কাগজে উইল লেখাইয়া থাকেন, জানি। এজন্যে এই কাগজ আমি সংগ্রহ করিয়াছি। যাহা বলি, তাহা এই কালি কলমে লেখ।"

ব্রহ্মানন্দ লিখিতে আরম্ভ করিল। হরলাল একখানি উইল লেখাইয়া দিলেন। তাহার মর্ম্মার্থ এই। কৃষ্ণকান্ত রায় উইল করিতেছেন। তাহার নামে যত সম্পত্তি আছে, তাহার বিভাগ কৃষ্ণকান্তের পরলোকান্তে এইরূপ হইবে। যথা, বিনোদলাল তিন আনা, গোবিন্দলাল এক পাই, গৃহিণী এক পাই, শৈলবতী এক পাই, হরলালের পুত্র এক পাই, হরলাল জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া অবশিষ্ট বারো আনা।

লেখা হইলে ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "এখন ত উইল লেখা হইল—দস্তখত করে কে?"

"আমি।" বলিয়া হরলাল ঐ উইলে কৃষ্ণকান্ত রায়ের এবং চারিজন সাক্ষীর দস্তখত করিয়া দিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "ভাল, এ ত জাল হইল।"

হর। এই সাঁচ্চা উইল হইল, বৈকালে যাহা লিখিবে, সেই জাল।

ব্রহ্ম। কিসে?

হর। তুমি যখন উইল লিখিতে যাইবে, তখন এই উইলখানি আপনার পিরানের পকেটে লুকাইয়া লইয়া যাইবে। সেখানে গিয়া এই কালিকলমে

তাঁহাদের ইচ্ছামত উইল লিখিবে। কাগজ, কলম, কালি, লেখক একই; সুতরাং দুইখান উইলই দেখিতে একপ্রকার হইবে। পরে উইল পড়িয়া শুনান ও দস্তখত হইয়া গেলে শেষে তুমি স্বাক্ষর করিবার জন্য লইবে। সকলের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দস্তখত করিবে। সেই অবকাশে উইলখানি বদলাইয়া লইবে। এইখানি কর্তাকে দিয়া কর্তার উইলখানি আমাকে আনিয়া দিবে।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ ভাবিতে লাগিল। বলিল, "বলিলে কি হয়—বুদ্ধির খেলটা খেলেছ ভাল।"

হর। ভাবিতেছ কি?

ব্র। ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু ভয় করে। তোমার টাকা ফিরাইয়া লও। আমি কিন্তু জালের মধ্যে থাকিব না।

"টাকা দাও।" বলিয়া হরলাল হাত পাতিল। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নোট ফিরাইয়া দিল। নোট লইয়া হরলাল উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ব্রহ্মানন্দ তখন আবার তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "বলি, ভায়া কি গেলে?"

"না" বলিয়া হরলাল ফিরিল।

ব্র। তুমি এখন পাঁচ শত টাকা দিলে। আর কি দিবে?

হর। তুমি সেই উইলখানি আনিয়া দিলে আর পাঁচ শত দিব।

ব্র। অনেকটা—টাকা—লোভ ছাড়া যায় না।

হর। তবে তুমি রাজি হইলে?

ব্র। রাজি না হইয়াই বা কি করি? কিন্তু বদল করি কি প্রকারে। দেখিতে পাইবে যে।

হর। কেন দেখিতে পাইবে? আমি তোমার সম্মুখে উইল বদল করিয়া লইতেছি, তুমি দেখ দেখি, টের পাও কি না।

হরলালের অন্য বিদ্যা থাকুক না থাকুক, হস্তকৌশল বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন উইলখানি পকেটে রাখিলেন, আর একখানি কাগজ হাতে লইয়া তাহাতে লিখিবার উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে হাতের কাগজ পকেটে, পকেটের কাগজ হাতে কি প্রকারে আসিল, ব্রহ্মানন্দ তাহা কিছুই লক্ষিত করিতে পারিলেন না। ব্রহ্মানন্দ হরলালের হস্তকৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হরলাল বলিলেন, "এই কৌশলটি তোমায় শিখাইয়া দিব।" এই বলিয়া হরলাল সেই অভ্যস্ত কৌশল ব্রহ্মানন্দকে অভ্যাস করাইতে লাগিলেন।

দুই তিন দণ্ডে ব্রহ্মানন্দের সেই কৌশলটি অভ্যস্ত হইল। তখন হরলাল কহিল

যে, "আমি এক্ষণে চলিলাম। সন্ধ্যার পর বাকি টাকা লইয়া আসিব।" বলিয়া সে বিদায় লইল।

হরলাল চলিয়া গেলে ব্রহ্মানন্দের বিষম ভয়সঞ্চার হইল। তিনি দেখিলেন যে, তিনি যে কার্য্যে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা রাজদ্বারে মহা দণ্ডার্হ অপরাধ—কি জানি ভবিষ্যতে পাছে তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইতে হয়। আবার বদলের সময়ে যদি কেহ ধরিয়া ফেলে? তবে তিনি এ কার্য্য কেন করেন? না করিলে হস্তগত সহস্র মুদ্রা ত্যাগ করিতে হয়। তাহাও হয় না। প্রাণ থাকিতে নয়।

হায়! ফলাহার! কত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুমি মর্ম্মান্তিক পীড়া দিয়াছ! এ দিকে সংক্রামক জ্বর, প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার পর ফলাহার উপস্থিত। তখন কাংস্যপাত্র বা কদলীপত্রে সুশোভিত লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ প্রভৃতির অমলধবল শোভা সন্দর্শন করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিবে? ত্যাগ করিবে, না আহার করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর যদি সহস্র বৎসর সেই সজ্জিত পাত্রের নিকট বসিয়া তর্ক-বিতর্ক করেন, তথাপি তিনি এই কূট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না—এবং মীমাংসা করিতে না পারিয়া—অন্যমনে পরদ্রব্যগুলি উদরসাৎ করিবেন।

ব্রহ্মানন্দ ঘোষ মহাশয়ের ঠিক তাই হইল। হরলালের এ টাকা হজম করা ভার—জেলখানার ভয় আছে; কিন্তু ত্যাগ করাও যায় না। লোভ বড় কিন্তু বদহজমের ভয়ও বড়; ব্রহ্মানন্দ মীমাংসা করিতে পরিল না। মীমাংসা করিতে না পারিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের মত উদরসাৎ করিবার দিকেই মন রাখিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর ব্রহ্মানন্দ উইল লিখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন যে, হরলাল আসিয়া বসিয়া আছেন। হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?"

ব্রহ্মানন্দ একটু কবিতাপ্রিয়। তিনি কষ্টে হাসিয়া বলিলেন,

"মনে করি চাঁদ ধরি হাতে দিই পেড়ে।
বাবলা গাছে হাত লেগে আঙ্গুল গেল ছিঁড়ে।"

হর। পার নাই নাকি?

ব্র। ভাই, কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল।

হর। পার নাই?

ব্র। না ভাই—এই ভাই, তোমার জাল উইল নাও। এই তোমার টাকা নাও।

এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ কৃত্রিম উইল ও বাক্স হইতে পাঁচশত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন। ক্রোধে এবং বিরক্তিতে হরলালের চক্ষু আরক্ত এবং অধর কম্পিত হইল। বলিলেন, "মূর্খ, অকর্ম্মা! স্ত্রীলোকের কাজটাও তোমা হইতে হইল না? আমি চলিলাম। কিন্তু দেখিও যদি তোমা হইতে এই কথার বাষ্প মাত্র প্রকাশ পায়, তবে তোমার জীবন সংশয়।"

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "সে ভাবনা করিও না; কথা আমার নিকট প্রকাশ পাইবে না।"

সেখান হইতে উঠিয়া হরলাল ব্রহ্মানন্দের পাকশালায় গেলেন। হরলাল ঘরের ছেলে, সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। পাকশালায় ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতৃকন্যা রোহিণী রাঁধিতেছিল।

এই রোহিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে। অতএব তাহার রূপ গুণ কিছু বলিতে হয়, কিন্তু আজি কালি রূপবর্ণনার বাজার নরম—আর গুণ বর্ণনার—হাল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করিতে নাই। তবে ইহা বলিতে হয় যে, রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কালা পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পড়িত, পানও বুঝি খাইত। এদিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলে হয়; ঝোল, অম্ল, চড়চড়ি, সড়সড়ি, ঘণ্ট, দালনা ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত; আবার আলেপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। তাহার আর কেহ সহায় ছিল না বলিয়া সে ব্রহ্মানন্দের বাটীতে থাকিত।

রোহিণী রূপসী ঠন্ ঠন্ করিয়া দালের হাঁড়িতে কাটি দিতেছিল, দূরে একটা বিড়াল থাবা পাতিয়া বসিয়াছিল; পশুজাতি রমণীদিগের বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষে শিহরে কি না, দেখিবার জন্য রোহিণী তাহার উপরে মধ্যে মধ্যে বিষপূর্ণ মধুর কটাক্ষ করিতেছিল; বিড়াল সে মধুর কটাক্ষকে ভর্জ্জিত মৎস্যাহারের নিমন্ত্রণ মনে করিয়া অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছিল, এমত সময়ে হরলালবাবু জুতা সমেত মস্ মস্ করিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বিড়াল, ভীত হইয়া, ভর্জ্জিত মৎস্যের লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়নে তৎপর হইল; রোহিণী দালের কাটি ফেলিয়া দিয়া, হাত ধুইয়া মাথায় কাপড় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নখে নখ খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বড় কাকা, কবে এলেন?"

হরলাল বলিল, "কাল এসেছি। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

রোহিণী শিহরিল; বলিল, "আজ এখানে খাবেন? সরু চালের ভাত চড়াব কি?"

হর। চড়াও, চড়াও। কিন্তু সে কথা নয়। তোমার একদিনের কথা মনে পড়ে কি?

রোহিণী চুপ করিয়া মাটির পানে চাহিয়া রহিল। হরলাল বলিল, "সেই দিন, সে দিন তুমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে, যাত্রীদিগের দলছাড়া হইয়া পিছাইয়া পড়িয়াছিলে? মনে পড়ে?

রোহিণী। (বাঁ হাতের চারিটি আঙ্গুল ডাইন হাতে ধরিয়া অধোবদনে) মনে পড়ে।

হর। যে দিন তুমি পথ হারাইয়া মাঠে পড়িয়াছিলে, মনে পড়ে?

রো। পড়ে।

হর। যে দিন মাঠে তোমার রাত্রি হইল, তুমি একা; জনকতক বদমাস তোমার সঙ্গ নিল—মনে পড়ে?

রো। পড়ে।

হর। সেদিন কে তোমায় রক্ষা করিয়াছিল?

রো তুমি। তুমি ঘোড়ার উপরে সেই মাঠ দিয়া কোথায় যাইতেছিলে—

হর। শালীর বাড়ী।

রো। তুমি দেখিতে পাইয়া আমায় রক্ষা করিলে—আমায় পাল্কি বেহারা করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলে। মনে পড়ে বই কি। সে ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না।

হর। আজ সে ঋণ পরিশোধ করিতে পার—তার উপর আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিতে পার, করিবে?

রো। কি বলুন—আমি প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব।

হর। কর না কর, এ কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করিও না।

রো। প্রাণ থাকিতে নয়।

হর। দিব্য কর।

রোহিণী দিব্য করিল।

তখন হরলাল কৃষ্ণকান্তের আসল উইল ও জাল উইলের কথা বুঝাইয়া বলিল। শেষ বলিল, "সেই আসল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল তাহার বদলে রাখিয়া আসিতে হইবে। আমাদের বাড়িতে তোমার যাতায়াত আছে। তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি অনায়াসে পার। আমার জন্য ইহা করিবে?"

রোহিণী শিহরিল। বলিল, "চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না।"

হর। স্ত্রীলোক এমন অসারই বটে—কথার রাশি মাত্র। এই বুঝি এ জন্মে তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না।

রো। আর যা বলুন, সব পারিব। মরিতে বলেন, মরিব। কিন্তু এ বিশ্বাসঘাতকের কাজ পারিব না।

হরলাল কিছুতেই রোহিণীকে সম্মত করিতে না পারিয়া, সেই হাজার টাকার নোট রোহিণীর হাতে দিতে গেল। বলিল, "এই হাজার টাকা পুরস্কার আগাম নাও। এ কাজ তোমার করিতে হইবে।"

রোহিণী নোট লইল না। বলিল, "টাকার প্রত্যাশা করি না। কর্ত্তার সমস্ত বিষয় দিলেও পারিব না। করিবার হইত ত আপনার কথাতেই করিতাম।"

হরলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, বলিল, "মনে করিয়াছিলাম, রোহিণী, তুমি আমার হিতৈষী। পর কখনও আপন হয়? দেখ, আজ যদি আমার স্ত্রী থাকিত, আমি তোমার খোষামোদ করিতাম না। সেই আমার এ কাজ করিত।"

এবার রোহিণী একটু হাসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিলে যে?"

রো। আপনার স্ত্রীর নামে সেই বিধবাবিবাহের কথা মনে পড়িল। আপনি না কি বিধবা বিবাহ করিবেন?

হর। ইচ্ছা ত আছে—কিন্তু মনের মত বিধবা পাই কই?

রো। তা বিধবাই হৌক, সধবাই হৌক—বলি বিধবাই হৌক, কুমারীই হৌক—একটা বিবাহ করিয়া সংসারী হলেই ভাল হয়। আমরা আত্মীয়স্বজন সকলেরই তা হলে আহ্লাদ হয়।

হর। দেখ রোহিণী, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত।

রো। তা তো এখন লোকে বলিতেছে।

হর। দেখ, তুমিও একটা বিবাহ করিতে পার—কেন করিবে না।

রোহিণী মাথায় কাপড় একটু টানিয়া মুখ ফিরাইল। হরলাল বলিতে লাগিল, "দেখ, তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম সুবাদ মাত্র—সম্পর্কে বাধে না।"

এবার রোহিণী লম্বা করিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, উনুন গোড়ায় বসিয়া, দালে কাটি দিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া হরলাল ফিরিয়া চলিল।

হরলাল দ্বার পর্য্যন্ত গেলে, রোহিণী বলিল, "কাগজখানা না হয় রাখিয়া যান, দেখি, কি করিতে পারি।"

হরলাল আহ্লাদিত হইয়া জাল উইল ও নোট রোহিণীর নিকটে রাখিল; দেখিয়া রোহিণী বলিল, "নোট না। শুধু উইলখানা রাখুন।"

হরলাল তখন জাল উইল রাখিয়া নোট লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঐ দিবস রাত্রি আটটার সময়ে কৃষ্ণকান্ত রায় আপন শয়নমন্দিরে পর্য্যঙ্কে বসিয়া উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া, সটকায় তামাক টানিতেছিলেন এবং সংসারে একমাত্র ঔষধ—মাদকমধ্যে শ্রেষ্ঠ—অহিফেন ওরফে আফিমের নেশায় মিঠে রকম ঝিমাইতেছিলেন। ঝিমাইতে ঝিমাইতে খেয়াল দেখিতেছিলেন, যেন উইলখানি হঠাৎ বিক্রয় কোবালা হইয়া গিয়াছে। যেন হরলাল তিন টাকা তের আনা দু কড়া দু ক্রান্তি মূল্যে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি কিনিয়া লইয়াছে। আবার যেন কে বলিয়া দিল যে, না, এ দানপত্র নহে, এ তমসুক। তখনই যেন দেখিলেন যে, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিম কর্জ্জ লইয়া, এই দলিল লিখিয়া দিয়া, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন—মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোরক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এমত সময়ে রোহিণী ধীরে ধীরে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা কি ঘুমাইয়াছ?"

কৃষ্ণকান্ত ঝিমাইতে ঝিমাইতে কহিলেন, "কে নন্দী? ঠাকুরকে এই বেলা ফোরক্লোজ করিতে বল।"

রোহিণী বুঝিল, যে কৃষ্ণকান্তের আফিমের আমল হইয়াছে। হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরদাদা, নন্দী কে?"

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় না তুলিয়া বলিলেন, "হুম্, ঠিক বলেছ। বৃন্দাবনে গোয়ালবাড়ী মাখন খেয়েছে—আজও তার কড়ি দেয় নাই।"

রোহিণী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্তের চমক হইল, মাথা তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কে ও, অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী?"

রোহিণী উত্তর করিল, "মৃগশিরা আর্দ্রা পুনর্ব্বসু পুষ্যা।"

কৃষ্ণ। অশ্লেষা মঘা পূর্ব্বফল্গুনী।

রো। ঠাকুরদাদা, আমি কি তোমার কাছে জ্যোতিষ শিখ্‌তে এয়েছি?

কৃষ্ণ। তাই ত! তবে কি মনে করিয়া? আফিঙ্গ চাই না ত?

রো। যে সামগ্রী প্রাণ ধরে দিতে পারবে না, তার জন্যে কি আমি এসেছি? আমাকে কাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই এসেছি।

কৃষ্ণ। এই এই। তবে আফিঙ্গেরই জন্য।

রো। না, ঠাকুরদাদা, না। তোমার দিব্যি, আফিঙ্গ চাই না। কাকা বলিলেন যে, যে উইল আজ লেখাপড়া হয়েছে, তাতে তোমার দস্তখত হয় নাই।

কৃষ্ণ। সে কি! আমার বেশ মনে পড়িতেছে যে, আমি দস্তখত করিয়াছি।

রো। না, কাকা কহিলেন যে, তাঁহার যেন স্মরণ হচ্ছে তুমি তাতে দস্তখত কর নাই; ভাল, সন্দেহ রাখার দরকার কি? তুমি কেন সেখানা খুলে একবার দেখ না।

কৃষ্ণ। বটে—তবে আলোটা ধর দেখি।

বলিয়া কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া উপাধানের নিম্ন হইতে একটি চাবি লইলেন। রোহিণী নিকটস্থ দীপ হস্তে লইল। কৃষ্ণকান্ত প্রথমে একটি ক্ষুদ্র হাতবাক্স খুলিয়া একটি বিচিত্র চাবি লইয়া পরে একটা চেষ্ট ড্রয়ারের একটি দেরাজ খুলিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া ঐ উইল বাহির করিলেন। পরে বাক্স হইতে চশমা বাহির করিয়া নাসিকার উপর সংস্থাপনের উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু চশমা লাগাইতে লাগাইতে দুই চারি বার আফিমের ঝিমকিনি আসিল—সুতরাং তাহাতে কিছুকাল বিলম্ব হইল। পরিশেষে চশমা সুস্থির হইলে কৃষ্ণকান্ত উইলে নেত্রপাত করিয়া দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "রোহিণী, আমি কি বুড় হইয়া বিহ্বল হইয়াছি? এই দেখ, আমার দস্তখত।"

রোহিণী বলিল, "বালাই, বুড়ো হবে কেন? আমাদের কেবল জোর করিয়া নাতনী বল বই ত না। তা ভাল, আমি এখন যাই, কাকাকে বলি গিয়া।"

রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের শয়নমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

* * *

গভীর নিশাতে কৃষ্ণকান্ত নিদ্রা যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, তাঁহার শয়নগৃহে দীপ জ্বলিতেছে না। সচরাচর সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বলিত, কিন্তু সে রাত্রে দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে দেখিলেন, নিদ্রাভঙ্গকালে এমতও শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল যে, যেন কে একটা চাবি কলে ফিরাইল। এমত বোধ হইল, যেন ঘরে কে মানুষ বেড়াইতেছে। মানুষ তাঁহার পর্য্যঙ্কের শিরোদেশ পর্য্যন্ত আসিল—তাঁহার বালিশে হাত দিল। কৃষ্ণকান্ত আফিমের নেশায় বিভোর; না নিদ্রিত, না জাগরিত, বড় কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ঘরে যে আলো নাই—তাহাও ঠিক বুঝেন নাই, কখন অর্দ্ধনিদ্রিত—কখন অর্দ্ধসচেতন—সচেতনেও চক্ষু খুলে না। একবার দৈবাৎ চক্ষু খুলিয়া কতকটা অন্ধকার বোধ হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণকান্ত তখন মনে করিতেছিলেন যে, তিনি হরি ঘোষের মোকদ্দমায় জাল দলিল দাখিল করায়, জেলখানায়

গিয়াছেন। জেলখানা ঘোরান্ধকার। কিছু পরে হঠাৎ যেন চাবি খোলার শব্দ অল্প কাণে গেল—এ কি জেলের চাবি পড়িল? হঠাৎ একটু চমক হইল। কৃষ্ণকান্ত সটকা হাতড়াইলেন, পাইলেন না—অভ্যাসবশতঃ ডাকিলেন, "হরি!"

কৃষ্ণকান্ত অন্তঃপুরে শয়ন করিতেন না—বহির্ব্বাটীতেও শয়ন করিতেন না। উভয়ের মধ্যে একটি ঘর ছিল। সে ঘরে শয়ন করিতেন। সেখানে হরি নামক একজন খানসামা তাঁহার প্রহরীস্বরূপ শয়ন করিত। আর কেহ না। কৃষ্ণকান্ত তাহাকেই ডাকিলেন, "হরি!"

কৃষ্ণকান্ত বারেক মাত্র হরিকে ডাকিয়া আবার আফিমে ভোর হইয়া ঝিমাইতে লাগিলেন। আসল উইল, তাঁহার গৃহ হইতে সেই অবসরে অন্তর্হিত হইল। জাল উইল তৎপরিবর্ত্তে স্থাপিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে রোহিণী আবার রাঁধিতে বসিয়াছে, আবার সেখানে হরলাল উঁকি মারিতেছে। ভাগ্যবশতঃ ব্রহ্মানন্দ বাড়ী ছিল না—নহিলে কি একটা মনে করিতে পারিত।

হরলাল ধীরে ধীরে রোহিণীর কাছে গেল—রোহিণী বড় চাহিয়া দেখে না। হরলাল বলিল, "চাহিয়া দেখ—হাঁড়ি ফাটিবে না।"

রোহিণী চাহিয়া হাসিল। হরলাল বলিল, "কি করিয়াছ?"

রোহিণী অপহৃত উইল আনিয়া হরলালকে দেখিতে দিল। হরলাল পড়িয়া দেখিল আসল উইল বটে। তখন সে দুষ্টের মুখে হাসি ধরে না। উইল হাতে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রকারে আনিলে?"

রোহিণী সে গল্প আরম্ভ করিল। প্রকৃত কিছুই বলিল না। একটি মিথ্যা উপন্যাস বলিতে লাগিল—বলিতে বলিতে সে হরলালের হাত হইতে উইলখানি লইয়া দেখাইল কি প্রকারে কাগজখানা একটা কলমদানের ভিতর পড়িয়া ছিল। উইল চুরির কথা শেষ হইলে রোহিণী হঠাৎ উইলখানা হাতে করিয়া উঠিয়া গেল। যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার হাতে উইল না দেখিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "উইল কোথায় রাখিয়া আসিলে?"

রোহি। তুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

হর। আর তুলিয়া রাখিয়া কি হইবে? আমি এখনই যাইব।

রোহি। এখনই যাবে? এত তাড়াতাড়ি কেন?

হর। আমার থাকিবার যো নাই।

রোহি। তা যাও।

হর। উইল?

রো। আমার কাছে থাক্।

হর। সে কি? উইল আমায় দেবে না?

রো। তোমার কাছে থাকাও যে, আমার কাছে থাকাও সে।

হর। যদি আমাকে উইল দেবে না, তবে ইহা চুরি করিলে কেন?

রো। আপনারই জন্য। আপনারই জন্য ইহা রহিল। যখন আপনি বিধবা বিবাহ করিবেন, আপনার স্ত্রীকে এ উইল দিব। আপনি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।

হরলাল বুঝিল, বলিল, "তা হবে না—রোহিণি! টাকা যাহা চাও, দিব।"

রো। লক্ষ টাকা দিলেও নয়। যাহা দিবে বলিয়াছিলে, তাই চাই।

হর। তা হয় না। আমি জাল করি, চুরি করি, আপনারই হকের জন্য। তুমি চুরি করিয়াছ কার হকের জন্য?

রোহিণীর মুখ শুকাইল। রোহিণী অধোবদনে রহিল। হরলাল বলিতে লাগিল, "আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।"

রোহিণী সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, মাথায় কাপড় উঁচু করিয়া তুলিয়া হরলালের মুখপানে চাহিল; বলিল "আমি চোর! তুমি সাধু! কে আমাকে চুরি করিতে বলিয়াছিল? কে আমাকে বড় লোভ দেখাইল? সরলা স্ত্রীলোক দেখিয়া কে প্রবঞ্চনা করিল? যে শঠতার চেয়ে আর শঠতা নাই, যে মিথ্যার চেয়ে আর মিথ্যা নাই, যা ইতরে বর্ব্বরে মুখেও আনিতে পারে না, তুমি কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র হইয়া তাই করিলে? হায়! হায়! আমি তোমার অযোগ্য? তোমার মত নীচ শঠকে গ্রহণ করে, এমন হতভাগী কেহ নাই। তুমি যদি মেয়েমানুষ হইতে তোমাকে আজ, যা দিয়া ঘর ঝাঁট দিই, তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষমানুষ, মানে মানে দূর হও।"

হরলাল বুঝিল, উপযুক্ত হইয়াছে। মানে মানে বিদায় হইল—যাইবার সময় একটু টিপিটিপি হাসিয়া গেল। রোহিণীও বুঝিল যে, উপযুক্ত হইয়াছে—উভয় পক্ষে। সেও খোঁপাটা একটু আঁটিয়া নিয়া রাঁধিতে বসিল। রাগে খোঁপাটা খুলিয়া গিয়াছিল। তার চোখে জল আসিতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তুমি, বসন্তের কোকিল! প্রাণ ভরিয়া ডাক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ যে, সময় বুঝিয়া ডাকিবে। সময়ে, অসময়ে, সকল সময়ে ডাকাডাকি ভাল নহে। দেখ, আমি বহু সন্ধানে লেখনী মসীপাত্র ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাইয়া, আরও অধিক অনুসন্ধানের পর মনের সাক্ষাৎ পাইয়া, কৃষ্ণকান্তের উইলের কথা ফাঁদিয়া লিখিতে বসিতেছিলাম, এমন সময় তুমি আকাশ হইতে ডাকিলে "কুহু! কুহু! কুহু!" তুমি সুকণ্ঠ, আমি স্বীকার করি, কিন্তু সুকণ্ঠ বলিয়া কাহারও কিছু ডাকিবার অধিকার নাই। যাহা হউই, আমার পলিত কেশ, চলিত কলম, এ সব স্থানে তোমার ডাকাডাকিতে বড় আসে যায় না। কিন্তু দেখ, যখন নব্যবাবু টাকার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া জমাখরচ লইয়া মাথা কুটাকুটি করিতেছেন, তখন তুমি হয়ত আপিসের ভগ্ন প্রাচীরের কাছ হইতে ডাকিলে, "কুহু" বাবুর আর জমাখরচ মিলিল না। যখন বিরহসন্তপ্তা সুন্দরী, প্রায় সমস্ত দিনের পর অর্থাৎ বেলা নটার সময় দুটি ভাত মুখে দিতে বসিয়াছেন, কেবল ক্ষীরের বাটিটি কোলে টানিয়া লইয়াছেন মাত্র, অমনি তুমি ডাকিলে—"কুহু"—সুন্দরীর ক্ষীরের বাটি অমনি রহিল—হয়ত, তাহাতে অন্যমনে লুণ মাখিয়া খাইলেন। যাহা হউক, তোমার কুহুরবে কিছু যাদু আছে, নইলে যখন তুমি বকুল গাছে বসিয়া ডাকিতেছিলে আর বিধবা রোহিণী কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল—তখন—কিন্তু আগে জল আনিতে যাওয়ার পরিচয়টা দিই।

তা, কথাটা এই। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ দুঃখী লোক—দাসী চাকরাণীর বড় ধার ধারে না। সেটা সুবিধা, কি কুবিধা, তা বলিতে পারি না—সুবিধা হউক, কুবিধা হউক, যাহার চাকরাণী নাই, তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল, এবং ময়লা, এই চারিটি বস্তু নাই। চাকরাণী, নামে দেবতা এই চারিটির সৃষ্টিকর্ত্তা। বিশেষ যাহার অনেকগুলি চাকরাণী, তাহার বাড়ীতে নিত্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ—নিত্য রাবণবধ। কোন চাকরাণী ভীমরূপিণী, সর্ব্বদাই সম্মার্জ্জনীগদা হস্তে গৃহরণক্ষেত্রে ফিরিতেছেন; কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা দুর্য্যোধন, ভীষ্ম দ্রোণ, কর্ণতুল্য বীরগণকে ভৎর্সনা করিতেছেন, কেহ কুম্ভকর্ণরূপিণী ছয় মাস করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন; নিদ্রান্তে সর্ব্বস্ব খাইতেছেন; কেহ সুগ্রীব, গ্রীবা হেলাইয়া কুম্ভকর্ণের বধের উদ্যোগ করিতেছেন। ইত্যাদি।

ব্রহ্মানন্দের সে সকল আপদ্ বালাই ছিল না, সুতরাং জল আনা, বাসন

মাজাটা, রোহিণীর ঘাড়ে পড়িয়াছিল। বৈকালে, অন্যান্য কাজ শেষ হইলে, রোহিণী জল আনিতে যাইত। যে দিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তাহার পরদিন নিয়মিত সময়ে রোহিণী কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল। বাবুদের একটা বড় পুকুর আছে—নাম বারুণী—জল তার বড় মিঠা—রোহিণী সেইখানে জল আনিতে যাইত। আজিও যাইতেছিল। রোহিণী একা জল আনিতে যায়। দল বাঁধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি হাসিতে হাসিতে হালকা কলসীতে হালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিণীর অভ্যাস নহে। রোহিণীর কলসী ভারি, চালচলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা। কিন্তু বিধবার মত কিছু রকম নাই। অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতাপেড়ে ধুতি পরা, আর কাঁধের উপর চারুনির্ম্মিতা কাল ভুজঙ্গিনীতুল্যা কুণ্ডলীকৃতা দোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। পিতলের কলসী কক্ষে ; চলনের দোলনে ধীরে ধীরে সে কলসী নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে। চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে, বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের ম' মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল—অমনি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল, হেলিয়া দুলিয়া, পাল ভরা জাহাজের মত ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে রোহিণী সুন্দরী সরোবরপথ আলো করিয়া জল লইতে আসিতেছিল—এমন সময়ে বকুলের ডালে বসিয়া বসন্তের কোকিল ডাকিল।

কুহুঃ কুহুঃ কুহুঃ! রোহিণী চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি রোহিণীর সেই ঊর্দ্ধবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই ক্ষুদ্র পাখিজাতি—তখনই সে, সে শরে বিদ্ধ হইয়া উলটি পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু পাখীর অদৃষ্টে তাহা ছিল না—কার্য্যকারণের অনন্ত শ্রেণী পরম্পরায় এটি গ্রন্থিবদ্ধ হয় নাই—অথবা পাখীর তত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ছিল না। মূর্খ পাখী আবার ডাকিল—"কুহু! কুহু! কুহু!"

"দূর হ! কালামুখো!" বলিয়া রোহিণী চলিয়া গেল। চলিয়া গেল, কিন্তু কোকিলকে ভুলিল না। আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে, কোকিল অসময়ে ডাকিয়াছিল। গরীব বিধবা যুবতী একা জল আনিতে যাইতেছিল, তখন ডাকাটা ভাল হয় নাই। কেন না, কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারাইয়া যাওয়ায় জীবনসর্ব্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা পাইব না। যেন কি নাই, কেন যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন

হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারে অনন্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হইল না।

আবার কুহুঃ, কুহুঃ, কুহুঃ। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্ম্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্র-মুকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুন গুনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাধা। দেখিল—সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে ফুল ফুটিয়াছে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ,—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজি-নির্ম্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিত-বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল! এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল—"কুউ-উ।" তখন রোহিণী সরোবর-সোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।

কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না। আমি স্ত্রীলোকের মনের কথা কি প্রকারে বলিব? তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয়, ঐ দুষ্ট কোকিল রোহিণীকে কাঁদাইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বারুণী পুষ্করিণী লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম – আমি তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ—নীল কাচের আয়নার মত ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম—বাগানের ফ্রেম—পুষ্করিণীর চারিপাশে বাবুদের বাগান—উদ্যানবৃক্ষের এবং উদ্যান প্রাচীরের বিরাম নাই। সেই ফ্রেমখানা বড় জাঁকাল—লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা—নানা ফলের পাতর বসান। মাঝে সাদা বৈঠকখানা বাড়ীগুলা এক একখানা বড় বড় হীরার মত অন্তগামী

সূর্য্যের কিরণে জ্বলিতেছিল। আর মাথার উপর আকাশ—সেও সেই বাগান ফ্রেমে আঁটা, সেও একখানা নীল আয়না। আর সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম, আর সেই ঘাসের ফ্রেম, ফুল, ফল, গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে সেই কোকিলটা ডাকিতেছিল। এ সকল এক রকম বুঝান যায়, কিন্তু সেই আকাশ, আর সেই পুকুর, আর সেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে রোহিণীর মনের কি সম্বন্ধ, সেইটি বুঝাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে, এই বারুণী পুকুর লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম।

আমিও গোলে পড়িলাম, আর গোবিন্দলালও বড় গোলে পড়িল। গোবিন্দলালও সেই কুসুমিতা লতার অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন যে, রোহিণী আসিয়া ঘাটের রাণায় একা বসিয়া কাঁদিতেছে। গোবিন্দলালবাবু মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, এ পাড়ায় কোন মেয়েছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে। আমরা গোবিন্দলালের সিদ্ধান্তে তত ভরাভর করি না। রোহিণী কাঁদিতে লাগিল।

রোহিণী কি ভাবিতেছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয় ভাবিতেছিল যে, কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না। কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী—মনে কর, ঐ গোবিন্দলালবাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য? দূর হোক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই—কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি?

তা আমরা ত বলিয়াছি, রোহিণী লোক ভাল নয়। দেখ, একটুতে কত হিংসা! রোহিণীর অনেক দোষ—তার কান্না দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি? করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই—পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভাল। দেবতার মেঘ কণ্টক-ক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করে না।

তা, তোমরা রোহিণীর জন্য একবার আহা বল। দেখ, এখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কপালে হাত দিয়া কাঁদিতেছে—শূন্য কলসী জলের উপর বাতাসে নাচিতেছে।

শেষে সূর্য্য অস্ত গেলেন; ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল—শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখীসকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে লাগিল।

গোরুসকল গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল—অন্ধকারের উপর মৃদু আলো ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহার কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে। তখন গোবিন্দলাল উদ্যান হইতে গৃহাভিমুখে চলিলেন—যাইবার সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া আছে।

এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া, তাঁহার একটু দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল যে, এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ—আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না ?

গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রোহিণীর কাছে গিয়া, তাহার পার্শ্বে চম্পকনির্মিত মূর্ত্তিবৎ সেই চম্পকবর্ণ চন্দ্রকিরণে দাঁড়াইলেন। রোহিণী দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "রোহিণি ! তুমি এতক্ষণ একা বসিয়া কাঁদিতেছ কেন ?

রোহিণী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কথা কহিল না।

গোবিন্দলাল পুনরপি বলিলেন, "তোমার কিসের দুঃখ, আমায় কি বলিবে না ? যদি আমি কোন উপকার করিতে পারি।"

যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল—গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে পারিল না। কিছু বলিল না—গঠিত পুত্তলীর মত সেই সরোবরসোপানের শোভা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল স্বচ্ছসরোবরজলে সেই ভাস্করকীর্ত্তিকল্প মূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের ছায়া দেখিলেন এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর—কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর ! সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ। গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন। রোহিণীকে আবার বলিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও। নিজে না বলিতে পার, তবে আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের দ্বারায় জানাইও।"

রোহিণী এবার কথা কহিল। বলিল, "একদিন বলিব। আজ নহে। একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।"

গোবিন্দলাল স্বীকৃত হইয়া গৃহাভিমুখে গেলেন। রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া কলসী ধরিয়া, তাহাতে জল পূরিল—কলসী তখন—বক্—বক্—গল্—গল্—করিয়া বিস্তর আপত্তি করিল। আমি জানি, শূন্য কলসীতে জল পূরিতে গেলে কলসী

কি মৃৎকলসী, কি মনুষ্যকলসী, এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকে—বড় গণ্ডগোল করে। পরে অন্তঃশূন্য কলসী, পূর্ণতোয় হইলে রোহিণী ঘাটে উঠিয়া আর্দ্র বস্ত্রে দেহ সুচারুরূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া, ধীরে ধীরে ঘরে যাইতে লাগিল। তখন চলৎ ছলৎ ঠনাক্। ঝিনিক্ ঠিনিকি ঠিন! বলিয়া, কলসীতে আর কলসীর জলেতে আর রোহিণীর বালাতে কথোপকথন হইতে লাগিল। আর রোহিণীর মনও সেই কথোপকথনে আসিয়া যোগ দিল—

রোহিণীর মন বলিল—উইল চুরি করা কাজটা!

জল বলিল—ছলাৎ।

রোহিণীর মন—কাজটা ভাল হয় নাই।

বালা বলিল—ঠিন্ ঠিনা—না! তা ত না—

রোহিণীর মন—এখন উপায়?

কলসী—ঠনক্ ঢনক্ ঢন্—উপায় আমি,—দড়ি সহযোগে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রোহিণী সকাল সকাল পাক কার্য্য সমাধা করিয়া, ব্রহ্মানন্দকে ভোজন করাইয়া আপনি অনাহারে শয়নগৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়া শয়ন করিল। নিদ্রার জন্য নহে—চিন্তার জন্য।

তুমি দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতামত ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া, আমার কাছে একটা মোটা কথা শুন। সুমতি নামে দেবকন্যা, এবং কুমতি নামে রাক্ষসী, এই দুইজন সর্বদা মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ করে; এবং সর্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। যেমন দুইটা ব্যাঘ্রী, মৃত গাভী লইয়া পরস্পরে যুদ্ধ করে, যেমন দুই শৃগালী, মৃত নরদেহ লইয়া বিবাদ করে, ইহারা জীবন্ত মনুষ্য লইয়া সেইরূপ করে। আজি, এই বিজন শয়নাগারে, রোহিণীকে লইয়া সেই দুইজনে সেইরূপ ঘোর বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল।

সুমতি বলিতেছিল, "এমন লোকেরও সর্বনাশ করিতে আছে?"

কুমতি। উইল ত হরলালকে দিই নাই। সর্বনাশ কই করিয়াছি?

সু। কৃষ্ণকান্তের উইল কৃষ্ণকান্তকে ফিরাইয়া দাও।

কু। বাঃ, যখন কৃষ্ণকান্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, "এ উইল তুমি কোথায় পাইলে, আর আমার দেরাজে আর একখানা জাল উইলই বা কোথা হইতে আসিল," তখন আমি কি বলিব? কি মজার কথা! কাকাতে আমাতে দুজনে থানায় যেতে বল না কি?

সু। তবে সকল কথা কেন গোবিন্দলালের কাছে খুলিয়া বলিয়া, তাহার পায়ে কাঁদিয়া পড় না? সে দয়ালু, অবশ্য তোমাকে রক্ষা করিবে।

কু। সেই কথা। কিন্তু গোবিন্দলালকে অবশ্য এ সকল কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে জানাইতে হইবে, নইলে উইলের বদল ভাঙ্গিবে না। কৃষ্ণকান্ত যদি থানায় দেয়, তবে গোবিন্দলাল রাখিবে কি প্রকারে? বরং আর এক পরামর্শ আছে। এখন চুপ করিয়া থাক—আগে কৃষ্ণকান্ত মরুক, তারপর তোমার পরামর্শ মতে গোবিন্দলালের কাছে গিয়া তাঁহার পায়ে জড়াইয়া পড়িব। তখন তাঁহাকে উইল দিব।

সু। তখন বৃথা হইবে। যে উইল কৃষ্ণকান্তের ঘরে পাওয়া যাইবে, তাহাই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। গোবিন্দলাল সে উইল বাহির করিলে, জালের অপরাধগ্রস্ত হইতে পারে।

কু। তবে চুপ করিয়া থাক—যা হইয়াছে, তা হইয়াছে।

সুতরাং সুমতি চুপ করিল—তাহার পরাজয় হইল। তারপর দুইজনে সন্ধি করিয়া, সখ্যভাবে আর এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সেই বাপীতীরবিরাজিত, চন্দ্রালোকপ্রতিভাসিত, চম্পকদামনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি আনিয়া, রোহিণীর মানস চক্ষের অগ্রে ধরিল। রোহিণী দেখিতে লাগিল—দেখিতে, দেখিতে, কাঁদিল। রোহিণী সে রাত্রে ঘুমাইল না।

নবম পরিচ্ছেদ

সেই অবধি নিত্য কলসী কক্ষে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়। নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য সেই গোবিন্দলালকে পুষ্পকাননমধ্যে দেখিতে পায়, নিত্য সুমতি কুমতিতে সন্ধিবিগ্রহ উভয়ই ঘটনা হয়। সুমতি কুমতির বিবাদ বিসংবাদ মনুষ্যের সহনীয়; কিন্তু সুমতি কুমতির সদ্ভাব অতিশয় বিপত্তিজনক। তখন সুমতি কুমতির রূপ ধারণ করে, কুমতি সুমতির কাজ করে। তখন কে সুমতি, কে কুমতি, চিনিতে পারা যায় না। লোকে সুমতি বলিয়া কুমতির বশ হয়।

যাহা হউক, কুমতি হউক, সুমতি হউক, গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র! দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল। তখন সংসারে তাহার চক্ষে—যাক্, পুরাতন কথা আমার তুলিয়া কাজ নাই। রোহিণী, সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল। কুমতির পুনর্ব্বার জয় হইল।

কেন যে এতকালের পর, তাহার এ দুর্দ্দশা হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি। সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিলন্দালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ—এই সকল উপলক্ষে কিছুকাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। তাহাতে কি হয় না হয়, তাহা আমি জানি না, যেমন ঘটিয়াছে, আমি তেমনি লিখিতেছি।

রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী, একেবারেই বুঝিল যে, মরিবার কথা। যদি গোবিন্দলাল ঘুণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে, তবে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না। হয়ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে এ কথা বলিবার নহে। রোহিণী অতি যত্নে, মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল।

কিন্তু যেমন লুক্কায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিত্তে তাহাই হইতে লাগিল। জীবনভার বহন করা, রোহিণীর পক্ষে কষ্টদায়ক হইল। রোহিণী মনে মনে রাত্রিদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল।

কত লোক যে মনে মনে মৃত্যুকামনা করে, কে তাহার সংখ্যা রাখে? আমার বোধ হয়, যাহারা সুখী, যাহারা দুঃখী, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কায়মনোবাক্যে মৃত্যুকামনা করে। এ পৃথিবীর সুখ সুখ নহে, সুখও দুঃখময়, কোন সুখেই সুখ নাই, কোন সুখই সম্পূর্ণ নহে, এজন্য অনেকে সুখী জনে মৃত্যুকামনা করে—আর দুঃখী, দুঃখের ভার আর বহিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুকে ডাকে।

মৃত্যুকে ডাকে, কিন্তু কার কাছে মৃত্যু আসে? ডাকিলে মৃত্যু আসে না। যে সুখী, যে মরিতে চায় না, যে সুন্দর, যে যুবা, সে আশাপূর্ণ, যাহার চক্ষে পৃথিবী নন্দনকানন, মৃত্যু তাহারই কাছে আসে। রোহিণীর মত কাহারও কাছে আসে না। এদিকে মনুষ্যের এমনি শক্তি অল্প যে, মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র সূচীবেধে, অর্দ্ধবিন্দু ঔষধভক্ষণে, এ নশ্বর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, এ চঞ্চল জলবিম্ব কালসাগরে মিলাইতে পারে—কিন্তু আন্তরিক মৃত্যুকামনা করিলেও প্রায় কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সূচ ফুটায় না, সে অর্দ্ধবিন্দু ঔষধ পান করে না। কেহ কেহ তাহা পারে, কিন্তু রোহিণী সে দলের নহে—রোহিণী তাহা পারিল না।

কিন্তু এক বিষয়ে রোহিণী কৃতসঙ্কল্প হইল—জাল উইল চালান হইবে না। ইহার এক সহজ উপায় ছিল—কৃষ্ণকান্তকে বলিলে, কি কাহারও দ্বারা বলাইলেই হইল যে, মহাশয়ের উইল চুরি গিয়াছে—দেরাজ খুলিয়া যে উইল আছে, তাহা পড়িয়া দেখুন। রোহিণী যে চুরি করিয়াছিল, ইহাও প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই—যেই চুরি করুক, কৃষ্ণকান্তের মনে একবার সন্দেহমাত্র জন্মিলে, তিনি সিন্দুক খুলিয়া উইল পড়িয়া দেখিবেন—তাহা হইলে জাল উইল দেখিয়া নূতন উইল প্রস্তুত করিবেন। গোবিন্দলালের সম্পত্তি রক্ষা হইবে, অথচ কেহ জানিতে পারিবে না যে, কে উইল চুরি করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ্—কৃষ্ণকান্ত জাল উইল পড়িলেই জানিতে পারিবেন যে, ইহা ব্রহ্মানন্দের হাতের লেখা—তখন ব্রহ্মানন্দ মহা বিপদে পড়িবেন। অতএব দেরাজে যে জাল উইল আছে, ইহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করা যাইতে পারে না।

অতএব হরলালের লোভে রোহিণী, গোবিন্দলালের যে গুরুতর অনিষ্ট সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তৎপ্রতিকারার্থ বিশেষ ব্যাকুলা হইয়াও সে খুল্লতাতের রক্ষানুরোধে কিছুই করিতে পারিল না। শেষ সিদ্ধান্ত করিল, যে প্রকারে প্রকৃত উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে জাল উইল লইয়া আসিবে।

নিশীথকালে, রোহিণী সুন্দরী, প্রকৃত উইলখানি লইয়া সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। খড়কীদ্বার রুদ্ধ; সদর ফটকে যথায় দ্বারবানেরা চারপাইয়ে উপবেশন করিয়া, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে, অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠে, পিলু রাগিণীর পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন, রোহিণী সেইখানে উপস্থিত হইল। দ্বারবানেরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?" রোহিণী বলিল, "সখী।" সখী, বাটীর একজন যুবতী চাকরাণী, সুতরাং দ্বারবানেরা আর কিছু বলিল না। রোহিণী নির্ব্বিঘ্নে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক, পূর্বপরিচিত পথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে গেলেন—পুরী সুরক্ষিত বলিয়া কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইত না। প্রবেশকালে কাণ পাতিয়া রোহিণী শুনিল যে, অবাধে কৃষ্ণকান্তের নাসিকাগর্জ্জন হইতেছে। তখন ধীরে ধীরে বিনা শব্দে উইলচোর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দীপ নির্ব্বাপিত করিল। পরে পূর্ব্বমত চাবি সংগ্রহ করিল। এবং পূর্ব্বমত, অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া, দেরাজ খুলিল।

রোহিণী অতিশয় সাবধান, হস্ত অতি কোমলগতি। তথাপি চাবি ফিরাইতে খট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

কৃষ্ণকান্ত ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে, কি শব্দ হইল। কোন সাড়া দিলেন না—কাণ পাতিয়া রহিলেন।

রোহিণীও দেখিলেন যে, নাসিকাগর্জ্জনশব্দ বন্ধ হইয়াছে। রোহিণী বুঝিলেন, কৃষ্ণকান্তের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। রোহিণী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "কে ও?" কেহ কোন উত্তর দিল না।

সে রোহিণী আর নাই। রোহিণী এখন শীর্ণা, ক্লিষ্টা, বিবশা—বোধ হয় একটু ভয় হইয়াছিল—একটু নিঃশ্বাসের শব্দ হইয়াছিল। নিঃশ্বাসের শব্দ কৃষ্ণকান্তের কাণে গেল।

কৃষ্ণকান্ত হরিকে বার কয়েক ডাকিলেন। রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে পলাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দলালের প্রতিকার হয় না। রোহিণী মনে মনে ভাবিল, "দুষ্কর্ম্মের জন্য সেদিন যে সাহস করিয়াছিলাম, আজ সৎকর্ম্মের জন্য তাহা করিতে পারি না কেন? ধরা পড়ি পড়িব।" রোহিণী পলাইল না।

কৃষ্ণকান্ত কয় বার হরিকে ডাকিয়া কোন উত্তর পাইলেন না। হরি স্থানান্তরে সুখানুসন্ধানে গমন করিয়াছিল—শীঘ্র আসিবে। তখন কৃষ্ণকান্ত উপাধানতল হইতে অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা গ্রহণপূর্ব্বক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন। শলাকালোকে দেখিলেন গৃহমধ্যে, দেরাজের কাছে, স্ত্রীলোক।

জ্বালিত শলাকাসংযোগে কৃষ্ণকান্ত বাতি জ্বালিলেন। স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি কে?"

রোহিণী কৃষ্ণকান্তের কাছে গেল। বলিল, "আমি রোহিণী।"

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "এত রাত্রে অন্ধকারে এখানে কি করিতেছিলে?"

রোহিণী বলিল, "চুরি করিতেছিলাম।"

কৃষ্ণ। রঙ্গ রহস্য রাখ। কেন এ অবস্থায় তোমাকে দেখিলাম বল। তুমি চুরি করিতে আসিয়াছ, এ কথা সহসা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোরের অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতেছি।

রোহিণী বলিল, "তবে আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা আপনার সম্মুখেই করি, দেখুন! পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন। আমি ধরা পড়িয়াছি, পলাইতে পারিব না। পলাইব না।"

এই বলিয়া রোহিণী, দেরাজের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া দেরাজ টানিয়া খুলিল। তাহার ভিতর হইতে জাল উইল বাহির করিয়া, প্রকৃত উইল সংস্থাপিত করিল। পরে জাল উইলখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফাড়িয়া ফেলিল।

"হাঁ হাঁ, ও কি ফাড় ? দেখি দেখি" বলিয়া কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিলেন। কিন্তু তিনি চীৎকার করিতে করিতে রোহিণী সেই খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন উইল, অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল।

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে লোচন আরক্ত করিয়া বলিলেন, "ও কি পোড়াইলি ?"

রোহিণী। একখানি কৃত্রিম উইল।

কৃষ্ণকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন, "উইল ! উইল ! আমার উইল কোথায় ?"

রো। আপনার উইল দেরাজের ভিতর আছে, আপনি দেখুন না।

এই যুবতীর স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "কোন দেবতা ছলনা করিতে আসেন নাই ত ?"

কৃষ্ণকান্ত তখন দেরাজ খুলিয়া দেখিলেন, একখানি উইল তন্মধ্যে আছে। সেখানি বাহির করিলেন, চশমা বাহির করিলেন, উইলখানি পড়িয়া দেখিয়া জানিলেন, তাঁহার প্রকৃত উইল বটে। বিস্মিত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পোড়াইলে কি ?"

রো। একখানি জাল উইল।

কৃ। জাল উইল ! জাল উইল কে করিল ? তুমি তাহা কোথা পাইলে ?

রো। কে করিল তাহা বলিতে পারি না—উহা আমি এই দেরাজের মধ্যে পাইয়াছি।

কৃ। তুমি কি প্রকারে সন্ধান জানিলে যে, দেরাজের ভিতর কৃত্রিম উইল আছে ?

রো। তাহা আমি বলিতে পারিব না।

কৃষ্ণকান্ত কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, "যদি আমি তোমার মত স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্রবুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিব, তবে এ বিষয় সম্পত্তি এতকাল রক্ষা করিলাম কি প্রকারে ? এ জাল উইল হরলালের তৈয়ারী। বোধ হয় তুমি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে। তার পর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইলখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ঠিক কথা কি না ?"

রো। তাহা নহে।

কৃ। তাহা নহে ? তবে কি ?

রো। আমি কিছু বলিব না। আমি আপনার ঘরে চোরের মত প্রবেশ করিয়াছিলাম, আমাকে যাহা করিতে হয় করুন।

কৃ। তুমি মন্দ কর্ম্ম করিতে আসিয়াছিলে সন্দেহ নাই, নইলে এ প্রকারে

চোরের মত আসিবে কেন? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে পুলিশে দিব না, কিন্তু কাল তোমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব। আজ তুমি কয়েদ থাক।

রোহিণী সে রাত্রে আবদ্ধ রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রের প্রভাতে শয্যাগৃহে মুক্ত বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল। ঠিক প্রভাত হয় নাই—কিছু বাকি আছে। এখনও গৃহপ্রাঙ্গণস্থ কামিনীকুঞ্জে, কোকিল প্রথম ডাক ডাকে নাই। কিন্তু দোয়েল গীত আরম্ভ করিয়াছে। উষার শীতল বাতাস উঠিয়াছে—গোবিন্দলাল বাতায়নপথ মুক্ত করিয়া, সেই উদ্যানস্থিত মল্লিকা, গন্ধরাজ, কুটজের পরিমলবাহী শীতল প্রভাতবায়ু সেবনজন্য তৎসমীপে দাঁড়াইলেন। অমনি তাঁহার পাশে আসিয়া একটি ক্ষুদ্রশরীরা বালিকা দাঁড়াইল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আবার তুমি এখানে কেন?"

বালিকা বলিল, "তুমি এখানে কেন?" বলিতে হইবে না যে, এই বালিকা গোবিন্দলালের স্ত্রী।

গোবিন্দ। আমি একটু বাতাস খেতে এলেম, তাও কি তোমার সইল না?

বালিকা বলিল, "সবে কেন? এখনই আবার খাই খাই? ঘরের সামগ্রী খেয়ে মন উঠে না, আবার মাঠে ঘাটে বাতাস খেতে উঁকি মারেন!"

গো। ঘরের সামগ্রী এত কি খাইলাম?

"কেন, এইমাত্র আমার কাছে গালি খাইয়াছ?"

গোবিন্দ। জান না, ভোমরা, গালি খাইলে যদি বাঙ্গালীর ছেলের পেট ভরিত তাহা হইলে, এ দেশের লোক এতদিনে সগোষ্ঠী বদহজমে মরিয়া যাইত। ও সামগ্রীটি অতি সহজে বাঙ্গালীর পেটে জীর্ণ হয়। তুমি আর একবার নথ নাড়ো, ভোমরা, আমি আর একবার দেখি।

গোবিন্দলালের পত্নীর যথার্থ নাম কৃষ্ণমোহিনী, কি কৃষ্ণকামিনী, কি অনঙ্গমঞ্জরী, কি এমনই একটা কি তাঁহার পিতা-মাতা রাখিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে লেখে না। অব্যবহারে সে নাম লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার আদরের নাম "ভ্রমর" বা "ভোমরা"। সার্থকতাবশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল। ভোমরা কালো।

ভোমরা নথ নাড়ার পক্ষে বিশেষ আপত্তি জানাইবার জন্য নথ খুলিয়া, একটা হুকে রাখিয়া, গোবিন্দলালের নাক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। পরে গোবিন্দলালের

মুখপানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল,—মনে মনে জ্ঞান, যেন বড় একটা কীর্ত্তি করিয়াছি। গোবিন্দলালও তাহার মুখপানে চাহিয়া অতৃপ্তলোচনে দৃষ্টি করিতেছিলেন। সেই সময়ে, সূর্য্যোদয়সূচক প্রথম রশ্মিকিরীট পূর্ব্বগগনে দেখা দিল—তাহার মৃদুল জ্যোতিঃপুঞ্জ ভূমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নবীনালোক পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া পূর্ব্বমুখী ভ্রমরের মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই উজ্জ্বল, পরিষ্কার, কোমল, শ্যামচ্ছবি মুখকান্তির উপর কোমল প্রভাতালোক পড়িয়া তাহার বিস্ফারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জ্বলিল, তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডে প্রভাসিত হইল। হাসি—চাহনিতে, সেই আলোতে, গোবিন্দলালের আদরে আর প্রভাতের বাতাসে—মিলিয়া গেল।

এই সময়ে সুপ্তোত্থিতা চাকরাণী মহলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তৎপরে ঘর ঝাঁটান, জল ছড়ান, বাসন মাজা, ইত্যাদির একটা সপ্ সপ্ ছপ্ ছপ্ ঝন্ ঝন্ খন্ খন্ শব্দ হইতেছিল, অকস্মাৎ সেই শব্দ বন্ধ হইয়া, "ও মা, কি হবে!" "কি সর্ব্বনাশ!" "কি আস্পর্দ্ধা!" "কি সাহস!" মাঝে মাঝে হাসি টিট্‌কারি ইত্যাদি গোলযোগ উপস্থিত হইল। শুনিয়া ভ্রমর বাহিরে আসিল।

চাকরাণী সম্প্রদায় ভ্রমরকে বড় মানিত না, তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। একে ভ্রমর ছেলেমানুষ, তাতে ভ্রমর স্বয়ং গৃহিণী নহেন, তাঁহার শাশুড়ী, ননদ ছিল, তার পর আবার ভ্রমর নিজে হাসিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিলেন না। ভ্রমরকে দেখিয়া চাকরাণীর দল বড় গোলযোগ বাড়াইল—

নং ১—আর শুনেছ বৌ ঠাকুরুণ?

নং ২—এমন সর্ব্বনেশে কথা কেহ কখনও শুনে নাই।

নং ৩—কি সাহস! মাগীকে ঝাঁটাপেটা করে আসবো এখন।

নং ৪—শুধু ঝাঁটা—বৌ ঠাকরুণ—বল, আমি তার নাক কেটে নিয়ে আসি।

নং ৫—কার পেটে কি আছে মা—তা কেমন করে জান্‌বো মা—

ভ্রমরা হাসিয়া বলিল,—"আগে বল্ না কি হয়েছে, তার পর যার মনে যা থাকে করিস্।" তখনই আবার পূর্ব্ববৎ গোলযোগ আরম্ভ হইল।

নং ১ বলিল—শোন নি? পাড়াশুদ্ধ গোলমাল হয়ে গেল যে—

নং ২ বলিল—বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

নং ৩—মাগীর ঝাঁটা দিয়ে বিষ ঝাড়িয়া দিই।

নং ৪—কি বল্‌ব বৌ ঠাকরুণ বামন হয়ে চাঁদে হাত!

নং ৫—ভিজে বেড়ালকে চিন্‌তে জোগায় না।—গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!

ভ্রমর বলিলেন, "তোদের।"

চাকরাণীরা তখন একবাক্যে বলিতে লাগিল, "আমাদের কি দোষ! আমরা কি করিলাম! তা জানি গো জানি। যে যেখানে যা করবে, দোষ হবে আমাদের! আমাদের আর উপায় নাই বলিয়া গতর খাটিয়ে খেতে এসেছি।" এই বক্তৃতা সমাপন করিয়া, দুই এক জন চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। একজনের মৃত পুত্রের শোক উছলিয়া উঠিল। ভ্রমর কাতর হইলেন—কিন্তু হাসিও সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "তোদের গলায় দড়ি এই জন্য যে, এখনও তোরা বলিতে পারিলি না যে, কথাটা কি। কি হয়েছে?"

তখন আবার চারিদিক্ হইতে চারি পাঁচ রকমের গলা ছুটিল। বহুকষ্টে ভ্রমর, সেই অনন্ত বক্তৃতাপরম্পরা হইতে এই ভাবার্থ সঙ্কলন করিলেন যে, গত রাত্রে কর্ত্তা মহাশয়ের শয়নকক্ষে একটা চুরি হইয়াছে। কেহ বলিল, চুরি নহে, ডাকাতি, কেহ বলিল, সিঁদ, কেহ বলিল, না, কেবল জন চারি পাঁচ চোর আসিয়া লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ লইয়া গিয়াছে।

ভ্রমর বলিল, "তারপর? কোন্ মাগীর নাক কাটিতে চাহিতেছিলি?"

নং ১—রোহিণী ঠাকরুণের—আর কার?

নং ২—সেই আবাগীই ত সর্ব্বনাশের গোড়া।

নং ৩—সেই নাকি ডাকাতের দল সঙ্গে করিয়া নিয়ে এসেছিল।

নং ৪—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

নং ৫—এখন মরুন জেল খেটে।

ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "রোহিণী যে চুরি করিতে আসিয়াছিল, তোরা কেমন করে জানলি?"

"কেন, সে যে ধরা পড়েছে। কাছারির গারদে কয়েদ আছে।"

ভ্রমর যাহা শুনিলেন, তাহা গিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন। গোবিন্দলাল ভাবিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

ভ্র। ঘাড় নাড়িলে যে?

গো। আমার বিশ্বাস হইল না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয়?

ভোমরা বলিল, "না।"

গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি? লোকে ত বলিতেছে।

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি?

গো। তা সময়ান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে বল।

ভ্র। তুমি আগে বল।

গোবিন্দলাল হাসিল, বলিল, "তুমি আগে।"

ভ্র। কেন আগে বলিব ?

গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে।

ভ্র। সত্য বলিব ?

গো। সত্য বল।

ভ্রমর বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরবে রহিল।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুঝিয়াছিলেন বলিয়া এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রোহিণী যে নিরপরাধিনী, ভ্রমরের তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল। আপনার অস্তিত্বে যত দূর বিশ্বাস, ভ্রমর উহার নির্দ্দোষিতায় তত দূর বিশ্বাসবতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না—কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছেন যে, "সে নির্দ্দোষী, আমার এইরূপ বিশ্বাস। গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমরকে চিনিতেন। তাই সে কালো এত ভালবাসিতেন।

হাসিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি বলিব, কেন তুমি রোহিণীর দিকে ?"

ভ্র। কেন ?

গো। সে তোমায় কালো না বলিয়া উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে।

ভ্রমর কোপকুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিল, "যাও।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যাই।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিলেন।

ভ্রমর তাঁহার বসন ধরিল—"কোথা যাও ?"

গো। কোথা যাই বল দেখি ?

ভ্র। এবার বলিব ?

গো। বল দেখি ?

ভ্র। রোহিণীকে বাঁচাইতে।

"তাই।" বলিয়া গোবিন্দলাল ভোমরার মুখচুম্বন করিলেন। পরদুঃখকাতরের হৃদয় পরদুঃখকাতরে বুঝিল—তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরের মুখচুম্বন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্ত রায়ের সদর কাছারিতে গিয়া দর্শন দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত প্রাতঃকালেই কাছারিতে বসিয়াছিলেন। গদির উপর মস্‌নদ করিয়া বসিয়া সোণার আলবোলায় অম্বুরি তামাকু চড়াইয়া মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গের অনুকরণ

করিতেছিলেন। এক পাশে রাশি রাশি দপ্তরে বাঁধা চিঠা, খতিয়ান, দাখিলা, জমাওয়াশীল, থোকা, করচা, বাকি জায়, শেহা, রোকড়—আর এক পাশে নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, মুহুরি, তহশীলদার, আমীন, পাইক, প্রজা। সম্মুখে অধোবদনা অবগুণ্ঠনবতী রোহিণী।

গোবিন্দলাল আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে জ্যেঠা মহাশয় ?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, রোহিণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ মুক্ত করিয়া, তাঁহার প্রতি ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার কথায় কি উত্তর করিলেন, তৎপ্রতি গোবিন্দলাল বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না ; ভাবিলেন, সেই কটাক্ষের অর্থ কি। শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন, "এ কাতর কটাক্ষের অর্থ ভিক্ষা।

কি ভিক্ষা ? গোবিন্দলাল ভাবিলেন, আর্ত্তের ভিক্ষা আর কি ? বিপদ হইতে উদ্ধার। সেই বাপীতীরে সোপানোপরে দাঁড়াইয়া যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার এই সময়ে মনে পড়িল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার যদি কোন বিষয়ের কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালই হউক, আমাকে জানাইও।" আজি ত রোহিণীর কষ্ট বটে, বুঝি এই ইঙ্গিতে রোহিণী তাহাকে তাহা জানাইল।

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, "তোমার মঙ্গল সাধি, ইহা আমার ইচ্ছা ; কেন না, ইহলোকে তোমার সহায় কেহ নাই দেখিতেছি। কিন্তু তুমি যে লোকের হাতে পড়িয়াছ—তোমার রক্ষা সহজ নহে। এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে জ্যেষ্ঠতাতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে জ্যেঠা মহাশয় ?"

বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত একবার সকল কথা আনুপূর্ব্বিক গোবিন্দলালকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীর কটাক্ষের ব্যাখ্যায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, কাণে কিছুই শুনেন নাই। ভ্রাতুষ্পুত্র আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, জ্যেঠা মহাশয় ?" শুনিয়া বৃদ্ধ মনে মনে ভাবিল, "হয়েছে ! ছেলেটা বুঝি মাগীর চাঁদপানা মুখখানা দেখে ভুলে গেল !" কৃষ্ণকান্ত আবার আনুপূর্ব্বিক গত রাত্রের বৃত্তান্ত গোবিন্দলালকে শুনাইলেন। সমাপন করিয়া বলিলেন, "এ সেই হরা পাজির কারসাজি। বোধ হইতেছে, এ মাগী তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল উইল রাখিয়া আসল উইল চুরি করিবার জন্য আসিয়াছিল। তারপর ধরা পড়িয়া ভয়ে জাল উইল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।"

গো। রোহিণী কি বলে ?

কৃ। ও আর বলিবে কি ? বলে, তা নয়।

গোবিন্দলাল রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা নয় ত তবে কি রোহিণি ?

রোহিণী মুখ না তুলিয়া, গদগদ কণ্ঠে বলিল, "আমি আপনাদের হাতে পড়িয়াছি, যাহা করিবার হয় করুন। আমি আর কিছু বলিব না।"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেখিলে বদ্জাতি ?"

গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, এ পৃথিবীতে সকলেই বদ্জাত নহে। ইহার ভিতর বদ্জাতি ছাড়া আর কিছু থাকিতে পারে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "ইহার প্রতি কি হুকুম দিয়াছেন ? একে কি থানায় পাঠাইবেন ?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার কাছে আবার থানা ফৌজদারি কি ? আমিই থানা, আমি মেজেষ্টর, আমিই জজ। বিশেষ এই ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে জেলে দিয়া আমার কি পৌরুষ বাড়িবে ?"

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি করিবেন ?"

কৃ। ইহার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া, কুলার বাতাস দিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিব ! আমার এলেকায় আর না আসিতে পারে।

গোবিন্দলাল আবার রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল, রোহিণি ?"

রোহিণী বলিল, "ক্ষতি কি !"

গোবিন্দলাল বিস্মিত হইলেন। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কৃষ্ণকান্তকে বলিলেন, "একটা নিবেদন আছে।"

কৃ। কি ?

গো। ইহাকে একবার ছাড়িয়া দিন। আমি জামিন হইতেছি—বেলা দশটার সময়ে আনিয়া দিব।

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "বুঝি যা ভেবেছি, তাই। বাবাজির কিছু গরজ দেখ্ছি।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "কোথায় যাইবে ? কেন ছাড়িব ?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আসল কথা কি, জানা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এত লোকের সাক্ষাতে আসল কথা এ প্রকাশ করিবে না। ইহাকে একবার অন্দরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিব।"

কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "ওর গোষ্ঠীর মুণ্ডু কর্বে। এ কালের ছেলেপুলে বড় বেহায়া হয়ে উঠেছে। রহ ছুঁচো ! আমিও তোর উপর এক চাল চালিব।" এই ভাবিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "বেশ ত।" বলিয়া কৃষ্ণকান্ত একজন নগদীকে বলিলেন,

"ও রে! একে সঙ্গে করিয়া, একজন চাকরাণী দিয়া, মেজ বৌমার কাছে পাঠিয়ে দে ত, দেখিস্ যেন পালায় না।"

নগদী রোহিণীকে লইয়া গেল। গোবিন্দলাল প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ভাবিলেন, "দুর্গা! দুর্গা! ছেলেগুলো হলো কি?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন যে, ভ্রমর রোহিণীকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাল কথা বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এ দায় সম্বন্ধে ভাল কথা বলিলেও রোহিণীর কান্না আসে, এজন্য তাহাও বলিতে পারিতেছে না। গোবিন্দলাল আসিলেন দেখিয়া ভ্রমর যেন দায় হইতে উদ্ধার পাইল। শীঘ্রগতি দূরে গিয়া গোবিন্দলালকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে গেলেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোহিণী এখানে কেন?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আমি গোপনে উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। তাহার পর উহার কপালে যা থাকে, হবে।"

ভ্র। কি জিজ্ঞাসা করিবে?

গো। উহার মনের কথা। আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয়, আড়াল হইতে শুনিও।

ভোমরা বড় অপ্রতিভ হইল। লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, ছুটিয়া সে অঞ্চল হইতে পলাইল। একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইয়া, পিছন হইতে পাচিকার চুল ধরিয়া টানিয়া বলিল, "রাঁধুনি ঠাকুরঝি! রাঁধ্তে রাঁধ্তে একটি রূপকথা বল না।"

এদিকে গোবিন্দলাল রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বৃত্তান্ত আমাকে সকল বিশেষ করিয়া বলিবে কি?" বলিবার জন্য রোহিণীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—কিন্তু যে জাতি জীয়ন্তে জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিত, রোহিণীও সেই জাতীয়—আর্য্যকন্যা। বলিল, "কর্ত্তার কাছে সবিশেষ শুনিয়াছেন ত!"

গো। কর্ত্তা বলেন, তুমি জাল উইল রাখিয়া, আসল উইল চুরি করিতে আসিয়াছিলে। তাই কি?

রো। তা নয়।

গো। তবে কি?

রো। বলিয়া কি হইবে?

গো। তোমার ভাল হইতে পারে।

রো। আপনি বিশ্বাস করিলে ত?

গো। বিশ্বাসযোগ্য কথা হইলে কেন বিশ্বাস করিব না?

রো। বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে।

গো। আমার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য, কি অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমি জানি, তুমি জানিবে কি প্রকারে? আমি অবিশ্বাসযোগ্য কথাতেও কখনও কখনও বিশ্বাস করি।

রোহিণী মনে মনে বলিল, "নহিলে আমি তোমার জন্যে মরিতে বসিব কেন? যাই হোক আমি ত মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব।" প্রকাশ্যে বলিল, "সে আপনার মহিমা। কিন্তু আপনাকে এ দুঃখের কাহিনী বলিয়াই বা কি হইবে?"

গো। যদি আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারি।

রো। কি উপকার করিবেন?

গোবিন্দলাল ভাবিলেন, "ইহার জোড়া নাই। যাই হউক, এ কাতরা—ইহাকে সহজে পরিত্যাগ করা উচিত নহে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "যদি পারি কর্ত্তাকে অনুরোধ করিব। তিনি তোমায় ত্যাগ করিবেন।"

রো। আর যদি আপনি অনুরোধ না করেন, তবে তিনি আমায় কি করিবেন?

গো। শুনিয়াছ ত?

রো। আমার মাথা মুড়াইবেন, ঘোল ঢালিয়া দিবেন, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। ইহার ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।—এ কলঙ্কের পর দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেই আমার উপকার। আমাকে তাড়াইয়া না দিলে, আমি আপনিই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব। আর এ দেশে মুখ দেখাইব কি প্রকারে? ঘোল ঢালা বড় গুরুতর দণ্ড নয়, ধুইলেই ঘোল যাইবে। বাকি এই কেশ—

এই বলিয়া রোহিণী একবার আপনার তরঙ্গক্ষুব্ধ কৃষ্ণতড়াগতুল্য কেশদাম প্রতি দৃষ্টি করিল, বলিতে লাগিল, "এই কেশ—আপনি কাঁচি আনিতে বলুন, আমি বৌ ঠাকুরুণের চুলের দড়ি বিনাইবার জন্য ইহার সকলগুলি কাটিয়া দিয়া যাইতেছি।"

গোবিন্দলাল ব্যথিত হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস পত্যাগ করিয়া বলিলেন,

"বুঝেছি রোহিণী। কলঙ্কই তোমার দণ্ড। সে দণ্ড হইতে রক্ষা না হইলে, অন্য দণ্ডে তোমার আপত্তি নাই।"

রোহিণী এবার কাঁদিল। হৃদয়মধ্যে গোবিন্দলালকে শত সহস্র ধন্যবাদ করিতে লাগিল। বলিল, যদি বুঝিয়াছেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্কদণ্ড হইতে কি আমায় রক্ষা করিতে পারিবেন?"

গোবিন্দলাল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। আসল কথা শুনিতে পাইলে, বলিতে পারি যে, পারিব কি না।"

রোহিণী বলিল, "কি জানিতে চাহেন, জিজ্ঞাসা করুন।"

গো। তুমি যাহা পোড়াইয়াছ, তাহা কি?

রো। জাল উইল।

গো। কোথায় পাইয়াছিলে?

রো। কর্ত্তার ঘরে, দেরাজে।

গো। জাল উইল সেখানে কি প্রকারে আসিল?

রো। আমিই রাখিয়া গিয়াছিলাম। যেদিন আসল উইল লেখা পড়া হয়, সেইদিন রাত্রে আসিয়া, আসল উইল চুরি করিয়া, জাল উইল রাখিয়া গিয়াছিলাম।

গো। কেন, তোমার কি প্রয়োজন?

রো। হরলালবাবুর অনুরোধে।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে কাল রাত্রে আবার কি করিতে আসিয়াছিলে?"

রো। আসল উইল রাখিয়া, জাল উইল চুরি করিবার জন্য।

গো। কেন? জাল উইলে কি ছিল?

রো। বড়বাবুর বার আনা—আপনার এক পাই।

গো। কেন আবার উইল বদলাইতে আসিয়াছিলে? আমি ত কোন অনুরোধ করি নাই।

রোহিণী কাঁদিতে লাগিল। বহু কষ্টে রোদন সম্বরণ করিয়া বলিল, "না—অনুরোধ করেন নাই—কিন্তু যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই—যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব না—আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।"

গো। সে কি রোহিণী?

রো। সেই বারুণী পুকুরের তীরে, মনে করুন।

গো। কি রোহিণী?

রো। কি? ইহজন্মে আমি বলিতে পারিব না—কি। আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই—আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম। কিন্তু সে আপনার বাড়ীতে নহে। আপনি আমার অন্য উপকার করিতে পারেন না—কিন্তু এক উপকার করিতে পারেন,—একবার ছাড়িয়া দিন, কাঁদিয়া আসি। তারপর যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে না হয়, আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবেন।

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাহার আহ্লাদ হইল না—রাগও হইল না—সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল। বলিলেন, "রোহিণি, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি। আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন?"

গোবিন্দলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রোহিণী বলিল, "বলুন না?"

গো। তোমাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

রো। কেন?

গো। তুমি আপনিই ত বলিয়াছিলে, তুমি এ দেশ ত্যাগ করিতে চাও।

রো। আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন?

গো। তোমায় আমায় আর দেখা শুনা না হয়।

রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন। মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল—বড় সুখী হইল। তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল। আবার তাহার বাঁচিতে সাধ হইল। আবার তাহার দেশে থাকিতে বাসনা জন্মিল। মনুষ্য বড়ই পরাধীন।

রোহিণী বলিল, "আমি এখনই যাইতে রাজি আছি। কিন্তু কোথায় যাইব?"

গো। কলিকাতায়। সেখানে আমি আমার এক জন বন্ধুকে পত্র দিতেছি। তিনি তোমাকে একখানি বাড়ী কিনিয়া দিবেন, তোমার টাকা লাগিবে না।

রো। আমার খুড়ার কি হইবে?

গো। তিনি তোমার সঙ্গে যাইবেন, নহিলে তোমাকে কলিকাতায় যাইতে বলিতাম না।

রো। সেখানে দিনপাত করিব কি প্রকারে?

গো। আমার বন্ধু তোমার খুড়ার একটি চাকরি করিয়া দিবেন।

রো। খুড়া দেশত্যাগে সম্মত হইবেন কেন?

গো। তুমি কি তাঁহাকে এই ব্যাপারের পর সম্মত করিতে পারিবে না ?

রো। পারিব। কিন্তু আপনার জ্যেষ্ঠতাতকে সম্মত করিবে কে ? তিনি আমাকে ছাড়িবেন কেন ?

গো। আমি অনুরোধ করিব।

রো। তাহা হইলে আমার কলঙ্কের উপর কলঙ্ক। আপনারও কিছু কলঙ্ক।

গো। সত্য ; তোমার জন্য, কর্ত্তার কাছে ভ্রমর অনুরোধ করিবে। তুমি এখন ভ্রমরের অনুসন্ধানে যাও। তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া, আপনি এই বাড়ীতেই থাকিও। ডাকিলে যেন পাই।

রোহিণী সজলনয়নে গোবিন্দলালকে দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অনুসন্ধানে গেল। এইরূপে কলঙ্কে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর শ্বশুরকে কোন প্রকার অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইল না—বড় লজ্জা করে, ছি !

অগত্যা গোবিন্দলাল স্বয়ং কৃষ্ণকান্তের কাছে গেলেন। কৃষ্ণকান্ত তখন আহারান্তে পালঙ্কে অর্দ্ধশয়নাবস্থায়, আলবোলার নল হাতে করিয়া—সুষুপ্ত। একদিকে তাঁহার নাসিকা নাদসুরে গমকে গমকে তানমূর্চ্ছনাদি সহিত নানাবিধ রাগরাগিণীর আলাপ করিতেছে—আর এক দিকে, তাঁহার মন, অহিফেনপ্রসাদাৎ ত্রিভুবনগামী অশ্বে আরূঢ় হইয়া নানা স্থান পর্য্যটন করিতেছে। রোহিণীর চাঁদপানা মুখখানা বুড়ারও মনের ভিতর ঢুকিয়াছিল বোধ হয়,—চাঁদ কোথায় উদয় না হয় ?—নহিলে বুড়া আফিঙ্গের ঝোঁকে ইন্দ্রাণীর স্কন্ধে সে মুখ বসাইবে কেন ? কৃষ্ণকান্ত দেখিতেছেন যে, রোহিণী হঠাৎ ইন্দ্রের শচী হইয়া মহাদেবের গোহাল হইতে ষাঁড় চুরি করিতে গিয়াছে। নন্দী ত্রিশূল হস্তে ষাঁড়ের জাব দিতে গিয়া, তাহাকে ধরিয়াছে। দেখিতেছেন, নন্দী রোহিণীর আলুলায়িত কুন্তলদাম ধরিয়া টানাটানি লাগাইয়াছে, এবং ষড়াননের ময়ূর, সন্ধান পাইয়া, তাহার সেই আগুল্‌ফ-বিলম্বিত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছকে স্ফীতফণা ফণিশ্রেণী ভ্রমে গিলিতে গিয়াছে —এমত সময়ে স্বয়ং ষড়ানন ময়ূরের দৌরাত্ম্য দেখিয়া নালিশ করিবার জন্য মহাদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া ডাকিতেছেন, "জ্যেঠা মহাশয় !"

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, "কার্ত্তিক মহাদেবকে কি সম্পর্কে জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিতেছেন ?" এমত সময় কার্ত্তিক আবার ডাকিলেন, "জ্যেঠা মহাশয় !" কৃষ্ণকান্ত বিরক্ত হইয়া কার্ত্তিকের কাণ মলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে

হস্ত উত্তোলন করিলেন। অমনি কৃষ্ণকান্তের হস্তস্থিত আলবোলার নল হাত হইতে খসিয়া ঝনাৎ করিয়া পানের বাটার উপর পড়িয়া গেল, পানের বাটা ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ করিয়া পিকদানির উপর পড়িয়া গেল ; এবং নল, বাটা, পিকদানি, সকলেই একত্রে সহগমন করিয়া ভূতলশায়ী হইল। সেই শব্দে কৃষ্ণকান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন যে, কার্ত্তিকেয় যথার্থই উপস্থিত। মূর্ত্তিমান স্কন্দবীরের ন্যায়, গোবিন্দলাল তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন— ডাকিতেছেন, "জ্যেঠা মহাশয়!" কৃষ্ণকান্ত শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা গোবিন্দলাল?" গোবিন্দলালকে বুড়া বড় ভালবাসিতেন।

গোবিন্দলালও কিছু অপ্রতিভ হইলেন—বলিলেন, "আপনি নিদ্রা যান—আমি এমন কিছু কাজে আসি নাই।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল পিকদানিটি উঠাইয়া সোজা করিয়া রাখিয়া, পানবাটা উঠাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, নলটি কৃষ্ণকান্তের হাতে দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত শক্ত বুড়া—সহজে ভুলে না। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "কিছু না, এ ছুঁচো আবার সেই চাঁদমুখো মাগীর কথা বলিতে আসিয়াছে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "না। আমার ঘুম হইয়াছে—আর ঘুমাইব না।"

গোবিন্দলাল একটু গোলে পড়িলেন। রোহিণীর কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে বলিতে প্রাতে তাহার কোন লজ্জা করে নাই—এখন একটু লজ্জা করিতে লাগিল—কথা বলি বলি করিয়া বলিতে পারিলেন না। রোহিণীর সঙ্গে বারুণী পুকুরের কথা হইয়াছিল বলিয়া কি এখন লজ্জা?

বুড়া রঙ্গ দেখিতে লাগিল। গোবিন্দলাল, কোন কথা পাড়িতেছে না দেখিয়া আপনি জমীদারির কথা পাড়িল—জমীদারির কথার পর সাংসারিক কথা, সাংসারিক কথার পর মোকদ্দমার কথা, তথাপি রোহিণীর দিক্ দিয়াও গেল না। গোবিন্দলাল রোহিণীর কথা কিছুতেই পাড়িতে পারিলেন না। কৃষ্ণকান্ত মনে মনে ভারি হাসি হাসিতে লাগিলেন। বুড়া বড় দুষ্ট।

অগত্যা গোবিন্দলাল ফিরিয়া যাইতেছিলেন,—তখন কৃষ্ণকান্ত প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকিয়া ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকাল বেলা যে মাগীকে তুমি জামিন হইয়া লইয়া গিয়াছিলে, সে মাগী কিছু স্বীকার করিয়াছে?"

তখন গোবিন্দলাল পথ পাইয়া যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, সংক্ষেপে বলিলেন। বারুণী পুষ্করিণী ঘটিত কথাগুলি গোপন করিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "এখন তাহার প্রতি কিরূপ করা তোমার অভিপ্রায়?"

গোবিন্দলাল লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপনার যে অভিপ্রায়, আমাদিগেরও সেই অভিপ্রায়।"

কৃষ্ণকান্ত মনে মনে হাসিয়া, মুখে কিছুমাত্র হাসির লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, "আমি উহার কথায় বিশ্বাস করি না। উহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, দেশের বাহির করিয়া দাও—কি বল ?"

গোবিন্দলাল চুপ করিয়া রহিলেন। তখন দুষ্ট বুড়া বলিল, "আর তোমরা যদি এমনিই বিবেচনা কর যে, উহার দোষ নাই—তবে ছাড়িয়া দাও।"

গোবিন্দলাল তখন নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বুড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রোহিণী গোবিন্দলালের অনুমতিক্রমে খুড়ার সঙ্গে বিদেশ যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আসিল। খুড়াকে কিছু না বলিয়া, ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িয়া, রোহিণী কাঁদিতে বসিল।

"এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাওয়া হইবে না—না দেখিয়া মরিয়া যাইব। আমি কলিকাতায় গেলে, গোবিন্দলালকে ত দেখিতে পাইব না? আমি যাইব না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের মন্দির। এই হরিদ্রাগ্রামই আমার শ্মশান, এখানে আমি পুড়িয়া মরিব। শ্মশানে মরিতে পায় না, এমন কপালও আছে! আমি যদি এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া না যাই, ত আমার কে কি করিতে পারে? কৃষ্ণকান্ত রায় আমার মাথা মুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়া দেশছাড়া করিয়া দিবে? আমি আবার আসিব। গোবিন্দলাল রাগ করিবে? করে করুক,—তবু আমি তাহাকে দেখিব। আমার চক্ষু ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমি যাব না। কলিকাতায় যাব না—কোথাও যাব না। যাই ত যমের বাড়ী যাব। আর কোথাও না।"

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, কালামুখী রোহিণী উঠিয়া দ্বার খুলিয়া আবার—"পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ"—সেই গোবিন্দলালের কাছে চলিল। মনে মনে বলিতে বলিতে চলিল,—"হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়! আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি—তাহাকে যত বার দেখিব, তত বার—আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু?—রাখিব কি প্রভু?—হে দেবতা! হে দুর্গা—হে কালী—হে জগন্নাথ—আমায় সুমতি দাও—আমার প্রাণ স্থির কর—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।"

তবু সেই স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ হৃদয়—থামিল না। কখনও ভাবিল গরল খাই; কখনও ভাবিল, গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া, অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলি; কখনও ভাবিল পলাইয়া যাই; কখনও ভাবিল, বারুণীতে ডুবে মরি; কখনও ভাবিল, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই। রোহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে গোবিন্দ-লালের কাছে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল।

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন? কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল ত?"

রো। না।

গো। সে কি? এইমাত্র আমার কাছে স্বীকার করিয়াছিলে?

রো। যাইতে পারিব না।

গো। বলিতে পারি না। জোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই—কিন্তু গেলে ভাল হইত।

রো। কিসে ভাল হইত?

গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন। স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলিবার তিনি কে?

রোহিণী তখন চক্ষের জল লুকাইয়া মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। গোবিন্দলাল নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন ভোমরা নাচিতে নাচিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "ভাব্‌ছ কি?"

গো। বল দেখি?

ভ্র। আমার কালো রূপ।

গো। ইঃ—

ভোমরা ঘোরতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল, "সে কি? আমায় ভাব্‌ছ না? আমি ছাড়া, পৃথিবীতে তোমার অন্য চিন্তা আছে?"

গো। আছে না ত কি? সর্ব্বে সর্ব্বময়ী আর কি! আমি অন্য মানুষ ভাব্‌তেছি।

ভ্রমর তখন গোবিন্দলালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুখচুম্বন করিয়া, আদরে গলিয়া গিয়া, আধো আধো, মৃদু মৃদু হাসিমাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য মানুষ —কাকে ভাব্‌ছ বল না?"

গো। কি হবে তোমায় বলিয়া?

ভ্র। বল না!

গো। তুমি রাগ করিবে।

ভ্র। করি কর্‌বো—বল না।

গো। যাও, দেখ গিয়া সকলের খাওয়া হলো কি না।

ভ্র। দেখ্‌ব এখন—বল না কে মানুষ?

গো। সিয়াকুল কাঁটা! রোহিণীকে ভাব্‌ছিলাম।

ভ্র। কেন রোহিণীকে ভাব্‌ছিলে?

গো। তা কি জানি?

ভ্র। জান—বল না।

গো। মানুষ কি মানুষকে ভাবে না?

ভ্র। না। যে যাকে ভালবাসে, সে তাকেই ভাবে, আমি তোমাকে ভাবি—তুমি আমাকে ভাব।

গো। তবে আমি রোহিণীকে ভালবাসি।

ভ্র। মিছে কথা—তুমি আমাকে ভালবাস—আর কাকেও তোমার ভালবাস্‌তে নাই—কেন রোহিণীকে ভাব্‌ছিলে বল না?

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে আছে?

ভ্র। না।

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিণীর মা মাছ খায় কেন?

ভ্র। তার পোড়ার মুখ, যা করতে নাই, তাই করে।

গো। আমারও পোড়ার মুখ, যা করতে নাই, তাই করি। রোহিণীকে ভালবাসি।

ধা করিয়া গোবিন্দলালের গালে ভোমরা এক ঠোনা মারিল। বড় রাগ করিয়া বলিল, "আমি শ্রীমতি ভোমরা দাসী—আমার সাক্ষাতে মিছে কথা?"

গোবিন্দলাল হারি মানিল। ভ্রমরের স্কন্ধে হস্ত আরোপিত করিয়া প্রফুল্ল-নীলোৎপলদলতুল্য মধুরিমাময় তাহার মুখমণ্ডল স্বকরপল্লবে গ্রহণ করিয়া, মৃদু মৃদু অথচ গম্ভীর, কাতরকণ্ঠে গোবিন্দলাল বলিল, "মিছে কথাই ভোমরা। আমি রোহিণীকে ভালবাসি না। রোহিণী আমায় ভালবাসে।"

তীব্র বেগে গোবিন্দলালের হাত হইতে মুখমণ্ডল মুক্ত করিয়া ভোমরা দূরে গিয়া দাঁড়াইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল, "—আবাগী—পোড়ারমুখী—বাঁদরী মরুক! মরুক! মরুক! মরুক! মরুক!"

গোবিন্দলাল হাসিয়া বলিলেন, "এখনই এত গালি কেন? তোমার সাত রাজার ধন এক মাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি।"

ভোমরা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "দূর, তা কেন—তা কি পারে—তা মাগী তোমার সাক্ষাতে বলিল কেন ?"

গো। ঠিক ভোমরা—বলা তাহার উচিত ছিল না—তাই ভাবিতেছিলাম। আমি তাহাকে বাস উঠাইয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম—খরচ পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম।

ভো। তার পর ?

গো। তার পর সে রাজি হইল না।

ভো। ভাল, আমি তাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি ?

গো। পার, কিন্তু আমি পরামর্শটা শুনিব।

ভো। শোন।

এই বলিয়া ভোমরা "ক্ষীরি! ক্ষীরি!" করিয়া এক জন চাকরাণীকে ডাকিল।

তখন ক্ষীরোদা—ওরফে ক্ষীরোদমণি—ওরফে ক্ষীরাব্ধিতনয়া—ওরফে শুধু ক্ষীরি আসিয়া দাঁড়াইল—মোটাসোটা গাটা গোটা—মল পায়ে—গোট পরা—হাসি চাহনিতে ভরা। ভোমরা বলিল, "ক্ষীরি, রোহিণী পোড়ারমুখীর কাছে এখনই একবার যাইতে পার্‌বি ?"

ক্ষীরি বলিল, "পারব না কেন ? কি বলতে হবে ?"

ভোমরা বলিল,—"আমার নাম করিয়া বলিয়া আয় যে, তিনি বল্‌লেন তুমি মর।"

"এই ? যাই।" বলিয়া ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি—মল বাজাইয়া চলিল। গমনকালে ভোমরা বলিয়া দিল, "কি বলে, আমায় বলিয়া যাস্।"

"আচ্ছা।" বলিয়া ক্ষীরোদা গেল। অল্পকালমধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বলিয়া আসয়াছি।"

ভো। সে কি বলিল ?

ক্ষীরি। সে বলিল উপায় বলিয়া দিতে বলিও।

ভো। তবে আবার যা। বলিয়া আয় যে—বারুণী পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা কলসী গলায় দিয়ে—বুঝেছিস ?

ক্ষীরি। আচ্ছা।

ক্ষীরি আবার গেল। আবার আসিল। ভোমরা জিজ্ঞাসা করিল, "বারুণী পুকুরের কথা বলেছিস্ ?"

ক্ষীরি। বলিয়াছি।

ভো। সে কি বলিল ?

ক্ষীরি বলিল যে "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ছি ভোমরা!"

ভোমরা বলিল, "ভাবিও না। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে —সে কি মরিতে পারে?"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দৈনিক কার্য্য সমস্ত সমাপ্ত করিয়া, প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে গোবিন্দলাল দিনান্তে বারুণীর তীরবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যানভ্রমণ একটি প্রধান সুখ। সকল বৃক্ষের তলায় দুই চারি বার বেড়াইতেন। কিন্তু আমরা সকল বৃক্ষের কথা এখন বলিব না। বারুণীর কূলে, উদ্যানমধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা ছিল, বেদিকামধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তর-খোদিত স্ত্রীপ্রতিমূর্ত্তি—স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা, বিনতলোচনা—একটি ঘট হইতে আপন চরণদ্বয়ে যেন জল ঢালিতেছে—তাহার চারি পাশে বেদিকার উপরে উজ্জ্বলবর্ণ রঞ্জিত মৃন্ময় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপুষ্প বৃক্ষ—জিরানিয়ম, ভর্বিনা, ইউফর্বিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ—নীচে, সেই বেদিকা বেষ্টন করিয়া, কামিনী, যূথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন আমোদিত করিতেছে—তাহারই পরে বহুবিধ উজ্জ্বল নীল পীত রক্ত শ্বেত নানাবর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্জনকারী পাতার গাছের শ্রেণী। সেইখানে গোবিন্দলাল বসিতে ভালবাসিতেন। জ্যোৎস্না রাত্রে কখনও কখনও ভ্রমরকে উদ্যানভ্রমণে আনিয়া সেইখানে বসাইতেন। ভ্রমর পাষাণময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধাবৃতা দেখিয়া তাহাকে কালামুখী বলিয়া গালি দিত—কখনও কখনও আপনি অঞ্চল দিয়া তাহার অঙ্গ আবৃত করিয়া দিত—কখনও কখনও গৃহ হইতে উত্তম বস্ত্র সঙ্গে আনিয়া তাহাকে পরাইয়া দিয়া যাইত—কখনও কখনও তাহার হস্তস্থিত ঘট লইয়া টানাটানি বাধাইত।

সেইখানে আজি, গোবিন্দলাল সন্ধ্যাকালে বসিয়া, দর্পণানুরূপ বারুণীর জলশোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, সেই পুষ্করিণীর সুপরিসর প্রস্তরনির্ম্মিত সোপান পরম্পরায় রোহিণী কলসীকক্ষে অবরোহণ করিতেছে। সব না হইলে চলে, জল না হইলে চলে না। এ দুঃখের দিনেও রোহিণী জল লইতে আসিয়াছে। রোহিণী জলে নামিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিবার সম্ভাবনা—দৃষ্টিপথে তাঁহার থাকা অকর্ত্তব্য বলিয়া গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ গোবিন্দলাল এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইলেন। শেষে মনে করিলেন,

এতক্ষণ রোহিণী উঠিয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া আবার সেই বেদিকাতলে জলনিষেকনিরতা পাষাণসুন্দরীর পদপ্রান্তে আসিয়া বসিলেন। আবার সেই বারুণীর শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রোহিণী বা কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ কোথাও কেহ নাই। কেহ কোথাও নাই—কিন্তু সে জলোপরে একটি কলসী ভাসিতেছে।

কার কলসী? হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হইল—কেহ জল লইতে আসিয়া ডুবিয়া যায় নাই ত? রোহিণীই এইমাত্র জল লইতে আসিয়াছিল—তখন অকস্মাৎ পূর্ব্বাহ্নের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, ভ্রমর রোহিণীকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, বারুণী পুকুরে—সন্ধ্যাবেলা—কলসী গলায় বেঁধে। মনে পড়িল যে, রোহিণী প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, "আচ্ছা।"

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ পুষ্করিণীর ঘাটে আসিলেন। সর্ব্বশেষ সোপানে দাঁড়াইয়া পুষ্করিণীর সর্ব্বত্র দেখিতে লাগিলেন। জল কাচ তুল্য স্বচ্ছ। ঘাটের নীচে জলতলস্থ ভূমি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। দেখিলেন স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতলে আলো করিয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া ডুব দিয়া, রোহিণীকে উঠাইয়া সোপান উপরি শায়িত করিলেন। দেখিলেন, রোহিণী জীবিত আছে কি না সন্দেহ; সে সংজ্ঞাহীন; নিশ্বাসপ্রশ্বাসরহিত।

উদ্যান হইতে গোবিন্দলাল একজন মালীকে ডাকিলেন। মালীর সাহায্যে রোহিণীকে বহন করিয়া উদ্যানস্থ প্রমোদগৃহে শুশ্রূষার জন্য লইয়া গেলেন। জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষ গোবিন্দলালের গৃহে প্রবেশ করিল। ভ্রমর ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক কখনও সে উদ্যানগৃহে প্রবেশ করে নাই।

বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্ববান হইয়া প্রজ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশালদীর্ঘবিলম্বিত ঘোরকৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু—তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জলবৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত; কিন্তু সেই মুদ্রিত পক্ষ্মের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণশোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট—স্থির, বিস্তারিত লজ্জাভয়বহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট—গণ্ড এখনও উজ্জ্বল—অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলীপুষ্পের লজ্জাস্থল। গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন, "মরি

মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?" এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল—এ কথা মনে করিয়া তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল।

যদি রোহিণীর জীবন থাকে, রোহিণীকে বাঁচাইতে হইবে। জলমগ্নকে কি প্রকারে বাঁচাইতে হয়, গোবিন্দলাল তাহা জানিতেন। উদরস্থ জল সহজেই বাহির করান যায়। দুই চারি বার রোহিণীকে উঠাইয়া, বসাইয়া, পাশ ফিরাইয়া, ঘুরাইয়া জল উদ্গীর্ণ করাইলেন। কিন্তু তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিল না। সেইটি কঠিন কাজ।

গোবিন্দলাল জানিতেন, মুমূর্ষুর বাহুদ্বয় ধরিয়া উর্দ্ধোত্তোলন করিলে, অন্তরস্থ বায়ুকোষ স্ফীত হয়, সেই সময়ে রোগীর মুখে ফুৎকার দিতে হয়। পরে উত্তোলিত বাহুদ্বয়, ধীরে ধীরে নামাইতে হয়। নামাইলে বায়ুকোষ সঙ্কুচিত হয়; তখন সেই ফুৎকার-প্রেরিত বায়ু আপনিই নির্গত হইয়া আসে। ইহাতে কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত হয়। এইরূপ পুনঃপুনঃ করিতে করিতে বায়ুকোষের কার্য্য স্বতঃ পুনরাগত হইতে থাকে; কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করাইতে করাইতে সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস আপনি উপস্থিত হয়। রোহিণীকে তাই করিতে হইবে। দুই হাতে দুইটি বাহু তুলিয়া ধরিয়া তাহার মুখে ফুৎকার দিতে হইবে, তাহার সেই পক্কবিম্ববিনিন্দিত, এখনও সুধাপরিপূর্ণ, মদনমদোন্মাদহলাহলকলসীতুল্য রাঙ্গা রাঙ্গা মধুর অধরে অধর দিয়া ফুৎকার দিতে হইবে! কি সর্ব্বনাশ! কে দিবে?

গোবিন্দলালের এক সহায়, উড়িয়া মালী। বাগানের অন্য চাকরেরা ইতিপূর্ব্বেই গৃহে গিয়াছিল। তিনি মালীকে বলিলেন, "আমি ইহার হাত দুইটি ধরি, তুই ইহার মুখে ফুঁ দে দেখি!"

মুখে ফুঁ! সর্ব্বনাশ! ঐ রাঙ্গা রাঙ্গা সুধামাখা অধরে, মালীর মুখের ফুঁ—"সেহে পারিব না মুনিমা!"

মালীকে মুনিব যদি শালগ্রামশিলা চর্ব্বণ করিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে করিলে করিতে পারিত, কিন্তু সেই চাঁদমুখের রাঙ্গা অধরে—সেই কট্‌কি মুখের ফুঁ! মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল। স্পষ্ট বলিল, "মু সে পারিবি না অবধড়।"

মালী ঠিক বলিয়াছিল। মালী সেই দেবদুর্ল্লভ ওষ্ঠাধরে যদি একবার মুখ দিয়া ফুঁ দিত, তার পর যদি রোহিণী বাঁচিয়া উঠিয়া আবার সেই ঠোঁট ফুলাইয়া কলসীকক্ষে জল লইয়া, মালীর পানে চাহিয়া, ঘরে যাইত—তবে আর তাহাকে ফুলবাগানের কাজ করিতে হইত না। সে খোন্তা, খুরপো, নিড়িন, কাঁচি,

কোদালি, বারুণীর জলে ফেলিয়া দিয়া, এক দৌড়ে ভদরক পানে ছুটিত সন্দেহ নাই—বোধ হয় সুবর্ণরেখার নীল জলে ডুবিয়া মরিত। মালী অত ভাবিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু মালী ফুঁ দিতে রাজী হইল না।

অগত্যা গোবিন্দলাল তাহাকে বলিলেন, "তবে তুই এইরূপ ইহার হাত দুইটি ধীরে ধীরে উঠাইতে থাক্—আমি ফুঁ দিই। তাহার পর ধীরে ধীরে হাত নামাইবি।" মালী তাহা স্বীকার করিল। সে হাত দুইটি ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠাইল—গোবিন্দলাল তখন সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া—রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন।

সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া, একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।

মালী রোহিণীর বাহুদ্বয় নামাইল। আবার উঠাইল। আবার গোবিন্দলাল ফুৎকার দিলেন। আবার সেইরূপ হইল। আবার সেইরূপ পুনঃপুনঃ করিতে লাগিলেন। দুই তিন ঘণ্টা এইরূপ করিলেন। রোহিণীর নিশ্বাস বহিল। রোহিণী বাঁচিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রোহিণীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল, গোবিন্দলাল তাহাকে ঔষধ পান করাইলেন। ঔষধ বলকারক—ক্রমে রোহিণীর বলসঞ্চার হইতে লাগিল। রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সজ্জিত রম্য গৃহমধ্যে মন্দ মন্দ শীতল পবন বাতায়নপথে পরিভ্রমণ করিতেছে—একদিকে স্ফটিকাধারে স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বলিতেছে—আর একদিকে হৃদয়াধারের জীবনপ্রদীপ জ্বলিতেছে। এদিকে রোহিণী, গোবিন্দলাল-হস্ত-প্রদত্ত মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করিয়া, মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল—আর একদিকে তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী কথা শ্রবণপথে পান করিয়া মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল। প্রথমে নিশ্বাস, পরে চৈতন্য, পরে দৃষ্টি, পরে স্মৃতি, শেষে বাক্য স্ফুরিত হইতে লাগিল।

রোহিণী বলিল, "আমি মরিয়াছিলাম, আমাকে কে বাঁচাইল?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "যেই বাঁচাক, তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ এই যথেষ্ট।"

রোহিণী বলিল, "আমাকে কেন বাঁচাইলেন? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি শত্রুতা যে মরণেও আপনি প্রতিবাদী?"

গো। তুমি মরিবে কেন?

রো। মরিবারও কি আমার অধিকার নাই?

গো। পাপে কাহারও অধিকার নাই। আত্মহত্যা পাপ।

রো। আমি পাপ পুণ্য জানি না—আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি পাপ পুণ্য মানি না—কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে? আমি মরিব। এবার না হয়, তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম বলিয়া তুমি রক্ষা করিয়াছ। ফিরে বার, যাহাতে তোমার চক্ষে না পড়ি, সে যত্ন করিব।

গোবিন্দলাল বড় কাতর হইলেন, বলিলেন, "তুমি কেন মরিবে?"

"চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা একেবারে মরা ভাল।"

গো। কিসের এত যন্ত্রণা?

রো। রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।

গোবিন্দলাল তখন বলিলেন যে, "আর এ সব কথায় কাজ নাই—চল তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।"

রোহিণী বলিল, "না, আমি একাই যাইব।"

গোবিন্দলাল বুঝিলেন, আপত্তিটা কি। গোবিন্দলাল আর কিছু বলিলেন না। রোহিণী একাই গেল।

তখন গোবিন্দলাল, সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, "হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!—তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইব?—আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, "আজি এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে ছিলে কেন?"

গো। কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আর কখনও কি থাকি না?

ভ্র। থাক—কিন্তু আজি তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার কথার আওয়াজে বোধ হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে।

গো। কি হইয়াছে?

ভ্র। কি হইয়াছে, তাহা তুমি না বলিলে আমি কি প্রকারে বলিব? আমি কি সেখানে ছিলাম?

গো। কেন, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পার না?

ভ্র। তামাসা রাখ। কথাটা ভাল কথা নহে, সেটা মুখ দেখিয়া বলিতে পারিতেছি।—আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হইতেছে।

বলিতে বলিতে ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গোবিন্দলাল, ভ্রমরের চক্ষের জল মুছাইয়া, আদর করিয়া বলিলেন, "আর একদিন বলিব ভ্রমর—আজ নহে।"

ভ্র। আজ নহে কেন?

গো। তুমি এখন বালিকা, সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই।

ভ্র। কাল কি আমি বুড়া হইব?

গো। কালও বলিব না—দুই বৎসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা করিও না, ভ্রমর।

ভ্রমর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। বলিল, "তবে তাই—দুই বৎসর পরেই বলিও—আমার শুনিবার বড় সাধ ছিল—কিন্তু তুমি যদি বলিলে না—তবে আমি শুনিব কি প্রকারে? আমার বড় মন কেমন কেমন করিতেছে।"

কেমন একটা বড় ভারি দুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়া উঠিতে লাগিল। যেমন বসন্তের আকাশ—বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জ্বল—কোথাও কিছু নাই—অকস্মাৎ একখানা মেঘ উঠিয়া চারি দিক্ আঁধার করিয়া ফেলে—ভোমরার বোধ হইল, যেন তার বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ উঠিয়া, সহসা চারিদিক্ আঁধার করিয়া ফেলিল। ভ্রমরের চক্ষে জল আসিতে লাগিল। ভ্রমর মনে করিল, আমি অকারণে কাঁদিতেছি—আমি বড় দুষ্ট হইয়াছি—আমার স্বামী রাগ করিবেন। অতএব ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে, বাহির হইয়া গিয়া, কোণে বসিয়া পা ছড়াইয়া অন্নদামঙ্গল পড়িতে বসিল। কি মাথা মুণ্ডু পড়িল তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু বুকের ভিতর হইতে সে কালো মেঘখানা কিছুতেই নামিল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দলালবাবু জ্যেঠা মহাশয়ের সঙ্গে বৈষয়িক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। কথোপকথনচ্ছলে কোন্ জমীদারির কিরূপ অবস্থা, তাহা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের বিষয়ানুরাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

"তোমারা যদি একটু একটু দেখ শুন, তবে বড় ভাল হয়। দেখ, আমি আর কয় দিন? তোমরা এখন হইতে সব দেখিয়া শুনিয়া না রাখিলে, আমি মরিলে কিছু বুঝিতে পারিবে না। দেখ, আমি বুড়া হইয়াছি, আর কোথাও যাইতে পারি না। কিন্তু বিনা তদারকে মহাল সব খারাপ হইয়া উঠিল।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "আপনি পাঠাইলে আমি যাইতে পারি। আমারও ইচ্ছা, সকল মহালগুলি এক একবার দেখিয়া আসি।"

কৃষ্ণকান্ত আহ্লাদিত হইলেন। বলিলেন, "আমার তাহাতে বড় আহ্লাদ। আপাততঃ বন্দরখালিতে কিছু গোলমাল উপস্থিত। নায়েব বলিতেছে যে, প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে, টাকা দেয় না; প্রজারা বলে আমরা খাজনা দিতেছি, নায়েব উসুল দেয় না। তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে বল, আমি তোমাকে সেখানে পাঠাইবার উদ্যোগ করি।"

গোবিন্দলাল সম্মত হইলেন। তিনি এই জন্যই কৃষ্ণকান্তের কাছে আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই পূর্ণ যৌবন, মনোবৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গতুল্য প্রবল, রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র। ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদিত হইল—প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চলা ময়ূরীর মত গোবিন্দলালের মন, রোহিণীর রূপ দেখিয়া নাচিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়া মনে মনে শপথ করিয়া, স্থির করিলেন, মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিষয়কর্ম্মে মনোভিনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিব—স্থানান্তরে গেলে, নিশ্চিত ভুলিতে পারিব। এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া তিনি পিতৃব্যের কাছে গিয়া বিষয়ালোচনা করিতে বসিয়াছিলেন। বন্দরখালির কথা শুনিয়া, আগ্রহসহকারে তথায় গমনে সম্মত হইলেন।

ভ্রমর শুনিল, মেজবাবু দেহাত যাইবেন। ভ্রমর ধরিল, আমিও যাইব। কাঁদাকাঁটি, হাঁটাহাঁটি পড়িয়া গেল। কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না। তরণী সজ্জিত করিয়া ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমরের মুখচুম্বন করিয়া, গোবিন্দলাল দশ দিনের পথ বন্দরখালি যাত্রা করিলেন।

ভ্রমর আগে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিল। তার পর উঠিয়া, অন্নদামঙ্গল ছিঁড়িয়া ফেলিল, খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল, পুতুল সকল জলে ফেলিয়া দিল, টবের ফুলগাছ সকল কাটিয়া ফেলিল, আহারের অন্ন পাচিকার গায়ে ছড়াইয়া দিল, চাকরাণীর খোঁপা ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিল—ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল—এইরূপ

নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া, শয়ন করিল। শুইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে অনুকূল পবনে চালিত হইয়া, গোবিন্দলালের তরণী তরঙ্গিণী-তরঙ্গ বিভিন্ন করিয়া চলিল।

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

কিছু ভাল লাগে না—ভ্রমর একা। ভ্রমর শয্যা তুলিয়া ফেলিল—বড় নরম,—খাটের পাখা খুলিয়া ফেলিল—বাতাস বড় গরম; চাকরাণীদিগকে ফুল আনিতে বারণ করিল—ফুলে বড় পোকা। তাসখেলা বন্ধ করিল—সহচরীগণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, তাস খেলিলে শাশুড়ী রাগ করেন। সূচ, সূতা, উল, পেটার্ণ—সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বিলাইয়া দিল—জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, বড় চোখ জ্বালা করে। বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, ধোপাকে গালি পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে গৃহ পরিপূর্ণ। মাথায় চুলের সঙ্গে চিরুণীর সম্পর্ক রহিত হইয়া অসিয়াছিল—উলুবনের খড়ের মত চুল বাতাসে দুলিত, জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রমর হাসিয়া, চুলগুলি হাত দিয়া টানিয়া খোঁপায় গুঁজিত—ঐ পর্য্যন্ত। আহারাদির সময় ভ্রমর নিত্য বাহানা করিতে আরম্ভ করিল—"আমি খাইব না, আমার জ্বর হইয়াছে।" শাশুড়ী কবিরাজ দেখাইয়া, পাঁচন ও বড়ির ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন যে, "বৌমাকে ঔষধগুলি খাওয়াইবি।" বৌমা ক্ষীরির হাত হইতে বড়ি পাঁচন কাড়িয়া লইয়া, জানেলা গলাইয়া ফেলিয়া দিল।

ক্রমে ক্রমে এতটা বাড়াবাড়ি ক্ষীরি চাকরাণীর চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্ষীরি বলিল, "ভাল, বউ ঠাকুরাণি, কার জন্য তুমি অমন কর?—যাঁর জন্য তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলে, তিনি কি তোমার কথা এক দিনের জন্য ভাবেন? তুমি মরতেছ কেঁদে কেটে, আর তিনি হয়ত হুঁকার নল মুখে দিয়া, চক্ষু বুঁজিয়া রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন।"

ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস্ করিয়া এক চড় মারিল। ভ্রমরের হাত বিলক্ষণ চলিত। প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "তুই যা ইচ্ছা তাই বকিবি ত আমার কাছ থেকে উঠিয়া যা।"

ক্ষীরি বলিল, "তা চড় চাপড় মারিলেই কি লোকের মুখ চাপা থাকিবে? তুমি রাগ করিবে বলিয়া আমরা ভয়ে কিছু বলিব না। কিন্তু না বলিলেও বাঁচি না। পাচি চাঁড়ালনীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি,—সেদিন অত রাত্রে রোহিণী, বাবুর বাগান হইতে আসিতেছিল কি না?"

ক্ষীরোদার কপাল মন্দ, তাই এমন কথা সকাল বেলা ভ্রমরের কাছে বলিল।

ভ্রমর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষীরোদাকে চড়ের উপর চড় মারিল, কিলের উপর কিল মারিল, তাহাকে ঠেলা মারিয়া ফেলিয়া দিল, তাহার চুল ধরিয়া টানিল। শেষে আপনি কাঁদিতে লাগিল।

ক্ষীরোদা, মধ্যে মধ্যে ভ্রমরের কাছে চড়টা চাপড়টা খাইত, কখনও রাগ করিত না; কিন্তু আজি কিছু বাড়াবাড়ি, আজ একটু রাগিল। বলিল, "তা ঠাকুরুণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে—তোমারই জন্য আমরা বলি। তোমাদের কথা লইয়া লোকে একটা হৈ হৈ করে, আমরা তা সইতে পারি না। তা আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তুমি পাঁচিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর।"

ভ্রমর, ক্রোধে দুঃখে কাদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তোর জিজ্ঞাসা করিতে হয় তুই কর্‌গে—আমি কি তোদের মত ছুঁচো পাজি যে, আমার স্বামীর কথা পাঁচি চাঁড়ালনীকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? তুই এত বড় কথা আমাকে বলিস্! ঠাকুরাণীকে বলিয়া আমি ঝাঁটা মেরে তোকে দূর করিয়া দিব। তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা।"

তখন সকাল বেলা উত্তম মধ্যম ভোজন করিয়া ক্ষীরোদা ওরফে ক্ষীরি চাকরাণী রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এ দিকে ভ্রমর ঊর্দ্ধমুখে সজলনয়নে, যুক্তকরে, মনে মনে গোবিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, হে গুরো! শিক্ষক, ধর্ম্মজ্ঞ, আমার একমাত্র সত্যস্বরূপ! তুমি কি সে দিন এই কথা আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে!"

তার মনের ভিতর যে মন, হৃদয়ে যে লুক্কায়িত স্থান কেহ কখনও দেখিতে পায় না—যেখানে আত্মপ্রতারণা নাই, সেখানে পর্য্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই। অবিশ্বাস হয় না। ভ্রমর কেবল একবার মাত্র মনে ভাবিলেন যে, "তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এমন দুঃখ কি? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে।" হিন্দুর মেয়ে, মরা বড় সহজ মনে করে।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এখন ক্ষীরি চাকরাণী মনে করিল যে, এ বড় কলিকাল—এক রত্তি মেয়েটা, আমার কথায় বিশ্বাস করে না। ক্ষীরোদার সরল অন্তঃকরণে ভ্রমরের উপর রাগ দ্বেষাদি কিছুই নাই, সে ভ্রমরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বটে, তাহার অমঙ্গল চাহে না। তবে ভ্রমর যে তাহার ঠকামি কাণে তুলিল না, সেটা অসহ্য। ক্ষীরোদা তখন, সুচিক্কণ দেহযষ্টি সংক্ষেপে তৈলনিষিক্ত করিয়া, রঙ্গ করা গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া, কলসীকক্ষে, বারুণীর ঘাটে স্নান করিতে চলিল।

হরমণি ঠাকুরাণী, বাবুদের বাড়ীর একজন পাঁচিকা, সেই সময় বারুণীর ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিতেছিল, প্রথমে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হরমণিকে দেখিয়া ক্ষীরোদা আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "বলে, যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর—আর বড়লোকের কাজ করা হল না—কখন কার মেজাজ কেমন থাকে, তার ঠিকানাই নাই।"

হরমণি একটু কোন্দলের গন্ধ পাইয়া, দাহিন হাতের কাচা কাপড়খানি বাঁ হাতে রাখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "কি লো ক্ষীরোদা—আবার কি হয়েছে?"

ক্ষীরোদা তখন মনের বোঝা নামাইল। বলিল, "দেখ দেখি গা—পাড়ার কালামুখীরা বাবুর বাগানে বেড়াইতে যাবে—তা আমরা চাকর বাকর—আমরা কি তা মুনিবের কাছে বলিতে পারি না।"

হর। সে কি লো? পাড়ার মেয়ে আবার বাবুর বাগানে বেড়াইতে কে গেল?

ক্ষী। আর কে যায়? সেই কালামুখী রোহিণী।

হর। কি পোড়া কপাল! রোহিণীর আবার এমন দশা কত দিন? কোন্ বাবুর বাগানে রে ক্ষীরোদা?

ক্ষীরোদা মেজ বাবুর নাম করিল। তখন দুই জনে একটু চাওয়াচাওয়ি করিয়া, একটু রসের হাসি হাসিয়া, যে যেদিকে যাইবার, সে সেই দিকে গেল। কিছু দূর গিয়াই ক্ষীরোদার সঙ্গে পাড়ার রামের মার দেখা হইল। ক্ষীরোদা তাহাকেও হাসির ফাঁদে ধরিয়া ফেলিয়া, দাঁড় করাইয়া রোহিণীর দৌরাত্ম্যের কথার পরিচয় দিল। আবার দুজনে হাসি চাহনি ফেরাফেরি করিয়া অভীষ্ট পথে গেল।

এইরূপে ক্ষীরোদা, পথে রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারী, পারী যাহার দেখা পাইল, তাহারই কাছে আপন মর্ম্মপীড়ার পরিচয় দিয়া, পরিশেষে সুস্থশরীরে প্রফুল্লহৃদয়ে বারুণীর স্ফটিক বারিরাশিমধ্যে অবগাহন করিল। এ দিকে হরমণি, রামের মা, শ্যামের মা, হারী, তারী, পারী যাহাকে যেখানে দেখিল, তাহাকে সেইখানে ধরিয়া শুনাইয়া দিল যে, রোহিণী হতভাগিনী মেজবাবুর বাগান বেড়াইতে গিয়াছিল। একে শূন্য দশ হইল, দশে শূন্য শত হইল, শতে শূন্য সহস্র হইল। যে সূর্য্যের নবীন কিরণ তেজস্বী না হইতে হইতেই, ক্ষীরি প্রথম ভ্রমরের সাক্ষাতে রোহিণীর কথা পাড়িয়াছিল, তাঁহার অস্তগমনের পূর্ব্বেই গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল যে, রোহিণী গোবিন্দলালের অনুগৃহীতা। কেবল বাগানের কথা হইতে অপরিমেয় প্রণয়ের কথা, অপরিমেয় প্রণয়ের কথা হইতে অপরিমেয় অলঙ্কারের কথা, আর কত কথা উঠিল, তাহা আমি—হে রটনাকৌশলময়ী কলঙ্ককলিতকণ্ঠা

কুলকামিনীগণ! তাহা আমি অধম সত্যশাসিত পুরুষ লেখক আপনাদিগের কাছে সবিস্তারে বলিয়া বাড়াবাড়ি করিতে চাহি না।

ক্রমে ভ্রমরের কাছে সংবাদ আসিতে লাগিল। প্রথমে বিনোদিনী আসিয়া বলিল, "সত্যি কি লা? ভ্রমর, একটু শুষ্ক মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুকে বলিল, "কি সং ঠাকুরঝি?" ঠাকুরঝি তখন ফুলধনুর মত দুইখানি ভ্রূ একটু জড়সড় করিয়া অপাঙ্গে একটু বৈদ্যুতী প্রেরণ করিয়া ছেলেটিকে কোলে টানিয়া বসাইয়া, বলিল "বলি, রোহিণীর কথাটা?"

ভ্রমর, বিনোদিনীকে কিছু না বলিতে পারিয়া, তাহার ছেলেটিকে টানিয়া লইয়া, কোন বালিকাসুলভ কৌশলে, তাহাকে কাঁদাইল। বিনোদিনী বালককে স্তন্যপান করাইতে করাইতে স্বস্থানে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর পর সুরধুনী আসিয়া বলিলেন, "বলি মেজ বৌ, বলি বলেছিলুম মেজবাবুকে অষুধ কর। তুমি হাজার হোক গৌরবর্ণ নও, পুরুষ মানুষের মন ত কেবল কথায় পাওয়া যায় না, একটু রূপ গুণ চাই। তা ভাই, রোহিণীর কি আক্কেল কে জানে?"

ভ্রমর বলিল, "রোহিণীর আবার আক্কেল কি?"

সুরধুনী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "পোড়া কপাল! এত লোক শুনিয়াছে—কেবল তুই শুনিস্ নাই? মেজ বাবু যে রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছে।"

ভ্রমর হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া মনে মনে সুরধুনীকে যমের হাতে সমর্পণ করিল। প্রকাশ্যে একটা পুত্তলের মুণ্ড মোচড় দিয়া ভাঙ্গিয়া সুরধুনীকে বলিল, "তা আমি জানি। খাতা দেখিয়াছি। তোর নামে চৌদ্দ হাজার টাকার গহনা লেখা আছে।"

বিনোদিনী সুরধুনীর পর, রামী, বামী, শ্যামী, কামিনী, রমণী, শারদা, প্রমদা, সুখদা, বরদা, কমলা, বিমলা, শীতলা, নির্ম্মলা, মাধু, নিধু, বিধু, তারিণী, নিস্তারিণী, দীনতারিণী, ভবতারিণী, সুরবালা, গিরিবালা, ব্রজবালা শৈলবালা প্রভৃতি অনেকে আসিয়া, একে একে, দুইয়ে দুইয়ে, তিনে তিনে, দুঃখিনী বিরহকাতরা বালিকাকে জানাইল যে, তোমার স্বামী রোহিণীর প্রণয়াসক্ত। কেহ যুবতী, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ বর্ষীয়সী, কেহ বা বালিকা, সকলেই আসিয়া ভ্রমরকে বলিল, "আশ্চর্য্য কি? মেজ বাবুর রূপ দেখে কে না ভোলে? রোহিণীর রূপ দেখে তিনিই না ভুলিবেন কেন?" কেহ আদর করিয়া, কেহ চিড়াইয়া, কেহ রসে, কেহ রাগে, কেহ সুখে, কেহ দুঃখে, কেহ হেসে, কেহ কেঁদে, ভ্রমরকে জানাইল যে, ভ্রমর তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

গ্রামের মধ্যে ভ্রমর সুখী ছিল। তাহার সুখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় মরিত —কালো কুৎসিতের এত সুখ—অনন্ত ঐশ্বর্য্য—দেবীদুর্ল্লভ স্বামী—লোকে কলঙ্ক-শূন্য যশ—অপরাজিতাতে পদ্মের আদর? আবার তার উপর মল্লিকার সৌরভ? গ্রামের লোকের এত সহিত না। তাই, পালে পালে, দলে দলে, কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া, কেহ কবরী বাঁধিয়া, কেহ কবরী বাঁধিতে বাঁধিতে, কেহ এলোচুলে সংবাদ দিতে আসিলেন, "ভ্রমর তোমার সুখ গিয়াছে।"—কাহারও মনে হইল না যে, ভ্রমর পতিবিরহবিধুরা, নিতান্ত দোষশূন্যা, দুঃখিনী বালিকা।

ভ্রমর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া, ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, "হে সন্দেহভঞ্জন! হে প্রাণাধিক! তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য না হইলে, সকলে বলিবে কেন। তুমি এখানে নাই, আজি আমার সন্দেহভঞ্জন কে করিবে? আমার সন্দেহভঞ্জন হইল না—তবে মরি না কেন? এ সন্দেহ লইয়া কি বাঁচা যায়? আমি মরি না কেন? ফিরিয়া আসিয়া প্রাণেশ্বর! আমায় গালি দিও না যে, ভোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে।"

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এখন, ভ্রমরেরও যে জ্বালা, রোহিণীরও সেই জ্বালা। কথা যদি রটিল, রোহিণীর কাণেই বা না উঠিবে কেন? রোহিণী শুনিল, গ্রামে রাষ্ট্র যে, গোবিন্দলাল তাহার গোলাম—সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। কথা যে কোথা হইতে রটিল, তাহা রোহিণী শুনে নাই—কে রটাইল, তাহার কোন তদন্ত করে নাই; একেবারে সিদ্ধান্ত করিল যে, তবে ভ্রমর রটাইয়াছে, নহিলে এত গায়ের জ্বালা কার? রোহিণী ভাবিল—ভ্রমর আমাকে বড় জ্বালাইল। সে দিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ। এ দেশে আর আমি থাকিব না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।

রোহিণী না পারে এমন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্ব্বপরিচয়ে জানা গিয়াছে। রোহিণী কোন প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানি বানারসী শাড়ী ও এক সুট গিল্‌টির গহনা চাহিয়া আনিল। সন্ধ্যা হইলে, সেইগুলি পুঁটুলি বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া রায়দিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যথায় ভ্রমর একাকিনী মৃৎশয্যায় শয়ন করিয়া, এক একবার কাঁদিতেছে, এক একবার চক্ষের

জল মুছিয়া কড়ি পানে চাহিয়া ভাবিতেছে, তথায় রোহিণী গিয়া পুঁটুলি রাখিয়া উপবেশন করিল। ভ্রমর বিস্মিত হইল—রোহিণীকে দেখিয়া বিষের জ্বালায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সহিতে না পারিয়া ভ্রমর বলিল, "তুমি সেদিন রাত্রে ঠাকুরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছিলে? আজ রাত্রে কি আমার ঘরে সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছ না কি?"

রোহিণী মনে মনে বলিল যে, তোমার মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি। প্রকাশ্যে বলিল, "এখন আর আমার চুরির প্রয়োজন নাই; আমি আর টাকার কাঙ্গাল নহি। মেজ বাবুর অনুগ্রহে, আমার আর খাইবার পরিবার দুঃখ নাই। তবে লোকে যতটা বলে, ততটা নহে।"

ভ্রমর বলিল, "তুমি এখান হইতে দূর হও।"

রোহিণী সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিতে লাগিল, "লোকে যতটা বলে, ততটা নহে। লোকে বলে, আমি সাত হাজার টাকার গহনা পাইয়াছি। মোট তিন হাজার টাকার গহনা, আর এই সাড়ীখানি পাইয়াছি। তাই তোমায় দেখাইতে আসিয়াছি। সাত হাজার টাকা লোকে বলে কেন?"

এই বলিয়া রোহিণী পুঁটুলি খুলিয়া বানারসী সাড়ী ও গিল্‌টির গহনাগুলি ভ্রমরকে দেখাইল। ভ্রমর লাথি মারিয়া অলঙ্কারগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া দিল।

রোহিণী বলিল, "সোনায় পা দিতে নাই।" এই বলিয়া রোহিণী নিঃশব্দে গিল্‌টির অলঙ্কারগুলি একে একে কুড়াইয়া, আবার পুঁটুলি বাঁধিল। পুঁটুলি বাঁধিয়া, নিঃশব্দে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমাদের বড় দুঃখ রহিল। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে টিপিয়া দিয়াছিল, কিন্তু রোহিণীকে একটি কিলও মারিল না, এই আমাদের আন্তরিক দুঃখ। আমাদের পাঠিকারা উপস্থিত থাকিলে রোহিণীকে যে স্বহস্তে প্রহার করিতেন, তদ্‌বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় নাই। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই, একথা মানি। কিন্তু রাক্ষসী বা পিশাচীর গায়ে যে হাত তুলিতে নাই, এ কথা তত মানি না। তবে ভ্রমর যে রোহিণীকে কেন মারিল না, তাহা বুঝাইতে পারি। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে ভালবাসিত, সেইজন্য তাহাকে মারপিট করিয়াছিল। রোহিণীকে ভালবাসিত না, এজন্য হাত উঠিল না। ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া করিলে জননী আপনার ছেলেটিকে মারে, পরের ছেলেটিকে মারে না।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রি প্রভাত না হইতেই ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লেখাপড়া

গোবিন্দলাল শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমর লেখাপড়ায় তত মজবুত হইয়া উঠে নাই। ফুলটি পুতুলটি পাখীটি স্বামীটিতে ভ্রমরের মন, লেখাপড়া বা গৃহকর্ম্মে তত নহে। কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলে, একবার মুছিত, একবার কাটিত, একবার কাগজ বদলাইয়া আবার মুছিত, আবার কাটিত। শেষে ফেলিয়া রাখিত। দুই তিন দিনে একখানা পত্র শেষ হইত না, কিন্তু আজ সে সকল কিছু হইল না। তেড়া বাঁকা ছাঁদে, যাহা লেখনীর অগ্রে বাহির হইল, আজ তাহাই ভ্রমরের মঞ্জুর। "ম"গুলা, "স"র মত হইল—"স" গুলা "ম"র মত হইল—"ধ"গুলা "ফ"র মত, "ফ"গুলা "থ"র মত, "থ"গুলা "খ"র মত, ইকার স্থানে আকার—আকারের একেবারে লোপ, যুক্ত অক্ষরের স্থানে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর, কোন কোন অক্ষরের লোপ,—ভ্রমর কিছু মানিল না। ভ্রমর আজি এক ঘণ্টার মধ্যে এক দীর্ঘ পত্র স্বামীকে লিখিয়া ফেলিল। কাটাকুটি যে ছিল না, এমত নহে। আমরা পত্রখানির কিছু পরিচয় দিতেছি।

ভ্রমর লিখিতেছে—

"সেবিকা শ্রী ভোমরা" (তার পর ভোমরা কাটিয়া ভ্রমরা করিল) "দাস্যা" (আগে দাম্মা, তাহা কাটিয়া দাস্য—তাহা কাটিয়া দাস্যো—দাস্যাঃ ঘটিয়া উঠে নাই) "প্রণামঃ" ("প্র" লিখিতে প্রথমে "প্র", তার পর "প্র", শেষে "প্র") "নিবেদনঞ্চ" (প্রথম নিবেদঞ্চ, তার পর নিবেদনঞ্চ) "বিশেষ" (বিশেষঃ হইয়া উঠে নাই)।

এইরূপ পত্র লেখার প্রণালী। যাহা লিখিয়াছিল, তাহার বর্ণগুলি শুদ্ধ করিয়া, ভাষা একটুকু সংশোধন করিয়া নিম্নে লিখিতেছি।

"সে দিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরি হইয়াছিল, তাহা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলে না। দুই বৎসর পরে বলিবে বলিয়াছিলে, কিন্তু আমি কপালের দোষে আগেই তাহা শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিয়াছি। তুমি রোহিণীকে যে বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছ, তাহা সে স্বয়ং আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে।

তুমি মনে জান বোধ হয় যে, তোমার প্রতি আমার ভক্তি অচলা—তোমার উপর আমার বিশ্বাস অনন্ত। আমিও তাহা জানিতাম। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, তাহা নহে। যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমারও ভক্তি; যত দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব।"

গোবিন্দলাল যথাকালে সেই পত্র পাইলেন। তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল।

কেবল হস্তাক্ষরে এবং বর্ণাশুদ্ধির প্রণালী দেখিয়াই তিনি বিশ্বাস করিলেন যে, এ ভ্রমরের লেখা। তথাপি মনে অনেক বার সন্দেহ করিলেন—ভ্রমর তাঁহাকে এমন পত্র লিখিতে পারে, তাহা তিনি কখনও বিশ্বাস করেন নাই।

সেই ডাকে আরও কয়খানি পত্র আসিয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমেই ভ্রমরের পত্র খুলিয়াছিলেন; পড়িয়া স্তম্ভিতের ন্যায় অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন; তার পর সে পত্রগুলি অন্যমনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের একখানি পত্র পাইলেন। কবিতাপ্রিয় ব্রহ্মানন্দ লিখিতেছেন—

"ভাই হে! রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলু খড়ের প্রাণ যায়। তোমার উপর বৌমা সকল দৌরাত্ম্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা দুঃখী প্রাণী, আমাদিগের উপর এ দৌরাত্ম্য কেন? তিনি রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও কত কদর্য্য কথা রটিয়াছে, তাহা তোমাকে লিখিতে লজ্জা করে—যাহা হোক,—তোমার কাছে আমার নালিশ,—তুমি ইহার বিহিত করিবে। নহিলে আমি এখানকার বাস উঠাইব। ইতি।"

গোবিন্দলাল আবার বিস্মিত হইলেন। ভ্রমর রটাইয়াছে? মর্ম্ম কিছুই না বুঝিতে পারিয়া গোবিন্দলাল সেই দিন আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, এখানকার জলবায়ু আমার সহ্য হইতেছে না।—আমি কালই বাটী যাইব। নৌকা প্রস্তুত কর।

পরদিন নৌকারোহণে, বিষণ্নমনে গোবিন্দলাল গৃহে যাত্রা করিলেন।

চতুর্ব্বিংশত্তিতম পরিচ্ছেদ

যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে, তবে সূতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও। অদর্শনে কত বিষময় ফল ফলে। যাহাকে বিদায় দিবার সময়ে কত কাঁদিয়াছ, মনে করিয়াছ বুঝি তাহাকে ছাড়িয়া দিন কাটিবে না,—কয় বৎসর পরে তাহার সহিত আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছ—"ভাল আছ ত?" হয়ত সে কথাও হয় নাই—কথাই হয় নাই—আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয়ত রাগে, অভিমানে আর দেখাই হয় নাই। তত নাই হউক, একবার চক্ষের বাহির হইলেই যা ছিল তা আর হয় না। যা যায়, তা আর আসে না। যা ভাঙ্গে, আর তা গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ?

ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশ যাইতে দিয়া ভাল করেন নাই। এ সময়ে দুই জনে একত্রে থাকিলে, এ মনের মালিন্য বুঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল

কথা প্রকাশ পাইত। ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে এই সর্ব্বনাশ হইত না।

গোবিন্দলাল স্বদেশে যাত্রা করিলে, নায়েব কৃষ্ণকান্তের নিকট এক এত্তেলা পাঠাইল যে, মধ্যম বাবু অদ্য প্রাতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সে পত্র ডাকে আসিল। নৌকার অপেক্ষা ডাক আগে আসে। গোবিন্দলাল স্বদেশে পৌঁছিবার চারি পাঁচ দিন আগে, কৃষ্ণকান্তের নিকট নায়েবের পত্র পৌঁছিল। ভ্রমর শুনিলেন, স্বামী আসিতেছেন। ভ্রমর তখনই আবার পত্র লিখিতে বসিলেন। খান চারি পাঁচ কাগজ কালিতে পুরাইয়া, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, ঘণ্টা দুই চারি মধ্যে একখানা পত্র লিখিয়া খাড়া করিলেন। এ পত্রে মাতাকে লিখিলেন যে, "আমার বড় পীড়া হইয়াছে। তোমরা যদি একবার আমাকে লইয়া যাও, তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি। বিলম্ব করিও না, পীড়া বৃদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে না। পার যদি, কালই লোক পাঠাইও। এখানে পীড়ার কথা বলিও না।" এই পত্র লিখিয়া গোপনে ক্ষীরি চাকরাণীর দ্বারা লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর তাহা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল।

যদি মা না হইয়া, আর কেহ হইত, তবে ভ্রমরের পত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিত যে, ইহার ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে। কিন্তু মা, সন্তানের পীড়ার কথা শুনিয়া একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশে ভ্রমরের শাশুড়ীকে এক লক্ষ গালি দিয়া স্বামীকে কিছু গালি দিলেন, এবং কাঁদিয়া কাটিয়া স্থির করিলেন যে, আগামী কল্য বেহারা পাল্কী লইয়া চাকর চাকরাণী ভ্রমরকে আনিতে যাইবে। ভ্রমরের পিতা কৃষ্ণকান্তকে পত্র লিখিলেন। কৌশল করিয়া, ভ্রমরের পীড়ার কোন কথা না লিখিয়া, লিখিলেন যে, "ভ্রমরের মাতা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছেন—ভ্রমরকে একবার দেখিতে পাঠাইয়া দিবেন।" দাস দাসীদিগকে সেই মত শিক্ষা দিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বড় বিপদে পড়িলেন। এ দিকে গোবিন্দলাল আসিতেছে, এ সময়ে ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠান অকর্ত্তব্য। ও দিকে ভ্রমরের মাতা পীড়িতা, না পাঠাইলেও নয়। সাত পাঁচ ভাবিয়া, চারি দিনের কড়ারে ভ্রমরকে পাঠাইয়া দিলেন।

চারি দিনের দিন গোবিন্দলাল আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলেন যে, ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে, আজি তাহাকে আনিতে পাল্কী যাইবে। গোবিন্দলাল সকলই বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বড় অভিমান হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া, না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি আর সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?"

এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, ভ্রমরকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে মাতাকে নিষেধ করিলেন। কেন নিষেধ করিলেন, তাহা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার সম্মতি পাইয়া, কৃষ্ণকান্ত বধূ আনিবার জন্য আর কোন উদ্যোগ করিলেন না।

পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

এইরূপে দুই চারি দিন গেল। ভ্রমরকে কেহ আনিল না, ভ্রমরও আসিল না। গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরের বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে, তাহাকে একটু কাঁদাইব। মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব। এক একবার শূন্য-গৃহ দেখিয়া আপনি একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া এক একবার একটু কাঁদিলেন। ভ্রমরের সঙ্গে কলহ, এ কথা ভাবিয়া কান্না আসিল। আবার চোখের জল মুছিয়া, রাগ করিলেন। রাগ করিয়া ভ্রমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। ভুলিবার সাধ্য কি? সুখ যায়, স্মৃতি যায় না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। মানুষ যায়, নাম থাকে।

শেষ দুর্বুদ্ধি গোবিন্দলাল মনে করিলেন, ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিন্তা। রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা, একদিনও গোবিন্দলালের হৃদয় পরিত্যাগ করে নাই। গোবিন্দলাল জোর করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্তু সে ছাড়িত না। উপন্যাসে শুনা যায়, কোন গৃহে ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে, ভূত দিবারাত্রি উঁকি ঝুঁকি মারে কিন্তু ওঝা তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। রোহিণী প্রেতিনী তেমনি দিবারাত্রি গোবিন্দলালের হৃদয়মন্দিরে উঁকি ঝুঁকি মারে, গোবিন্দলাল তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। যেমন জলতলে চন্দ্রসূর্য্যের ছায়া আছে, চন্দ্র সূর্য্য নাই, তেমনি গোবিন্দলালের হৃদয়ে অহরহঃ রোহিণীর ছায়া আছে, রোহিণী নাই। গোবিন্দলাল ভাবিলেন, যদি ভ্রমরকে আপাততঃ ভুলিতে হইবে, তবে রোহিণীর কথাই ভাবি—নইলে এ দুঃখ ভুলা যায় না। অনেক কুচিকিৎসক ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন। গোবিন্দলালও ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দলাল আপন ইচ্ছায় আপনি আপন অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রোহিণীর কথা প্রথমে স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল বারুণীতটে, পুষ্পবৃক্ষপরিবেষ্টিত মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করিয়া সেই বাসনার জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন। বর্ষাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাদল হইয়াছে—বৃষ্টি কখনও কখনও জোরে আসিতেছে—কখনও মৃদু

হইতেছে। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়া নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। প্রায়াগতা যামিনীর অন্ধকার, তাহার উপর বাদলের অন্ধকার, বারুণীর ঘাট স্পষ্ট দেখা যায় না। গোবিন্দলাল অস্পষ্টরূপে দেখিলেন যে, একজন স্ত্রীলোক নামিতেছে। রোহিণীর সেই সোপানাবতরণ গোবিন্দলালের মনে হইল। বাদলে ঘাট বড় পিছল হইয়াছে—পাছে পিছলে পা পিছলাইয়া স্ত্রীলোকটি জলে পড়িয়া গিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, ভাবিয়া গোবিন্দলাল কিছু ব্যস্ত হইলেন। পুষ্পমণ্ডপ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "কে গো তুমি, আজ ঘাটে নামিও না – বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে।"

স্ত্রীলোকটি তাহার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। বৃষ্টি পড়িতেছিল—বোধ হয় বৃষ্টির শব্দে সে ভাল করিয়া শুনিতে পায় নাই। সে কুক্ষিস্থ কলসী ঘাটে নামাইল। সোপান পুনরারোহণ করিল। ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান অভিমুখে চলিল। উদ্যানদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। গোবিন্দলালের কাছে, মণ্ডপতলে গিয়া দাঁড়াইল।

গোবিন্দলাল দেখিলেন, সম্মুখে রোহিণী।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "ভিজিতে ভিজিতে এখানে কেন রোহিণী?"

রো। আপনি কি আমাকে ডাকিলেন?

গো। ডাকি নাই। ঘাটে বড় পিছল, নামিতে বারণ করিতেছিলাম। দাঁড়াইয়া ভিজিতেছ কেন?

রোহিণী সাহস পাইয়া মণ্ডপমধ্যে উঠিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "লোকে দেখিলে কি বলিবে?"

রো। যা বলিবার তা বলিতেছে। সে কথা আপনার কাছে একদিন বলিব বলিয়া অনেক যত্ন করিতেছি।

গো। আমারও সে সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। কে এ কথা রটাইল? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন?

রো। সকল বলিতেছি। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি?

গো। না আমার সঙ্গে আইস।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল, রোহিণীকে ডাকিয়া বাগানের বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন।

সেখানে উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। কেবল এই মাত্র বলিব যে, সে রাত্রে রোহিণী, গৃহে যাইবার পূর্ব্বে বুঝিয়া গেলেন যে, গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।

ষড়্‌বিংশতিতম পরিচ্ছেদ

রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী-শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছিল।

গোবিন্দলাল প্রথমে এইরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে। কিন্তু যেমন বাহ্য জগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জ্জগতে পাপের আকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতি বর্দ্ধিত হয়। গোবিন্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল—কেন না, রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না।

ক্রমে কৃষ্ণকান্তের কাণে রোহিণী ও গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্ত দুঃখিত হইলেন। গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক ঘটিলে তাঁহার বড় কষ্ট। মনে মনে ইচ্ছা হইল, গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ করিবেন। কিন্তু সম্প্রতি কিছু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শয়নমন্দির ত্যাগ করিতে পারিতেন না। সেখানে গোবিন্দলাল তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে আসিত কিন্তু সর্ব্বদা তিনি সেবকগণপরিবেষ্টিত থাকিতেন, গোবিন্দলালকে সকলের সাক্ষাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইল। হঠাৎ কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যে, বুঝি চিত্রগুপ্তের হিসাব নিকাশ হইয়া আসিল—এ জীবনের সাগরসঙ্গম বুঝি সম্মুখে। আর বিলম্ব করিলে কথা বুঝি বলা হইবে না। এক দিন গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন কৃষ্ণকান্ত মনের কথা বলিবেন মনে করিলেন। গোবিন্দলাল দেখিতে আসিলেন। কৃষ্ণকান্ত পার্শ্ববর্ত্তিগণকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। পার্শ্ববর্ত্তিগণ সকলে উঠিয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আজ কেমন আছেন?" কৃষ্ণকান্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আজি বড় ভাল নই। তোমার এত রাত্রি হইল কেন?"

গোবিন্দলাল সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, কৃষ্ণকান্তের প্রকোষ্ঠ হস্তমধ্যে লইয়া নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন। অকস্মাৎ গোবিন্দলালের মুখ শুকাইয়া গেল। কৃষ্ণকান্তের জীবনপ্রবাহ অতি ধীরে, ধীরে, ধীরে বহিতেছে। গোবিন্দলাল কেবল বলিলেন, "আমি আসিতেছি।" কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহ হইতে নির্গত হইয়া গোবিন্দলাল একেবারে স্বয়ং বৈদ্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈদ্য বিস্মিত

হইল। গোবিন্দলাল বলিলেন, "মহাশয় শীঘ্র ঔষধ লইয়া আসুন, জ্যেষ্ঠতাতের অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।" বৈদ্য শশব্যস্তে একরাশি বটিকা লইয়া তাঁহার সঙ্গে ছুটিলেন।—কৃষ্ণকান্তের গৃহে গোবিন্দলাল বৈদ্যসহিত উপস্থিত হইলেন, কৃষ্ণকান্ত কিছু ভীত হইলেন। কবিরাজ হাত দেখিলেন। কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কিছু শঙ্কা হইতেছে কি?" বৈদ্য বলিলেন, "মনুষ্যশরীরে শঙ্কা কখন নাই?"

কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন, বলিলেন, "কতক্ষণ মিয়াদ?"

বৈদ্য বলিলেন, "ঔষধ খাওয়াইয়া পশ্চাৎ বলিতে পারিব।" বৈদ্য ঔষধ মাড়িয়া সেবন জন্য কৃষ্ণকান্তের নিকট উপস্থিত করিলেন। কৃষ্ণকান্ত ঔষধের খল হাতে লইয়া একবার মাথায় স্পর্শ করাইলেন। তাহার পর ঔষধটুকু সমুদয় পিকদানিতে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

বৈদ্য বিষণ্ণ হইল। কৃষ্ণকান্ত দেখিয়া বলিলেন, "বিষণ্ণ হইবেন না। ঔষধ খাইয়া বাঁচিবার বয়স আমার নহে। ঔষধের অপেক্ষা হরিনামে আমার উপকার। তোমরা হরিনাম কর, আমি শুনি।"

কৃষ্ণকান্ত ভিন্ন কেহই হরিনাম করিল না, কিন্তু সকলেই স্তম্ভিত, ভীত, বিস্মিত হইল। কৃষ্ণকান্ত একাই ভয়শূন্য। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে বলিলেন, আমার শিওরে দেরাজের চাবি আছে, বাহির কর।"

গোবিন্দলাল বালিসের নীচে হইতে চাবি লইলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "দেরাজ খুলিয়া আমার উইল বাহির কর।"

গোবিন্দলাল দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির করিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "আমার আমলা মুহুরি ও দশ জন গ্রামস্থ ভদ্রলোক ডাকাও।"

তখনই নায়েব মুহুরি গোমস্তা কারকুনে, চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যে, ঘোষ বসু মিত্র দত্তে ঘর পুরিয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত একজন মুহুরিকে আজ্ঞা করিলেন, "আমার উইল পড়।"

মুহুরি পড়িয়া সমাপ্ত করিল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "ও উইল ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। নূতন উইল লেখ।"

মুহুরি জিজ্ঞাসা করিল, "কিরূপ লিখিব?"

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "যেমন আছে সব সেইরূপ, কেবল—"

"কেবল কি?"

"কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া দিয়া, তাহার স্থানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ

ভ্রমরের নাম লেখ। ভ্রমরের অবর্ত্তমানাবস্থায় গোবিন্দলাল ঐ অর্দ্ধাংশ পাইবে লেখ।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কেহ কোন কথা কহিল না। মুহুরি গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিল। গোবিন্দলাল ইঙ্গিত করিলেন, লেখ।

মুহুরি লিখিতে আরম্ভ করিল। লেখা সমাপন হইলে কৃষ্ণকান্ত স্বাক্ষর করিলেন। সাক্ষিগণ স্বাক্ষর করিল। গোবিন্দলাল আপনি উপযাচক হইয়া, উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন।

উইলে গোবিন্দলালের এক কপর্দ্দকও নাই—ভ্রমরের অর্দ্ধাংশ।

সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে তুলসীতলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোক গমন করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু সংবাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, একটা ইন্দ্রপাত হইয়াছে, কেহ বলিল, একটা দিক্‌পাল মরিয়াছে, কেহ বলিল, পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে। কৃষ্ণকান্ত বিষয়ী লোক, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন। এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে যথেষ্ট দান করিতেন। সুতরাং অনেকেই তাঁহার জন্য কাতর হইল।

সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রমর। এখন কাজে কাজেই ভ্রমরকে আনিতে হইল। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর দিনেই গোবিন্দলালের মাতা উদ্যোগী হইয়া পুত্রবধূকে আনিতে পাঠাইলেন। ভ্রমর আসিয়া কৃষ্ণকান্তের জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গোবিন্দলালের সঙ্গে ভ্রমরের প্রথম সাক্ষাতে, রোহিণীর কথা লইয়া কোন মহাপ্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের শোকে সে সকল কথা এখন চাপা পড়িয়া গেল। ভ্রমরের সঙ্গে গোবিন্দলালের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন ভ্রমর জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের জন্য কাঁদিতেছে। গোবিন্দলালকে দেখিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দলালও অশ্রুবর্ষণ করিলেন।

অতএব যে বড় হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল, সেটা গোলমালে মিটিয়া গেল। দুই জনেই তাহা বুঝিল। দুই জনেই মনে মনে স্থির করিল যে, যখন প্রথম দেখায় কোন কথাই হইল না, তবে আর গোলযোগ করিয়া কাজ নাই—গোলযোগের এ সময় নহে; মানে মানে কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া যাক্—তাহার পরে যাহার মনে যা থাকে, তাহা হইবে। তাই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, একদা উপযুক্ত

সময় বুঝিয়া ভ্রমরকে বলিয়া রাখিলেন, "ভ্রমর, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা আছে। কথাগুলি বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। পিতৃশোকের অধিক যে শোক, আমি সেই শোকে এক্ষণে কাতর। এখন আমি সে সকল কথা তোমায় বলিতে পারি না; শ্রাদ্ধের পর যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব। ইহার মধ্যে সে সকল কথার কোন প্রসঙ্গে কাজ নাই।"

ভ্রমর অতি কষ্টে নয়নাশ্রু সম্বরণ করিয়া বাল্যপরিচিত দেবতা, কালী, দুর্গা, শিব, হরি স্মরণ করিয়া বলিল, "আমারও কিছু বলিবার আছে। তোমার যখন অবকাশ হইবে, জিজ্ঞাসা করিও।"

আর কোন কথা হইল না। দিন যেমন কাটিত, তেমনি কাটিতে লাগিল,—দেখিতে দেখিতে, তেমনি দিন কাটিতে লাগিল; দাস দাসী, গৃহিণী, পৌরস্ত্রী, আত্মীয় স্বজন কেহ জানিতে পারিল না যে, আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে, এ চারু প্রেমপ্রতিমায় ঘুণ লাগিয়াছে। কিন্তু ঘুণ লাগিয়াছে ত সত্য। যাহা ছিল, তাহা আর নাই। যে হাসি ছিল, সে হাসি আর নাই। ভ্রমর কি হাসে না? গোবিন্দলাল কি হাসে না? হাসে, কিন্তু, সে হাসি আর নাই। নয়নে নয়নে মিলিতে মিলিতে যে হাসি আপনি উছলিয়া উঠে, সে হাসি আর নাই; যে হাসি আধ হাসি আধ প্রীতি, সে হাসি আর নাই; যে হাসি অর্দ্ধেক বলে, সংসার সুখময়, অর্দ্ধেক বলে, সুখের আকাঙ্ক্ষা পূরিল না—সে হাসি আর নাই। সে চাহনি নাই—যে চাহনি দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত, "এত রূপ!"—যে চাহনি দেখিয়া গোবিন্দলাল ভাবিত, "এত গুণ"! সে চাহনি আর নাই। যে চাহনিতে গোবিন্দলালের স্নেহপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি প্রমত্ত চক্ষু দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত, বুঝি এ সমুদ্র আমার ইহজীবনে আমি সাঁতার দিয়া পার হইতে পারিব না,—যে চাহনি দেখিয়া, গোবিন্দলাল ভাবিয়া ভাবিয়া, এ সংসার সকল ভুলিয়া যাইত, সে চাহনি আর নাই। সে সকল প্রিয় সম্বোধন আর নাই—সে "ভ্রমর", "ভোমরা", "ভোমর", "ভোম", ভূমরি", "ভূমি", "ভূম", "ভোঁ ভোঁ—"—সে সব নিত্য নূতন স্নেহপূর্ণ, রঙ্গপূর্ণ, সুখপূর্ণ সম্বোধন আর নাই। সে কালো, কালা, কালাচাঁদ, কেলেসোণা, কালোমাণিক, কালিন্দী, কালীয়ে—সে প্রিয়সম্বোধন আর নাই। সে ও, ওগো, ওহে, ওলো,—সে প্রিয়সম্বোধন আর নাই। সে মিছামিছি ডাকাডাকি আর নাই। সে মিছামিছি বকাবকি আর নাই। সে কথা কহার প্রণালী আর নাই। আগে কথা কুলাইত না—এখন তাহা খুঁজিয়া আনিতে হয়। যে কথা অর্দ্ধেক ভাষায়, অর্দ্ধেক নয়নে নয়নে, অধরে অধরে প্রকাশ পাইত, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। সে কথা বলিবার প্রয়োজন

নাই, কেবল উত্তরে কণ্ঠস্বর শুনিবার প্রয়োজন, এখন সে কথা উঠিয়া গিয়াছে। আগে যখন গোবিন্দলাল ভ্রমর একত্রিত থাকিত, তখন গোবিন্দলালকে ডাকিলে কেহ সহজে পাইত না—ভ্রমরকে ডাকিলে একেবারে পাইত না। এখন ডাকিতে হয় না—হয় "বড় গরমি", নয় "কে ডাকিতেছে," বলিয়া একজন উঠিয়া যায়। সে সুন্দর পূর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে। কার্ত্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে। কে খাঁটি সোণায় দস্তার খাদ মিশাইয়াছে—কে সুরবাঁধা যন্ত্রের তার কাটিয়াছে।

আর সেই মধ্যাহ্নরবিকরপ্রফুল্ল হৃদয়মধ্যে অন্ধকার হইয়াছে। গোবিন্দলাল সে অন্ধকারে আলো করিবার জন্য ভাবিত রোহিণী,—ভ্রমর সে ঘোর, মহাঘোর অন্ধকারে আলো করিবার জন্য ভাবিত—যম! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, প্রেমশূন্যের প্রীতিস্থান তুমি, যম! চিত্তবিনোদন, দুঃখবিনাশন, বিপদ্‌ভঞ্জন দীনরঞ্জন তুমি যম! আশাশূন্যের আশা, ভালবাসাশূন্যের ভালবাসা, তুমি যম! ভ্রমরকে গ্রহণ কর, হে যম!

অষ্টাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ

তার পর কৃষ্ণকান্ত রায়ের ভারি শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। শত্রুপক্ষ বলিল যে, হাঁ ঘটা হইয়াছে বটে, পাঁচ সাত দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষ বলিল, লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উত্তরাধিকারিগণ মিত্রপক্ষের নিকট গোপনে বলিল, আন্দাজ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা খাতা দেখিয়াছি। মোট ব্যয় ৩২৩৫।৬১২৷৷।

যাহা হউক, দিনকতক বড় হাঙ্গামা গেল। হরলাল শ্রাদ্ধাধিকারী, আসিয়া শ্রাদ্ধ করিল। দিনকতক মাছির ভনভনানিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে, কাঙ্গালির কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে কাণ পাতা গেল না। সন্দেশ মিঠাইয়ের আমদানি, কাঙ্গালির আমদানি, টিকী নামাবলীর আমদানি, কুটুম্বের কুটুম্ব, তস্য কুটুম্ব, তস্য কুটুম্বের আমদানি। ছেলেগুলা মিহিদানা সীতাভোগ লইয়া ভাঁটা খেলাইতে আরম্ভ করিল; মাগীগুলা নারিকেল তৈল মহার্ঘ দেখিয়া, মাথায় লুচিভাজা ঘি মাখিতে আরম্ভ করিল; গুলির দোকান বন্ধ হইল, সব গুলিখোর ফলাহারে; মদের দোকান বন্ধ হইল, সব মাতাল, টিকী রাখিয়া নামাবলী কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে গিয়াছে। চাল মহার্ঘ হইল, কেন না, কেবল অন্নব্যয় নয়, এত ময়দা খরচ যে, আর চালের গুঁড়িতে কুলান যায় না; এত ঘৃতের খরচ যে রোগীরা আর কাষ্টর অয়েল পায় না; গোয়ালার কাছে ঘোল কিনিতে

গেলে তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল, আমার ঘোলকুটু ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে দই হইয়া গিয়াছে।

কোনমতে শ্রাদ্ধের গোল থামিল, শেষ উইল পড়ার মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। উইল পড়িয়া হরলাল দেখিলেন, উইলে বিস্তর সাক্ষী—কোন গোল করিবার সম্ভাবনা নাই। হরলাল শ্রাদ্ধান্তে স্বস্থানে গমন করিলেন।

উইল পড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন, "উইলের কথা শুনিয়াছ?"

ভ্র। কি?

গো। তোমার অর্দ্ধাংশ।

ভ্র। আমার, না তোমার?

গো। এখন আমার তোমার একটু প্রভেদ হইয়াছে। আমার নয়, তোমার।

ভ্র। তাহা হইলেই তোমার।

গো। তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না।

ভ্রমরের বড়ই কান্না আসিল, কিন্তু ভ্রমর অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "তবে কি করিবে?"

গো। যাহাতে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারি, তাহাই করিব।

ভ্র। সে কি?

গো। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া চাকরির চেষ্টা করিব।

ভ্র। বিষয় আমার জ্যেষ্ঠ শ্বশুরের নহে, আমার শ্বশুরের। তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী, আমি নহি। জ্যেঠার উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। উইল অসিদ্ধ। আমার পিতা শ্রাদ্ধের সময় নিমন্ত্রণে আসিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিষয় তোমার, আমার নহে।

গো। আমার জ্যেষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী ছিলেন না। বিষয় তোমার, আমার নহে। তিনি যখন তোমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, তখন বিষয় তোমার, আমার নহে।

ভ্র। যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি না হয় তোমাকে লিখিয়া দিতেছি।

গো। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিতে হইবে?

ভ্র। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি তোমার দাসানুদাসী বই ত নই?

গো। আজি কালি ও কথা সাজে না, ভ্রমর।

ভ্র। কি করিয়াছি? আমি তোমা ভিন্ন এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি না। আট বৎসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি।

আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জানি। আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুত্তুল—আমার কি অপরাধ হইল ?

গো। মনে করিয়া দেখ।

ভ্র। অসময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—ঘাট হইয়াছে, আমার শত-সহস্র অপরাধ হইয়াছে—আমায় ক্ষমা কর। আমি আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম।

গোবিন্দলাল তখন কথা কহিল না। তাহার অগ্রে, আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুন্ঠিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা। গোবিন্দলাল কথা কহিল না। গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল, "এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে, এত কাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব। আমার এ অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে—ক্ষমা কর! আমি বালিকা!

যিনি অনন্ত সুখদুঃখের বিধাতা, অন্তর্য্যামী, কাতরের বন্ধু, অবশ্যই তিনি এ কথাগুলি শুনিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা শুনিল না। নীরব হইয়া রহিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল। তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্তপ্রভাবশালিনী, প্রভাতশুক্রতারারূপিণী, রূপতরঙ্গিণী, চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল।

ভ্রমর উত্তর না পাইয়া বলিল, "কি বল ?"

গোবিন্দলাল বলিল, "আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।"

ভ্রমর পদত্যাগ করিল। উঠিল। বাহিরে যাইতেছিল। চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

ঊনত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

"কি অপরাধ আমি করিয়াছি যে আমাকে ত্যাগ করিবে ?"

এ কথা ভ্রমর গোবিন্দলালকে মুখে বলিতে পারিল না—কিন্তু এই ঘটনার পর পলে পলে, মনে মনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমার কি অপরাধ ?

গোবিন্দলালও মনে মনে অনুসন্ধান করিতে লাগিল যে, ভ্রমরের কি অপরাধ ? ভ্রমরের যে বিশেষ গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, তাহা গোবিন্দলালের মনে এক প্রকার স্থির হইয়াছে—কিন্তু অপরাধটা কি, তাহা তত ভাবিয়া দেখেন নাই। ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হইত, ভ্রমর যে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছিল, অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে এত কঠিন পত্র লিখিয়াছিল—একবার তাঁহাকে মুখে

সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিল না, এই তাহার অপরাধ। যার জন্য এত করি, সে এত সহজে আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, এই তাহার অপরাধ। আমরা কুমতি সুমতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। গোবিন্দলালের হৃদয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিয়া, কুমতি সুমতি যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহা সকলকে শুনাইব।

কুমতি বলিল, "ভ্রমরের প্রথম এইটি অপরাধ, এই অবিশ্বাস।"

সুমতি উত্তর করিল, "যে অবিশ্বাসের যোগ্য, তাহাকে অবিশ্বাস না করিবে কেন? তুমি রোহিণীর সঙ্গে এই আনন্দ উপভোগ করিতেছ, ভ্রমর সেটা সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়াই তার এত দোষ?"

কুমতি। এখন যেন আমি অবিশ্বাসী হইয়াছি, কিন্তু যখন ভ্রমর অবিশ্বাস করিয়াছিল, তখন আমি নির্দ্দোষী।

সুমতি। দুদিন আগে পাছেতে বড় আসিয়া যায় না—দোষ ত করিয়াছ। যে দোষ করিতে সক্ষম, তাহাকে দোষী মনে করা কি এত গুরুতর অপরাধ?

কুমতি। ভ্রমর আমাকে দোষী মনে করিয়াছে বলিয়াই আমি দোষী হইযাছি। সাধুকে চোর বলিতে বলিতে চোর হয়।

সুমতি। দোষটা যে চোর বলে তার। যে চুরি করে তার কিছু নয়।

সুমতি। তোর সঙ্গে ঝগড়ায় আমি পারব না। দেখ্ না, ভ্রমর আমার কেমন অপমানটা করিল? আমি বিদেশ থেকে আস্‌ছি শুনে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

সুমতি। যদি সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে সে সঙ্গত কাজই করিয়াছে। স্বামী পরদারনিরত হইলে নারীদেহ ধারণ করিয়া কে রাগ না করিবে?

কুমতি। সেই বিশ্বাসই তাহার ভ্রম—আর দোষ কি?

সুমতি। এ কথা কি তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ?

কুমতি। না।

সুমতি। তুমি না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিতেছ, আর ভ্রমর নিতান্ত বালিকা, না জিজ্ঞাসা করিয়া রাগ করিয়াছিল বলিয়া এত হাঙ্গামা? সে সব কাজের কথা নহে—আসল রাগের কারণ কি বলিব?

কুমতি। কি বল না?

সুমতি। আসল কথা রোহিণী। রোহিণীতে প্রাণ পড়িয়াছে—তাই আর কালো ভোমরা ভাল লাগে না।

কুমতি। এত কাল ভোমরা ভাল লাগিল কিসে?

সুমতি। এত কাল রোহিণী জোটে নাই। এক দিনে কোন কিছু ঘটে না। সময়ে সকল উপস্থিত হয়। আজ রৌদ্রে ফাটিতেছে বলিয়া কাল দুর্দ্দিন হইবে না কেন? শুধু কি তাই—আরও আছে!

সুমতি। আর কি?

সুমতি। কৃষ্ণকান্তের উইল। বুড়া মনে মনে জানিত, ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গেলে—বিষয় তোমারই রহিল। ইহাও জানিত যে, ভ্রমর এক মাসের মধ্যে তোমাকে উহা লিখিয়া দিবে। কিন্তু আপাততঃ তোমাকে একটু সুপথগামী দেখিয়া তোমার চরিত্র শোধন জন্য তোমাকে ভ্রমরের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গেল। তুমি অতটা না বুঝিয়া ভ্রমরের উপর রাগিয়া উঠিয়াছ।

কুমতি। তা সত্যই। আমি কি স্ত্রীর মাসহারা খাইব না কি?

সুমতি। তোমার বিষয়, তুমি কেন ভ্রমরের কাছে লিখিয়া লও না?

কুমতি। স্ত্রীর দানে দিনপাত করিব?

সুমতি। আরে বাপ রে! কি পুরুষসিংহ! তবে ভ্রমরের সঙ্গে মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী করিয়া লও না—তোমার পৈতৃক বিষয় বটে।

কুমতি। স্ত্রীর সঙ্গে মোকদ্দমা করিব?

সুমতি। তবে আর কি করিবে? গোল্লায় যাও।

কুমতি। সেই চেষ্টায় আছি।

সুমতি। রোহিণী—সঙ্গে যাবে কি?

তখন কুমতিতে সুমতিতে ভারি চুলোচুলি ঘুষোঘুষি আরম্ভ হইল।

ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বধূর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রীলোক ইহা সহজেই বুঝিতে পারে। যদি তিনি এই সময়ে সদুপদেশে, স্নেহবাক্যে এবং স্ত্রীবুদ্ধিসুলভ অন্যান্য সদুপায়ে তাহার প্রতীকার করিতে যত্ন করিতেন, তাহা হইলে বুঝি সুফল ফলাইতে পারিতেন। কিন্তু গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা গৃহিণী নহেন, বিশেষ পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপরে একটু বিদ্বেষাপন্নাও হইয়াছিলেন। যে স্নেহের বলে তিনি ভ্রমরের ইষ্টকামনা করিবেন ভ্রমরের উপর তাঁহার সে স্নেহ ছিল না। পুত্র থাকিতে, পুত্রবধূর বিষয় হইল, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি একবারও

নুভব করিতে পারিলেন না যে, ভ্রমর গোবিন্দলাল অভিন্নসম্পত্তি জানিয়া, বিন্দলালের চরিত্রদোষসম্ভাবনা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত রায় গোবিন্দলালের শাসন জন্য ভ্রমরকে বিষয় দিয়া গিয়াছিলেন। একবারও তিনি মনে ভাবিলেন না যে, কৃষ্ণকান্ত মুমূর্ষু অবস্থায় কতকটা লুপ্তবুদ্ধি হইয়া, কতকটা ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই অবিধেয় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, পুত্রবধূর সংসারে তাঁহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী, এবং অন্নদাস পৌরবর্গের মধ্যে গণ্যা হইয়া ইহজীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব সংসার ত্যাগ করাই ভাল, স্থির করিলেন। েক পতিহীনা, কিছু আত্মপরায়ণা, তিনি স্বামিবিয়োগকাল হইতেই কাশীযাত্রা মনা করিতেন, কেবল স্ত্রীস্বভাবসুলভ পুত্রস্নেহবশতঃ এত দিন যাইতে পারেন াই। এক্ষণে সে বাসনা আরও প্রবল হইল।

তিনি গোবিন্দলালকে বলিলেন, "কর্ত্তারা একে একে স্বর্গারোহণ করিলেন, খন আমার সময় নিকট হইয়া আসিল। তুমি পুত্রের কাজ কর; এই সময় মাকে কাশী পাঠাইয়া দাও।"

গোবিন্দলাল হঠাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলিলেন, "চল, আমি মাকে আপনি কাশী রাখিয়া আসিব।" দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ভ্রমর একবার চ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। কেহই তাঁহাকে নিষেধ করে নাই। অতএব মরের অজ্ঞাতে গোবিন্দলাল কাশীযাত্রার সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। জনামে কিছু সম্পত্তি ছিল—তাহা গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থসঞ্চয় করিলেন। াঞ্চন হীরকাদি মূল্যবান্ বস্তু যাহা নিজের সম্পত্তি ছিল—তাহা বিক্রয় করিলেন। ইরূপে প্রায় লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইল। গোবিন্দলাল ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে দিনপাত রিবেন স্থির করিলেন।

তখন মাতৃসঙ্গে কাশীযাত্রার দিন স্থির করিয়া ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইলেন। শুড়ী কাশীযাত্রা করিবেন শুনিয়া ভ্রমর তাড়াতাড়ি আসিল। আসিয়া শুড়ীর চরণ ধরিয়া অনেক বিনয় করিল; শাশুড়ীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে গিল, "মা, আমি বালিকা—আমায় একা রাখিয়া যাইও না—আমি সংসার-র্ম্মের কি বুঝি? মা—সংসার সমুদ্র, আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাসাইয়া যাইও ।" শাশুড়ী বলিলেন, "তোমার বড় ননদ রহিল। সেই তোমাকে আমার যত্ন করিবে—আর তুমিও গৃহিণী হইয়াছে।" ভ্রমর কিছুই বুঝিল না—কেবল দিতে লাগিল।

ভ্রমর দেখিল বড় বিপদ্ সম্মুখে। শাশুড়ী ত্যাগ করিয়া চলিলেন—আবার মীও তাঁহাকে রাখিতে চলিলেন—তিনিও রাখিতে গিয়া বুঝি আর না আইসেন!

ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "কত দিনে আসিবে বলিয়া যাও।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "বলিতে পারি না। আসিতে বড় ইচ্ছা নাই।"

ভ্রমর পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, মনে ভাবিল, "ভয় কি? বিষ খাইব?"

তার পরে স্থিরীকৃত যাত্রার দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রাম হইতে কিছু দূর শিবিকারোহণে গিয়া ট্রেন পাইতে হইবে। শুভ যাত্রিক লগ্ন উপস্থিত—সকল প্রস্তুত। ভারে ভারে সিন্দুক, তোরঙ্গ, বাক্স, বেগ, গাঁটরি বাহকেরা বহিতে আরম্ভ করিল। দাস দাসী সুবিমল ধৌতবস্ত্র পরিয়া, কেশ রঞ্জিত করিয়া দরওয়াজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে লাগিল—তাহারা সঙ্গে যাইবে। দারবানেরা ছিটের জামার বন্ধক আঁটিয়া লাঠি হাতে করিয়া, বাহকদিগের সঙ্গে বকাবকি আরম্ভ করিল। পাড়ার মেয়ে ছেলে দেখিবার জন্য ঝুঁকিল। গোবিন্দলালের মাতা গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া, পৌরজন সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিকারোহণ করিলেন; পৌরজন সকলেই কাঁদিতে লাগিল। তিনি শিবিকারোহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন।

এ দিকে গোবিন্দলাল অন্যান্য পৌরস্ত্রীগণকে যথোচিত সম্বোধন করিয়া শয়নগৃহে রোরুদ্যমানা ভ্রমরের কাছে বিদায় লইতে গেলেন। ভ্রমরকে রোদনবিবশা দেখিয়া তিনি যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে না পারিয়া, কেবল বলিলেন "ভ্রমর! আমি মাকে রাখিতে চলিলাম।"

ভ্রমর চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "মা সেখানে বাস করিবেন। তুমি আসবে না কি?"

কথা যখন ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, তখন তাহার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছিল; তাহার স্বরের স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, তাহার অধরে স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া গোবিন্দলাল কিছু বিস্মিত হইলেন। হঠাৎ উত্তর করিতে পারিলেন না। ভ্রমর স্বামীকে নীরব দেখিয়া পুনরপি বলিল, "দেখ, তুমিই আমাকে শিখাইয়াছ, সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম, সত্যই একমাত্র সুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও—আমি তোমার আশ্রিত বালিকা—আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও না—কবে আসিবে?"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "তবে সত্যই শোন। ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই!"

ভ্রমর। কেন ইচ্ছা নাই—তাহা বলিয়া যাইবে না কি?

গো। এখানে থাকিলে তোমার অন্নদাস হইয়া থাকিতে হইবে।

ভ্রমর। তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? আমি ত তোমার দাসানুদাসী।

গো। আমার দাসানুদাসী ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় জানেলায় বসিয়া থাকিবে। তেমন সময়ে সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না।

ভ্রমর। তাহার জন্য কত পায়ে ধরিয়াছি—এক অপরাধ কি মার্জ্জনা হয় না!

গো। এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের অধিকারিণী।

ভ্রমর। তা নয়। আমি এবার বাপের বাড়ী গিয়া, বাপের সাহায্যে যাহা করিয়াছি, তাহা দেখ।

এই বলিয়া ভ্রমর একখানা কাগজ দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে তাহা দিয়া বলিলেন, "পড।"

গোবিন্দলাল পড়িয়া দেখিলেন—দানপত্র। ভ্রমর, উচিত মূল্যের ষ্ট্যাম্পে, আপনার সমুদয় সম্পত্তি স্বামীকে দান করিতেছেন। তাহা রেজিষ্টারী হইয়াছে। গোবিন্দলাল পড়িয়া বলিলেন, "তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ। কিন্তু তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে। তুমি বিষয় দান করিবে, আমি ভোগ করিব—এ সম্বন্ধ নহে।" এই বলিয়া গোবিন্দলাল বহুমূল্য দানপত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

ভ্রমর বলিল, "পিতা বলিয়া দিয়াছেন, ইহা ছিঁড়িয়া ফেলা বৃথা। সরকারীতে ইহার নকল আছে।"

গো। থাকে থাক্ আমি চলিলাম।

ভ্র। কবে আসিবে ?

গো। আসিব না।

ভ্র। কেন ? আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা—তোমার দাসানুদাসী—তোমার কথার ভিখারী—আসিবে না কেন ?

গো। ইচ্ছা নাই।

ভ্র। ধর্ম্ম নাই কি ?

গো। বুঝি আমার তাও নাই।

বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল—ভ্রমর জোড়হাত করিয়া, অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"তবে যাও—পার, আসিও না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও কর।—কিন্তু মনে রাখিও উপরে দেবতা আছেন। মনে রাখিও—এক দিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে। মনে রাখিও এক দিন তুমি খুঁজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ কোথায় ?—দেবতা সাক্ষী! যদি আমি সতী হই, কায়মনোবাক্যে তোমার

পায়ে আমার ভক্তি থাকে, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয় বল যে, আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। যদি এ কথা নিষ্ফল হয়, তবে জানিও—দেবতা মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভ্রমর অসতী! তুমি যাও আমার দুঃখ নাই! তুমি আমারই—রোহিণীর নও।”

এই বলিয়া ভ্রমর, ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

এই আখ্যায়িকা আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে ভ্রমরের একটি পুত্র হইয়া সূতিকাগারেই নষ্ট হয়। ভ্রমর আজি কক্ষান্তরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সেই সাত দিনের ছেলের জন্য কাঁদিতে বসিল। মেঝের উপর পড়িয়া, ধূলায় লুটাইয়া অশমিত নিশ্বাসে পুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল। “আমার ননীর পুতুলী, আমার কাঙ্গালের সোণা, আজ তুমি কোথায়? আজি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে। আমার মায়া কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি কুরূপা কুৎসিতা, তোকে কে কুৎসিত বলিত? তোর চেয়ে কে সুন্দর? একবার দেখা দে বাপ্—এই বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস্ না—মরিলে কি আর দেখা দেয় না।—”

ভ্রমর তখন যুক্তকরে, মনে মনে ঊর্দ্ধমুখে, অথচ অস্ফুট বাক্যে দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, “কেহ আমাকে বলিয়া দাও- আমার কি দোষে, এই সতের বৎসর মাত্র বয়সে এমন অসম্ভব দুর্দ্দশা ঘটিল; আমার পুত্র মরিয়াছে—আমার স্বামী ত্যাগ করিল- আমার সতের বৎসর মাত্র বয়স, আমি এই বয়সে স্বামীর ভালবাসা বিনা আর কিছু ভালবাসি নাই- আমার ইহলোকে আর কিছু কামনা নাই—আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই—আমি আজ সতের বৎসর বয়সে তাহাতে নিরাশ হইলাম কেন?”

ভ্রমর কাঁদিয়া কাটিয়া সিদ্ধান্ত করিল—দেবতারা নিতান্ত নিষ্ঠুর। যখন দেবতা নিষ্ঠুর তখন মনুষ্য আর কি করিবে—কেবল কাঁদিবে। ভ্রমর কেবল কাঁদিতে লাগিল।

এ দিকে গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া ধীরে ধীরে বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব—গোবিন্দলাল চক্ষের জল

মুছিতে মুছিতে আসিলেন। বালিকার অতি সরল যে প্রীতি,—অকৃত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিনরাত্রি ছুটিতেছে—ভ্রমরের কাছে সেই অমূল্য প্রীতি পাইয়া গোবিন্দলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল যে, যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন না। ভাবিলেন, যাহা করিয়াছি, তাহা আর এখন ফিরে না--এখন ত যাই। এখন যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই। বুঝি আর ফেরা হইবে না। যাহা হউক, যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই।

সেই সময়ে যদি গোবিন্দলাল দুই পা ফিরিয়া গিয়া, ভ্রমরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া একবার বলিতেন—"ভ্রমর, আমি আবার আসিতেছি", তবে সকল মিটিত। গোবিন্দলালের অনেক বার সে ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলেও তাহা করিলেন না। ইচ্ছা হইলেও একটু লজ্জা করিল। ভাবিলেন, এত তাড়াতাড়ি কি? যখন মনে করিব, তখন ফিরিব। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। আবার ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। যাহা হয় একটা স্থির করিবার বুদ্ধি হইল না। যে পথে যাইতেছেন, সেই পথে চলিলেন। তিনি চিন্তাকে বর্জন করিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সজ্জিত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক কশাঘাত করিলেন। পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয়মধ্যে ফুটিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রথম বৎসর

হরিদ্রাগ্রামের বাড়ীতে সংবাদ আসিল,—গোবিন্দলাল, মাতা প্রভৃতির সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে সুস্থ শরীরে কাশীধামে পৌছিয়াছেন। ভ্রমরের কাছে কোন পত্র আসিল না। অভিমানে ভ্রমরও পত্র লিখিল না। পত্রাদি আমলাবর্গের কাছে আসিতে লাগিল।

এক মাস গেল, দুই মাস গেল। পত্রাদি আসিতে লাগিল। শেষ এক দিন সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাটী যাত্রা করিয়াছেন।

ভ্রমর শুনিয়া বুঝিল যে, গোবিন্দলাল কেবল মাকে ভুলাইয়া, অন্যত্র গমন করিয়াছেন। বাড়ী আসিবেন এমন ভরসা হইল না।

এই সময়ে ভ্রমর গোপনে সর্ব্বদা রোহিণীর সংবাদ লইতে লাগিল। রোহিণী

রাঁধে বাড়ে, খায়, গা ধোয়, জল আনে। আর কিছুই সংবাদ নাই। ক্রমে এক দিন সংবাদ আসিল, রোহিণী পীড়িতা। ঘরের ভিতর মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, বাহির হয় না। ব্রহ্মানন্দ আপনি রাঁধিয়া খায়।

তার পর এক দিন সংবাদ আসিল যে, রোহিণী কিছু সারিয়াছে, কিন্তু পীড়ার মূল যায় নাই। শূলরোগ—চিকিৎসা নাই—রোহিণী আরোগ্য জন্য তারকেশ্বরে হত্যা দিতে যাইবে। শেষ সংবাদ—রোহিণী হত্যা দিতে তারকেশ্বরে গিয়াছে। একাই গিয়াছে—কে সঙ্গে যাইবে ?

এ দিকে তিন চারি মাস গেল—গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিল না। পাঁচ মাস ছয় মাস হইল, গোবিন্দলাল ফিরিল না। ভ্রমরের রোদনের শেষ নাই। কেবল মনে করিত, এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন—সংবাদ পাইলেই বাঁচি। এ সংবাদও পাই না কেন ?

শেষ ননন্দাকে বলিয়া শাশুড়ীকে পত্র লিখাইল—আপনি মাতা, অবশ্য পুত্রের সংবাদ পান। শাশুড়ী লিখিলেন, তিনি গোবিন্দলালের সংবাদ পাইয়া থাকেন। গোবিন্দলাল প্রয়াগ, মথুরা, জয়পুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া আপাততঃ দিল্লী অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্র সেখান হইতে স্থানান্তরে গমন করিবেন। কোথাও স্থায়ী হইতেছেন না।

এ দিকে রোহিণীও আর ফিরিল না। ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ জানেন, রোহিণী কোথায় গেল। আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমুখে ব্যক্ত করিব না। ভ্রমর আর সহ্য করিতে পারিলেন না ; কাঁদিতে কাঁদিতে ননন্দাকে বলিয়া শিবিকারোহণে পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

সেখানে গিয়া গোবিন্দলালের কোন সংবাদ পাওয়া দুরূহ দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়া হরিদ্রাগ্রামেও স্বামীর কোন সংবাদ না পাইয়া, আবার শাশুড়ীকে পত্র লিখাইলেন। শাশুড়ী এবার লিখিলেন, "গোবিন্দলাল আর কোন সংবাদ দেয় না ; এখন সে কোথায় আছে জানি না। কোনও সংবাদ পাই না।" এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল। প্রথম বৎসরের শেষে ভ্রমর রুগ্নশয্যায় শয়ন করিলেন। অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভ্রমর রুগ্ন শয্যাশায়িনী শুনিয়া ভ্রমরের পিতা ভ্রমরকে দেখিতে আসিলেন। ভ্রমরের পিতার পরিচয় আমরা সবিশেষ দিই নাই—এখন দিব। তাঁহার পিতা মাধবীনাথ সরকারের বয়স একচত্বারিংশৎ বৎসর। তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ।

তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে বড় মতভেদ ছিল। অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিত—অনেকে বলিত, তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই। তিনি যে চতুর, তাহা সকলেই স্বীকার করিত—এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত।

মাধবীনাথ কন্যার দশা দেখিয়া, অনেক রোদন করিলেন। দেখিলেন—সেই শ্যামা সুন্দরী, যাহার সর্ব্বাবয়ব সুললিতগঠন ছিল—এক্ষণে, বিশুষ্কবদন, শীর্ণশরীর, প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্ননয়নেন্দীবর। ভ্রমরও অনেক কাঁদিল। শেষ উভয়ে রোদন সংবরণ করিলে পর ভ্রমর বলিল, "বাবা, আমার বোধ হয় আর দিন নাই। আমায় কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করাও। আমি ছেলে মানুষ হলে কি হয়, আমার ত দিন ফুরাল। দিন ফুরাল ত আর বিলম্ব করিব কেন? আমার অনেক টাকা আছে, আমি ব্রত নিয়ম করিব। কে এ সকল করাইবে? বাবা, তুমি আমার ব্যবস্থা কর।"

মাধবীনাথ কোন উত্তর করিলেন না—যন্ত্রণা অসহ্য হইলে তিনি বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। বহির্ব্বাটীতে অনেকক্ষণ বসিয়া রোদন করিলেন। কেবল রোদন নহে—সেই মর্ম্মভেদী দুঃখ মাধবীনাথের হৃদয়ে ঘোরতর ক্রোধে পরিণত হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যে আমার কন্যার উপর এ অত্যাচার করিয়াছে—তাহার উপর তেমনি অত্যাচার করে, এমন কি জগতে কেহ নাই?" ভাবিতে ভাবিতে মাধবীনাথের হৃদয় কাতরতার পরিবর্ত্তে প্রদীপ্ত ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইল। মাধবীনাথ তখন রক্তোৎফুল্ললোচনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যে আমার ভ্রমরের এমন সর্ব্বনাশ করিয়াছে—আমি তাহার এমনই সর্ব্বনাশ করিব।"

তখন মাধবীনাথ কতক সুস্থির হইয়া অন্তঃপুরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। কন্যার কছে গিয়া বলিলেন, "মা, তুমি ব্রত নিয়ম করিবার কথা বলিতেছিলে, আমি সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। এখম তোমার শরীর বড় রুগ্ন; ব্রত নিয়ম করিতে গেলে অনেক উপবাস করিতে হয়; এখন তুমি উপবাস সহ্য করিতে পারিবে না। একটু শরীর সারুক"—

ভ্র। এ শরীর কি আর সারিবে?

মা। সারিবে মা—কি হইয়াছে? তোমার একটু এখানে চিকিৎসা হইতেছে না—কেমন করিয়াই বা হইবে? শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই, কেহ কাছে নাই—কে চিকিৎসা করাইবে? তুমি এখন আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে বাড়ী রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। আমি এখন দুই দিন এখানে থাকিব—তাহার পরে তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া রাজগ্রামে যাইব।

রাজগ্রামে ভ্রমরের পিত্রালয়।

কন্যার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মাধবীনাথ কন্যার কার্য্যকারকবর্গের নিকট গেলেন। দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বাবুর কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে?" দেওয়ানজী উত্তর করিল, "কিছু না।"

মাধবীনাথ। তিনি এখন কোথায় আছেন?

দেওয়ানজী। তাঁহার কোন সংবাদই আমরা কেহ বলিতে পারি না। তিনি কোন সংবাদই পাঠান না।

মা। কাহার কাছে এ সংবাদ পাইতে পারিব?

দে। তাহা জানিলে ত আমরা সংবাদ লইতাম। কাশীতে মা ঠাকুরাণীর কাছে সংবাদ জানিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম—কিন্তু সেখানেও কোন সংবাদ আইসে না। বাবুর এক্ষণে অজ্ঞাতবাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ কন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহার প্রতিকার করিবেন। গোবিন্দলাল ও রোহিণী এই অনিষ্টের মূল। অতএব প্রথমেই সন্ধান কর্ত্তব্য, সেই পামর পামরী কোথায় আছে। নচেৎ দুষ্টের দণ্ড হইবে না—ভ্রমরও মরিবে।

তাহারা একেবারে লুকাইয়াছে। যে সকল সূত্রে তাহাদের ধরিবার সম্ভাবনা সকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে; পদচিহ্নমাত্র মুছিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মাধবীনাথ বলিলেন যে যদি আমি তাহাদের সন্ধান করিতে না পারি, তবে বৃথায় আমার পৌরুষের শ্লাঘা করি।

এইরূপ স্থির সঙ্কল্প করিয়া মাধবীনাথ একাকী রায়দিগের বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। হরিদ্রাগ্রামে একটি পোষ্ট অফিস ছিল; মাধবীনাথ বেত্রহস্তে, হেলিতে দুলিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, ধীরে ধীরে, নিরীহ ভালমানুষের মত, সেইখানে গিয়া দর্শন দিলেন।

ডাকঘরে, অন্ধকার চালাঘরের মধ্যে মাসিক পনর টাকা বেনতভোগী একটি ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বিরাজ করিতেছিলেন। একটি আম্রকাষ্ঠের ভগ্ন টেবিলের উপরে কতকগুলি চিঠি, চিঠির ফাইল, চিঠির খাম, একখানি খুরিতে কতকটা জিউলির আটা, একটি নিক্তি, ডাকঘরের মোহর ইত্যাদি লইয়া পোষ্ট মাষ্টার ওরফে পোষ্ট বাবু গম্ভীরভাবে, পিওন মহাশয়ের নিকট আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন। ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার বাবু পান পনর টাকা, পিওন পায় ৭ টাকা। সুতরাং পিওন মনে করে, সাত আনা আর পনর আনায় যে তফাৎ, বাবুর সঙ্গে

আমার সঙ্গে তাহার অধিক তফাৎ নহে। কিন্তু বাবু মনে মনে জানেন যে, আমি একটা ডিপুটি—ও বেটা পিয়াদা—আমি উহার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ—উহাতে আমাতে জমীন আশমান্ ফারাক। সেই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য, পোষ্ট মাষ্টার বাবু সর্ব্বদা সে গরীবকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকেন—সেও সাত আনার ওজনে উত্তর দিয়া থাকে। বাবু আপাততঃ চিঠি ওজন করিতেছিলেন, এবং পিয়াদাকে সঙ্গে সঙ্গে আশী আনার ওজনে ভৎর্সনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রশান্তমূর্ত্তি সহাস্যবদন মাধবীনাথ বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক দেখিয়া, পোষ্ট মাষ্টার বাবু আপাততঃ পিয়াদার সঙ্গে কচকচি বন্ধ করিয়া, হাঁ করিয়া, চাহিয়া রহিলেন। ভদ্রলোককে সমাদর করিতে হয়,- এমন কতকটা তাঁহার মনে উদয় হইল—কিন্তু সমাদর কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা তাহার শিক্ষার মধ্যে নহে—সুতরাং তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

মাধবীনাথ দেখিলেন, একটা বানর। সহাস্যবদনে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ ?"

পোষ্ট মাষ্টার বলিলেন, "হাঁ—তু—তুমি—আপনি ?"

মাধবীনাথ ঈষৎ হাস্য সংবরণ করিয়া অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "প্রাতঃপ্রণাম !"

তখন পোষ্ট মাষ্টার বাবু বলিলেন, "বসুন।"

মাধবীনাথ কিছু বিপদে পড়িলেন ;—পোষ্ট বাবু ত বলিলেন, "বসুন", কিন্তু তিনি বসেন কোথা—বাবু খোদ এক অতি প্রাচীন ত্রিপাদমাত্রা বশিষ্ট চৌকিতে বসিয়া আছেন—তাহা ভিন্ন আর আসন কোথাও নাই। তখন সেই পোষ্ট মাষ্টার বাবুর সাত আনা, হরিদাস পিয়াদা—একটা ভাঙ্গা টুলের উপর হইতে রাশিখানি ছেঁড়া বহি নামাইয়া রাখিয়া মাধবীনাথকে বসিতে দিল। মাধবীনাথ বসিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "কি হে বাপু কেমন আছ ? তোমাকে দেখিয়াছি না।"

পিয়াদা। আজ্ঞে, আমি চিঠি বিলি করিয়া থাকি।

মাধবী। তাই চিনিতেছি। এক ছিলিম তামুক সাজ দেখি—

মাধবীনাথ গ্রামান্তরের লোক, তিনি কখনই হরিদাস বৈরাগী পিয়াদাকে দেখেন নাই এবং বৈরাগী বাবাজিও কখনও তাঁহাকে দেখেন নাই। বাবাজি মনে করিলেন—বাবুটা রকমসই বটে, চাহিলে কোন্ না চারি গণ্ডা বক্‌শিস্ দিবে। এই ভাবিয়া হরিদাস হুঁকোর তল্লাসে ধাবিত হইলেন।

মাধবীনাথ আদৌ তামাকু খান না—কেবল হরিদাস বাবাজিকে বিদায় করিবার জন্য তামাকুর ফরমায়েস্ করিলেন।

পিয়াদা মহাশয় স্থানান্তরে গমন করিলে, মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে বলিলেন, "আপনার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসা হইয়াছে।"

পোষ্ট মাষ্টার বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয়—নিবাস বিক্রমপুর। অন্য দিকে যেমন নির্ব্বোধ হউন না কেন—আপনার কাজ বুঝিতে সূচ্যগ্রবুদ্ধি। বুঝিলেন যে, বাবুটি কোন বিষয়ের সন্ধানে আসিয়াছেন। বলিলেন, "কি কথা মহাশয়?"

মাধব। ব্রহ্মানন্দকে আপনি চিনেন?

পোষ্ট। চিনি না—চিনি—ভাল চিনি না।

মাধবীনাথ বুঝিলেন, অবতার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে। বলিলেন, "আপনার ডাকঘরে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের নামে কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে?"

পোষ্ট। আপনার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ ঘোষের আলাপ নাই?

মাধ। থাক বা না থাক, কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে আপনার কাছে আসিয়াছি।

পোষ্ট মাষ্টার বাবু তখন আপনার উচ্চ পদ এবং ডেপুটি অভিধান স্মরণপূর্ব্বক অতিশয় গম্ভীর হইয়া বসিলেন, এবং অল্প রুষ্টভাবে বলিলেন, "ডাকঘরের খবর আমাদের বলিতে বারণ আছে।" ইহা বলিয়া পোষ্ট মাষ্টার নীরবে চিঠি ওজন করিতে লাগিলেন।

মাধবীনাথ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, "ওহে বাপু, তুমি অমনি কথা কবে না, তা জানি। সে জন্য কিছু সঙ্গেও আনিয়াছি—কিছু দিয়া যাইব—এখন যা যা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক বল দেখি—"

তখন, পোষ্ট বাবু হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিলেন, "কি কন?"

মা। কই এই, ব্রহ্মানন্দের নামে কোন চিঠিপত্র ডাকঘরে আসিয়া থাকে?

পো। আসে।

মা। কত দিন অন্তর?

পো। যে কথাটি বলিয়া দিলাম, তাহার এখনও টাকা পাই নাই। আগে তার টাকা বাহির করুন; তবে নূতন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

মাধবীনাথের ইচ্ছা ছিল, পোষ্ট মাষ্টারকে কিছু দিয়া যান। কিন্তু তাহার চরিত্রে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন, "বাপু, তুমি ত বিদেশী মানুষ দেখ্‌ছি—আমায় চেন কি?"

পোষ্ট মাষ্টার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না। তা আপনি যেই হউন না কেন—আমরা কি পোষ্ট আপিসের খবর যাকে তাকে বলি? কে তুমি।”

মা। আমার নাম মাধবীনাথ সরকার—বাড়ী রাজগ্রাম। আমার পাল্লায় কত লাঠিয়াল আছে খবর রাখ?

পোষ্ট বাবুর ভয় হইল—মাধবী বাবুর নাম ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ শুনিয়াছিলেন। পোষ্ট বাবু একটু চুপ করিলেন।

মাধবীনাথ বলিতে লাগিলেন, “আমি যাহা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—সত্য সত্য জবাব দাও। কিছু তঞ্চক করিও না। করিলে তোমায় কিছু দিব না—এক পয়সাও নহে। কিন্তু যদি না বল, মিছা বল, তবে তোমার ঘরে আগুন দিব, তোমার ডাকঘর লুঠ করিব; আদালতে প্রমাণ করাইব যে, তুমি নিজে লোক দিয়া সরকারী টাকা অপহরণ করিয়াছ—কেমন, এখন বলিবে?”

পোষ্ট বাবু থরহরি কাঁপিতে লাগিলেন—বলিলেন, “আপনি রাগ করেন কেন? আমি ত আপনাকে চিনিতাম না, বাজে লোক মনে করিয়াই ওরূপ বলিয়াছিলাম—আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা বলিব।”

মা। কত দিন অন্তর ব্রহ্মানন্দের চিঠি আসে?

পোষ্ট। প্রায় মাসে মাসে—ঠিক ঠাওর নাই।

মা। তবে রেজিষ্টরি হইয়াই চিঠি আসে?

পোষ্ট। হাঁ—প্রায় অনেক চিঠিই রেজিষ্টরি করা।

মা। কোন্ আপিস হইতে রেজিষ্টরি হইয়া আইসে?

পোষ্ট। মনে নাই।

মা। তোমার আপিসে একখানা করিয়া রসিদ থাকে না?

পোষ্ট মাষ্টার রসিদ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। একখানা পড়িয়া বলিলেন, “প্রসাদপুর”। “প্রসাদপুর কোন্ জেলা? তোমাদের লিষ্টি দেখ।”

পোষ্ট মাষ্টার কাঁপিতে কাপিতে ছাপান লিষ্টি দেখিয়া বলিল, “যশোর।”

মা। দেখ, তবে আর কোথা কোথা হইতে রেজিষ্টরি চিঠি উহার নামে আসিয়াছে। সব রসিদ দেখ।

পোষ্ট বাবু দেখিলেন, ইদানীন্তন যত পত্র আসিয়াছে, সকলই প্রসাদপুর হইতে। মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টার বাবুর কম্পমান হস্তে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখনও হরিদাস বাবাজির হুঁকা জুটিয়া উঠে নাই। মাধবীনাথ হরিদাসের জন্যও একটি টাকা রাখিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে, পোষ্ট বাবু তাহা আত্মসাৎ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাধবীনাথ হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন। মাধবীনাথ, গোবিন্দলাল ও রোহিণীর অধঃপতনকাহিনী সকলই লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, রোহিণী গোবিন্দলাল এক স্থানেই গোপনে বাস করিতেছে। ব্রহ্মানন্দের অবস্থাও তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন—জানিতেন যে, রোহিণী ভিন্ন তাঁহার আর কেহই নাই। অতএব যখন পোষ্ট আপিসে জানিলেন যে, ব্রহ্মানন্দের নামে মাসে মাসে রেজিষ্টরি হইয়া চিঠি আসিতেছে—তখন বুঝিলেন যে, হয় রোহিণী, নয় গোবিন্দলাল তাঁহাকে মাসে মাসে খরচ পাঠায়। প্রসাদপুর হইতে চিঠি আসে, অতএব উভয়েই প্রসাদপুরে কিম্বা তাহার নিকটবর্তী কোন স্থানে অবশ্য বাস করিতেছে, কিন্তু নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য তিনি কন্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়াই ফাঁড়িতে একটি লোক পাঠাইলেন। সাব্ ইন্‌স্পেক্টরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, একটি কন্‌ষ্টেবল পাঠাইবেন, বোধ হয় কতকগুলি চোরা মাল ধরাইয়া দিতে পারিব।

সাব্ ইন্‌স্পেক্টর, মাধবীনাথকে বিলক্ষণ জানিতেন—ভয়ও করিতেন পত্রপ্রাপ্তি মাত্র নিদ্রাসিংহ কন্‌ষ্টেবলকে পাঠাইয়া দিলেন।

মাধবীনাথ নিদ্রাসিংহের হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিলেন, "বাপু হে—হিন্দি মিন্দি কইও না—যা বলি, তাই কর। ঐ গাছতলায় গিয়া, লুকাইয়া থাক। কিন্তু এমন ভাবে গাছতলায় দাঁড়াইবে, যেন এখান হইতে তোমাকে দেখা যায়। আর কিছু করিতে হইবে না।" নিদ্রাসিংহ স্বীকৃত হইয়া বিদায় হইল। মাধবীনাথ তখন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মানন্দ আসিয়া নিকটে বসিল। তখন আর কেহ সেখানে ছিল না।

পরস্পরে স্বাগত জিজ্ঞাসার পর মাধবীনাথ বলিলেন, "মহাশয় আমার স্বর্গীয় বৈবাহিক মহাশয়ের বড় আত্মীয় ছিলেন। এখন তাঁহারা ত কেহ নাই—আমার জামাতাও বিদেশস্থ। আপনার কোন বিপদ্ আপদ পড়িলেই আমাদিগকেই দেখিতে হয়—তাই আপনাকে ডাকাইয়াছি।"

ব্রহ্মানন্দের মুখ শুকাইল। বলিল, "বিপদ্ কি মহাশয়?" মাধবীনাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আপনি কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত বটে।"

ব্র। "কি বিপদ্ মহাশয়?"

মা। বিপদ্ সমূহ। পুলিশে কি প্রকারে নিশ্চয় জানিয়াছে যে, আপনার কাছে একখানা চোরা নোট আছে।

ব্রহ্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল। "সে কি! আমার কাছে চোরা নোট!"

মা। তোমার জানা, চোরা না হইতে পারে। অন্যে তোমাকে চোরা নোট দিয়াছে, তুমি না জানিয়া তুলিয়া রাখিয়াছ।

ব্র। সে কি মহাশয়! আমাকে নোট কে দিবে?

মাধবীনাথ তখন আওয়াজ ছোট করিয়া বলিলেন, "আমি সকলই জানিয়াছি—পুলিশেও জানিয়াছে! বাস্তবিক পুলিশের কাছেই এ কথা শুনিয়াছি। চোরা নোট প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে। ঐ দেখ একজন পুলিশের কন্‌ষ্টেবল আসিয়া তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছে—আমি তাহাকে কিছু দিয়া আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছি।"

মাধবীনাথ তখন বৃক্ষতলবিহারী রুলধারী গুম্ফশ্মশ্রু-শোভিত জলধরসন্নিভ কন্‌ষ্টেবলের কান্তমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন।

ব্রহ্মানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল। মাধবীনাথের পায়ে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল, "আপনি রক্ষা করুন।"

মা। ভয় নাই। এবার প্রসাদপুর হইতে কোন্ কোন্ নম্বরের নোট পাইয়াছ, বল দেখি। পুলিশের লোক আমার কাছে নোটের নম্বর রাখিয়া গিয়াছে। যদি সে নম্বরের নোট না হয়, তবে ভয় কি? নম্বর বদলাইতে কতক্ষণ? এবারকার প্রসাদপুরের পত্রখানি লইয়া আইস দেখি—নোটের নম্বর দেখি।

ব্রহ্মানন্দ যায় কি প্রকারে? ভয় করে—কন্‌ষ্টেবল যে গাছতলায়।

মাধবীনাথ বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি।" মাধবীনাথের আদেশমত একজন দ্বারবান ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে গেল। ব্রহ্মানন্দ রোহিণীর পত্র লইয়া আসিলেন। সেই পত্রে, মাধবীনাথ যাহা যাহা খুঁজিতেছিলেন, সকলই পাইলেন।

পত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "এ নম্বরের নোট নহে। কোন ভয় নাই—তুমি ঘরে যাও। আমি কন্‌ষ্টেবলকে বিদায় করিয়া দিতেছি।"

ব্রহ্মানন্দ মৃতদেহে প্রাণ পাইল। ঊর্দ্ধশ্বাসে তথা হইতে পলায়ন করিল।

মাধবীনাথ কন্যাকে চিকিৎসার্থ স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তাহার চিকিৎসার্থ উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া দিয়া, স্বয়ং কলিকাতায় চলিলেন। ভ্রমর অনেক আপত্তি করিল—মাধবীনাথ শুনিলেন না। শীঘ্রই আসিতেছি, এই বলিয়া কন্যাকে প্রবোধ দিয়া গেলেন।

কলিকাতায় নিশাকর দাস নামে মাধবীনাথের একজন বড় আত্মীয় ছিলেন।

নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। নিশাকর কিছু করেন না—পৈতৃক বিষয় আছে—কেবল একটু একটু গীতবাদ্যের অনুশীলন করেন। নিষ্কর্ম্মা বলিয়া সর্ব্বদা পর্য্যটনে গমন করিয়া থাকেন। মাধবীনাথ তাঁহার কাছে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য কথার পর নিশাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে, বেড়াইতে যাইবে?"

নিশা। কোথায়?

মা। যশোর।

নি। সেখানে কেন?

মা। নীলকুঠি কিনব।

নি। চল।

তখন বিহিত উদ্যোগ করিয়া দুই বন্ধু দুই এক দিনের মধ্যে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে প্রসাদপুর যাইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেখ, ধীরে ধীরে শীর্ণশরীরা চিত্রানদী বহিতেছে—তীরে অশ্বত্থ কদম্ব আম্র খর্জ্জুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোভিত উপবনে কোকিল দয়েল পাপিয়া ডাকিতেছে। নিকটে গ্রাম নাই; প্রসাদপুর নামে একটি ক্ষুদ্র বাজার প্রায় এক ক্রোশ পথ দূর। এখানে মনুষ্যসমাগম নাই দেখিয়া নিঃশঙ্কে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া পূর্ব্বকালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক নীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে নীলকর এবং তাহার ঐশ্বর্য্য ধ্বংসপুরে প্রয়াণ করিয়াছে—তাহার আমীন তাগাদগীর নায়েব গোমস্তা সকলে উপযুক্ত স্থানে স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগ করিতেছেন। একজন বাঙ্গালী সেই জনশূন্য প্রান্তরস্থিত রম্য অট্টালিকা ক্রয় করিয়া, তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পুষ্পে, প্রস্তরপুত্তলে, আসনে, দর্পণে, চিত্রে, গৃহ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অভ্যন্তরে দ্বিতলস্থ বৃহৎ কক্ষমধ্যে আমরা প্রবেশ করি। কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র—কিন্তু কতকগুলি সুরুচিবিগর্হিত—অবর্ণনীয়। নির্ম্মল সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়া একজন শ্মশ্রুধারী মুসলমান একটা তম্বুরার কাণ মুচড়াইতেছে—কাছে বসিয়া এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্বর্ণালঙ্কার ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিতেছে—পার্শ্বস্থ প্রাচীরবিলম্বী দুইখানি বৃহৎ দর্পণে উভয়ের ছায়াও ঐরূপ করিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া, একজন যুবা পুরুষ নবেল পড়িতেছেন এবং মধ্যস্থ মুক্ত দ্বারপথে যুবতীর কার্য্য দেখিতেছেন।

তম্বুরার কাণ মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়িধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও আর তবলার খ্যান্ খ্যান্ ওস্তাদজীর বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল—তখন তিনি সেই গুম্ফশ্মশ্রুর অন্ধকারমধ্য হইতে কতকগুলি তুষারধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া, বৃষভদুর্ল্লভ কণ্ঠরব বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন। রব নির্গত করিতে করিতে সে তুষারধবল দন্তগুলি বহুবিধ খিচুনিতে পরিণত হইতে লাগিল; এবং ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাশি তাহার অনুবর্ত্তন করিয়া নানাপ্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল। তখন যুবতী খিচুনিসন্তাড়িত হইয়া সেই বৃষভদুর্ল্লভ রবের সঙ্গে আপনার কোমল কণ্ঠ মিশাইয়া গীত আরম্ভ করিল—তাহাতে সরু মোটা আওয়াজে, সোণালি রূপালি রকম একপ্রকার গীত হইতে লাগিল।

এইখানে যবনিকা পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব। কিন্তু তথাপি সেই অশোক বকুল কুটজ কুরুবক কুঞ্জমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকূজন, সেই ক্ষুদ্র-নদীতরঙ্গচালিত রাজহংসের কলনাদ, সেই যূথী জাতি মল্লিকা মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নীলকাচপ্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব্ব মাধুরী, সেই রজতস্ফটিকাদিনির্ম্মিত পুষ্পাধারে সুবিন্যস্ত কুসুমগুচ্ছের শোভা, সেই গৃহশোভাকারী দ্রব্যজাতের বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণ আর সেই গায়কের বিশুদ্ধ-স্বরসপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টি, এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম। কেন না, যে যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে, তাহার হৃদয়ে ঐ কটাক্ষের মাধুর্য্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

এই যুবা গোবিন্দলাল—ঐ যুবতী রোহিণী। এই গৃহ গোবিন্দলাল ক্রয় করিয়াছেন। এইখানেই ইহারা স্থায়ী।

অকস্মাৎ রোহিণীর তবলা বেসুরা বলিল। ওস্তাদজীর তম্বুরার তার ছিঁড়িল, তার গলায় বিষম লাগিল—গীত বন্ধ হইল; গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়া গেল। সেই সময় সেই প্রমোদগৃহের দ্বারে একজন অপরিচিত যুবা পুরুষ প্রবেশ করিল। আমরা তাহাকে চিনি—সে নিশাকর দাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বিতল অট্টালিকার উপরতলে রোহিণীর বাস—তিনি হাপ পরদানসীন্। নীচেরতলে ভৃত্যগণ বাস করে। সে বিজনমধ্যে প্রায় কেহই কখনও গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত না—সুতরাং সেখানে বহির্ব্বাটীর প্রয়োজন ছিল না। কালে ভদ্রে কোন দোকানদার বা অপর কেহ আসিত, উপরে বাবুর

কাছে সংবাদ যাইত; বাবু নীচে আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। অতএব বাবুর বসিবার জন্য নীচেও একটি ঘর ছিল।

নিম্নতলে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া নিশাকর দাস কহিলেন, "কে আছ গা এখানে?"

গোবিন্দলালের সোণা রূপো নামে দুই ভৃত্য ছিল। মনুষ্যের শব্দে দুই জনেই দ্বারের নিকট আসিয়া নিশাকরকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। নিশাকরকে দেখিয়াই বিশেষ ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইল—নিশাকরও বেশভূষা সম্বন্ধে একটু জাঁক করিয়া গিয়াছেন। সেরূপ লোক কখনও সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই—দেখিয়া ভৃত্যেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। সোণা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কাকে খুঁজেন?"

নিশা। তোমাদেরই। বাবুকে সংবাদ দাও যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

সোণা। কি নাম বলিব?

নিশা। নামের প্রয়োজনই বা কি? একটি ভদ্রলোক বলিয়া বলিও।

এখন, চাকরেরা জানিত যে, কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবু সাক্ষাৎ করেন না—সেরূপ স্বভাবই নয়। সুতরাং চাকরেরা সংবাদ দিতে বড় ইচ্ছুক ছিল না। সোণা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রূপো বলিল, "আপনি অনর্থক আসিয়াছেন—বাবু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।"

নিশা। তবে তোমরা থাক—আমি বিনা সংবাদেই উপরে যাইতেছি।

চাকরেরা ফাঁপরে পড়িল। বলিল, "না মহাশয়, আমাদের চাকরি যাবে।"

নিশাকর তখন একটি টাকা বাহির করিয়া বলিলেন, "যে সংবাদ করিবে, তাহার এই টাকা।"

সোণা ভাবিতে লাগিল—রূপো চিলের মতো ছোঁ মারিয়া নিশাকরের হাত হইতে টাকা লইয়া উপরে সংবাদ দিতে গেল।

গৃহটি বেষ্টন করিয়া যে পুষ্পোদ্যান আছে, তাহা অতি মনোরম। নিশাকর সোণাকে বলিলেন, "আমি এ ফুলবাগানে বেড়াইতেছি—আপত্তি করিও না—যখন সংবাদ আসিবে, তখন আমাকে ঐখান হইতে ডাকিয়া আনিও।" এই বলিয়া নিশাকর সোণার হাতে আর একটি টাকা দিলেন।

রূপো যখন বাবুর কাছে গেল, তখন বাবু কোন কার্য্যবশতঃ অনবসর ছিলেন, [illegible] তাঁহাকে নিশাকরের সংবাদ কিছুই বলিতে পারিল না। এ দিকে [illegible]

ভ্রমণ করিতে করিতে নিশাকর একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, এক পরমা সুন্দরী জানেলায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছে।

রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া ভাবিতেছিল, "এ কে? দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, এ দেশের লোক নয়। বেশভূষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা যাইতেছে, বড় মানুষ বটে। দেখিতেও সুপুরুষ—গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নয়। গোবিন্দলালের রঙ ফরসা—কিন্তু এর মুখ চোখ ভাল। বিশেষ চোখ—আ মরি! কি চোখ! এ কোথা থেকে এলো? হলুদগাঁয়ের লোক ত নয়—সেখানকার সবাইকে চিনি। ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাই না? ক্ষতি কি—আমি ত কখনও গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।"

রোহিণী এইরূপ ভাবিতেছিল, এমত সময়ে নিশাকর উন্নতমুখে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করাতে চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল। চক্ষে চক্ষে কোন কথাবার্ত্তা হইল কি না, তাহা আমরা জানি না—জানিলেও বলিতে ইচ্ছা করি না—কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, এমত কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে।

এমত সময়ে রূপো বাবুর অবকাশ পাইয়া বাবুকে জানাইল যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,"কোথা হইতে আসিয়াছে?"

রূপো। তাহা জানি না।

বাবু। তা না জিজ্ঞাসা করে খবর দিতে আসিয়াছিস্ কেন?

রূপো দেখিল, বোকা বনিয়া যাই। উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বলিল, "তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, বাবুর কাছেই বলিব।"

বাবু বলিলেন, "তবে বল গিয়া, সাক্ষাৎ হইবে না।"

এদিকে নিশাকর বিলম্ব দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, বুঝি গোবিন্দলাল সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু দুষ্কৃতকারীর সঙ্গে ভদ্রতা কেনই করি? আমি কেন আপনিই উপরে চলিয়া যাই না?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভৃত্যের পুনরাগমনের প্রতীক্ষা না করিয়াই নিশাকর গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সোণা রূপো কেহই নীচে নাই। তখন তিনি নিরুদ্বেগে সিঁড়িতে উঠিয়া, যেখানে গোবিন্দলাল, রোহিণী এবং দানেশ খাঁ গায়ক, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। রূপো তাঁহাকে দেখিয়া দেখাইয়া দিল যে, এই বাবু সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছিলেন।

গোবিন্দলাল বড় রুষ্ট হইলেন। কিন্তু দেখিলেন, ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

নি। আমার নাম রাসবিহারী দে।

গো। নিবাস?

নি। বরাহনগর।

নিশাকর জাঁকিয়া বসিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে, গোবিন্দলাল বসিতে বলিবেন না।

গো। আপনি কাকে খুঁজেন?

নি। আপনাকে।

গো। আপনি আমার ঘরের ভিতর জোর করিয়া প্রবেশ না করিয়া যদি একটু অপেক্ষা করিতেন, তবে চাকরের মুখে শুনিতেন যে, আমার সাক্ষাতের অবকাশ নাই।

নি। বিলক্ষণ অবকাশ দেখিতেছি। ধমকে.চমকে উঠিয়া যাইব, যদি আমি সে প্রকৃতির লোক হইতাম, তবে আপনার কাছে আসিতাম না। যখন আমি আসিয়াছি, তখন আমার কথা কয়টা শুনিলেই আপদ্ চুকিয়া যায়।

গো। না শুনি, ইহাই আমার ইচ্ছা। তবে যদি দুই কথায় বলিয়া শেষ করিতে পারেন, তবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করুন।

নি। দুই কথাতেই বলিব। আপনার ভার্য্যা ভ্রমর দাসী তাঁহার বিষয়গুলি পত্তনী বিলি করিবেন।

দানেশ খাঁ গায়ক তখন তম্বুরায় নূতন তার চড়াইতেছিল। সে এক হাতে তার চড়াইতে লাগিল, এক হাতে আঙ্গুল ধরিয়া বলিল, "এক বাত হুয়া।"

নি। আমি তাহা পত্তনী লইব।

দানেশ আঙ্গুল গণিয়া বলিল, "দো বাত হুয়া।"

নি। আমি সেজন্য আপনাদিগের হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে গিয়াছিলাম।

দানেশ খাঁ বলিল, "দো বাত ছোড়্‌কে তিন বাত হুয়া।"

নি। ওস্তাদজী গুয়ার গুণচো না কি?

ওস্তাদজী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গোবিন্দলালকে বলিলেন, "বাবু সাহাব, ইয়ে বেতমিজ আদমিকো বিদা দিজিয়ে।"

কিন্তু বাবুসাহেব তখন অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন, কথা কহিলেন না।

নিশাকর বলিতে লাগিলেন, "আপনার ভার্য্যা আমাকে বিষয়গুলি পত্তনী দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার অনুমতি সাপেক্ষ। তিনি আপনার ঠিকানাও জানেন না; পত্রাদি লিখিতেও ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং আপনার অভিপ্রায় জানিবার ভার আমার উপরেই পড়িল। আমি অনেক সন্ধানে আপনার ঠিকানা জানিয়া, আপনার অনুমতি লইতে আসিয়াছি।"

গোবিন্দলাল কোন উত্তর করিলেন না—বড় অন্যমনস্ক! অনেক দিনের পর ভ্রমরের কথা শুনিলেন—তাঁহার সেই ভ্রমর!! প্রায় দুই বৎসর হইল!

নিশাকর কতক কতক বুঝিলেন। পুনরপি বলিলেন, "আপনার যদি মত হয়, তবে এক ছত্র লিখিয়া দিন যে, আপনার কোন আপত্তি নাই। তাহা হইলেই আমি উঠিয়া যাই।"

গোবিন্দলাল কিছুই উত্তর করিলেন না। নিশাকর বুঝিলেন, আবার বলিতে হইল। আবার আসল কথাগুলি বুঝাইয়া বলিলেন। গোবিন্দলাল এবার চিত্ত সংযত করিয়া কথা সকল শুনিলেন। নিশাকরের সকল কথাই যে মিথ্যা, তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা কিছুই বুঝেন নাই। পূর্ব্বকার উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার অনুমতি লওয়া অনাবশ্যক। বিষয় আমার স্ত্রীর, আমার নহে, বোধ হয় তাহা জানেন। তাঁহার যাহাকে ইচ্ছা পত্তনী দিবেন, আমার বিধি নিষেধ নাই। আমি কিছু লিখিব না। বোধ হয় এখন আপনি আমাকে অব্যাহতি দিবেন।"

কাজে কাজেই নিশাকরকে উঠিতে হইল। তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। নিশাকর গেলে, গোবিন্দলাল দানেশ খাঁকে বলিলেন, "কিছু গাও।"

দানেশ খাঁ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, আবার তম্বুরায় সুর বাঁধিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি গাহিব?"

"যা খুসি।" বলিয়া গোবিন্দলাল তবলা লইলেন। গোবিন্দলাল পূর্ব্বেই কিছু কিছু বাজাইতে জানিতেন, এক্ষণে উত্তম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন; কিন্তু আজি দানেশ খাঁর সঙ্গে তাঁহার সঙ্গত হইল না; সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল। দানেশ খাঁ বিরক্ত হইয়া তম্বুরা ফেলিয়া গীত বন্ধ করিয়া বলিল, "আজ আমি ক্লান্ত হইয়াছি।" তখন গোবিন্দলাল একটা সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গৎ সব ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। সেতার ফেলিয়া নবেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাহা পড়িতেছিলেন, তাহার অর্থবোধ হইল না। তখন বহি ফেলিয়া গোবিন্দলাল শয়নগৃহমধ্যে গেলেন। রোহিণীকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু সোণা চাকর নিকটে ছিল। দ্বার হইতে গোবিন্দলাল, সোণাকে বলিলেন, "আমি এখন একটু ঘুমাইব, আমি আপনি না উঠিলে আমাকে কেহ যেন উঠায় না।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল শয়নঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল ত ঘুমাইল না, খাটে বসিয়া, দুই হাত মুখে দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কেন যে কাঁদিল, তাহা জানি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিল, কি নিজের জন্য কাঁদিল, তা বলিতে পারি না। বোধ হয় দুইই।

আমরা ত কান্না বৈ গোবিন্দলালের অন্য উপায় দেখি না। ভ্রমরের জন্য কাঁদিবার পথ আছে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় নাই। হরিদ্রাগ্রামে আর মুখ দেখাইবার কথা নাই। হরিদ্রাগ্রামের পথে কাঁটা পড়িয়াছে। কান্না বৈ ত আর উপায় নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যখন নিশাকর আসিয়া বড় হলে বসিল, রোহিণীকে সুতরাং পাশের কামরায় প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নয়নের অন্তরাল হইল মাত্র—শ্রবণের নহে। কথোপকথন যাহা হইল—সকলই কাণ পাতিয়া শুনিল। বরং দ্বারের পরদাটি একটু সরাইয়া, নিশাকরকে দেখিতে লাগিল। নিশাকরও দেখিল যে, পরদার পাশ হইতে একটি পটলচেরা চোখ তাকে দেখিতেছে।

রোহিণী শুনিল যে, নিশাকর অথবা রাসবিহারী হরিদ্রাগ্রাম হইতে আসিয়াছে। রূপো চাকরও রোহিণীর মত সকল কথা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। নিশাকর উঠিয়া গেলেই রোহিণী পরদার পাশ হইতে মুখ বাহির করিয়া আঙ্গুলের ইশারায় রূপোকে ডাকিল। রূপো কাছে আসিলে, তাহাকে কাণে কাণে বলিল, "যা বলি তা পারবি? বাবুকে সকল কথা লুকাইতে হইবে। যাহা করিবি তাহা যদি বাবু কিছু না জানিতে পারেন, তবে তোকে পাঁচ টাকা বখ্‌শিস দিব।"

রূপো মনে ভাবিল—আজ না জানি উঠিয়া কার মুখ দেখিয়াছিলাম—আজ ত দেখ্‌ছি টাকা রোজকারের দিন। গরীব মানুষের দুই পয়সা এলেই ভাল। প্রকাশ্যে বলিল, "যা বলিবেন তাই পারিব। কি, আজ্ঞা করুন।"

রো। ঐ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া যা। উনি আমার বাপের বাড়ীর দেশ থেকে এসেছেন। সেখানকার কোন সংবাদ আমি কখনও পাই না—তার জন্য কত কাঁদি। যদি দেশ থেকে একটি লোক এসেছে, তাকে একবার আপনার জনের দুটো খবর জিজ্ঞাসা করবো। বাবু ত রেগে ওকে উঠিয়ে দিলেন। তুই গিয়ে তাকে বসা। এমন যায়গায় বসা, যেন বাবু নীচে গেলে না দেখতে পান। আর কেহ না দেখিতে পায়। আমি একটু নিরিবিলি পেলেই যাব। যদি বস্‌তে না চায়, তবে কাকুতি মিনতি করিস্।

রূপো বখ্‌শিসের গন্ধ পাইয়াছে—‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া ছুটিল।

নিশাকর কি অভিপ্রায়ে গোবিন্দলালকে ছলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি নীচে আসিয়া যেরূপ আচরণ করিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধিমানে দেখিলে তাঁহাকে বড় অবিশ্বাস করিত। তিনি গৃহপ্রবেশদ্বারের কবাট, খিল, কব্জা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। এমত সময়ে রূপো খানসামা আসিয়া উপস্থিত হইল।

রূপো বলিল, “তামাকু ইচ্ছা করিবেন কি ?”

নিশা। বাবু ত দিলেন না, চাকরের কাছে খাব কি ?

রূপো। আজ্ঞে তা নয়—একটা নিরিবিলি কথা আছে। একটু নিরিবিলিতে আসুন।

রূপো নিশাকরকে সঙ্গে করিয়া আপনার নির্জ্জন ঘরে লইয়া গেল। নিশাকরও বিনা ওজর আপত্তিতে গেলেন। সেখানে নিশাকরকে বসিতে দিয়া, যাহা যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, রূপচাঁদ তাহা বলিল।

নিশাকর আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির অতি সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, “বাপু, তোমার মনিব ত আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি তাঁর বাড়ীতে লুকাইয়া থাকি কি প্রকারে ?”

রূপো। আজ্ঞে তিনি কিছু জানিতে পারিবেন না। এ ঘরে তিনি কখনও আসেন না।

নিশা। না আসুন, কিন্তু যখন তোমার মা ঠাকুরাণী নীচে আসিবেন, তখন যদি তোমার বাবু ভাবেন, কোথায় গেল দেখি ? যদি তাই ভাবিয়া পিছু পিছু আসেন, কি কোন রকমে যদি আমার কাছে তোমার মা ঠাকুরাণীকে দেখেন, তবে আমার দশাটা কি হবে বল দেখি ?

রূপচাঁদ চুপ করিয়া রহিল। নিশাকর বলিতে লাগিলেন, “এই মাঠের মাঝখানে, ঘরে পুরিয়া আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পুঁতিয়া রাখিলেও আমার মা বল্‌তে নাই, বাপ বল্‌তেও নাই। তখন তুমিই আমাকে দু ঘা লাঠি মারিবে। —অতএব এমন কাজে আমি নাই। তোমার মাকে বুঝাইয়া বলিও যে, আমি ইহা পারিব না। আর একটি কথা বলিও। তাঁহার খুড়া আমাকে কতকগুলি অতি ভারি কথা বলিতে বলিয়া দিয়াছিল। আমি তোমার মা ঠাকুরাণীকে সে কথা বলিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু তোমার বাবু আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমার বলা হইল না, আমি চলিলাম।”

রূপো দেখিল, পাঁচ টাকা হাত ছাড়া হয়। বলিল, "আচ্ছা, তা এখানে না বসেন, বাহিরে একটু তফাতে বসিতে পারেন না?"

নিশা। আমিও সেই কথা ভাবতেছিলাম। আসিবার সময় তোমাদের কুঠির নিকটেই নদীর ধারে, একটা বাঁধা ঘাট, তাহার কছে দুইটা বকুল গাছ দেখিয়া আসিয়াছি। চেন সে জায়গা?

রূপো। চিনি।

নিশা। আমি গিয়া সেইখানে বসিয়া থাকি। সন্ধ্যা হইয়াছে—রাত্রি হইলে, সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না। তোমার মা ঠাকুরাণী যদি সেইখানে আসিতে পারেন, তবেই সকল সংবাদ পাইবেন। তেমন তেমন দেখিলে, আমি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। ঘরে পুরিয়া যে আমাকে কুক্কুর মারা করিবে, আমি তাহাতে বড় রাজি নহি।

অগত্যা রূপো চাকর রোহিণীর কাছে গিয়া নিশাকর যেমন যেমন বলিল, তাহা নিবেদন করিল। এখন রোহিণীর মনের ভাব কি, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন মানুষ নিজে নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারে না—আমরা কেমন করিয়া বলিব যে, রোহিণীর মনের ভাব এই? রোহিণী যে ভ্রহ্মানন্দকে এত ভালবাসিত যে, তাহার সংবাদ লইবার জন্য দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্যা হইবে, এমন খবর আমরা রাখি না। বুঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি, আঁচাআঁচি হইয়াছিল। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, নিশাকর রূপবান্—পটলচেরা চোখ। রোহিণী দেখিয়াছিল যে, মনুষ্যমধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না। কিন্তু বিশ্বাসহানি এক কথা—আর এ আর এক কথা। বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, "অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ ব্যাধব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?" ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে? বাঘ গোরু মারে,—সকল গোরু খায় না। স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে—কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য। অনেকে মাছ ধরে—কেবল মাছ ধরিবার জন্য, মাছ খায় না, বিলাইয়া দেয়—অনেকে পাখী মারে, কেবল মারিবার জন্য—মারিয়া ফেলিয়া দেয়। শিকার কেবল শিকারের জন্য—খাইবার জন্য নহে। জানি না, তাহাতে কি রস আছে। রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর কাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেন না তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই। জানি না, এই পাপীয়সীর পাপচিত্তে কি উদয় হইয়াছিল—কিন্তু রোহিণী স্বীকৃত হইল যে, প্রদোষকালে অবকাশ পাইলেই,

গোপনে চিত্রার বাঁধাঘাটে একাকিনী সে নিশাকরের নিকট গিয়া খুল্লতাতের সংবাদ শুনিবে।

রূপচাঁদ আসিয়া সে কথা নিশাকরের কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়া, ধীরে ধীরে আসিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে গাত্রোত্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রূপো সরিয়া গেলে নিশাকর সোণাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বাবুর কাছে কত দিন আছ?"

সোণা। এই—যত দিন এখানে এসেছেন তত দিন আছি।

নিশা। তবে অল্পদিনই? পাও কি?

সোণা। তিন টাকা মাহিয়ানা, খোরাক পোষাক।

নিশা। এত অল্প বেতনে তোমাদের মত খানসামার পোষায় কি?

কথাটা শুনিয়া সোণা খানসামা গলিয়া গেল। বলিল, "কি করি, এখানে আর কোথায় চাকরি যোটে?"

নিশা। চাকরির ভাবনা কি? আমাদের দেশে গেলে তোমাদের লুপে নেয়। পাঁচ, সাত, দশ টাকা অনায়াসেই মাসে পাও।

সোণা। অনুগ্রহ করিয়া যদি সঙ্গে লইয়া যান।

নিশা। নিয়ে যাব কি, অমন মুনিবের চাকরি ছাড়্‌বে?

সোণা। মুনিব মন্দ নয়, কিন্তু মুনিব ঠাকুরুণ বড় হারামজাদা।

নিশা। হাতে হাতে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমার সঙ্গে তোমার যাওয়াই স্থির ত?

সোণা। স্থির বৈ কি?

নিশা। তবে যাবার সময় তোমার মুনিবের একটি উপকার করিয়া যাও। কিন্তু বড় সাবধানের কাজ। পারবে কি?

সোণা। ভাল কাজ হয় ত পারব না কেন?

নিশা। তোমার মুনিবের পক্ষে ভাল, মুনিবনীর পক্ষে বড় মন্দ।

সোণা। তবে এখনই বলুন, বিলম্বে কাজ নাই। তাতে আমি বড় রাজি।

নিশা। ঠাকরুণটি আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, চিত্রার বাঁধাঘাটে বসিয়া থাকিতে, রাত্রে আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করিবেন। বুঝেছ? আমিও স্বীকার হইয়াছি। আমার অভিপ্রায় যে, তোমার মুনিবের চোখ ফুটায়ে দিই। তুমি আস্তে আস্তে কথাটি তোমার মুনিবকে জানিয়ে আসিতে পার?

সোণা। এখনি—ও পাপ মলেই বাঁচি।

নিশা। এখন নয়, এখন আমি ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকি। তুমি সতর্ক থেকো। যখন দেখ্‌বে, ঠাকুরুণটি ঘাটের দিকে চলিলেন, তখন গিয়া তোমার মুনিবকে বলিয়া দিও। রূপো কিছু জানিতে না পারে। তার পর আমার সঙ্গে জুটো।

"যে আজ্ঞে" বলিয়া সোণা নিশাকরের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল। তখন নিশাকর হেলিতে দুলিতে গজেন্দ্রগমনে চিত্রাতীরশোভী সোপানাবলীর উপর গিয়া বসিলেন। অন্ধকারে নক্ষত্রচ্ছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। চারিদিকে শৃগাল-কুক্কুরাদি বহুবিধ রব করিতেছে। কোথাও দূরবর্ত্তী নৌকার উপর বসিয়া ধীবর উচ্চৈঃস্বরে শ্যামাবিষয় গায়িতেছে। তদ্ভিন্ন সেই বিজন প্রান্তর মধ্যে কোন শব্দ শোনা যাইতেছে না। নিশাকর সেই গীত শুনিতেছেন এবং গোবিন্দলালের বাসগৃহের দ্বিতল কক্ষের বাতায়ননিঃসৃত উজ্জ্বল দীপালোক দর্শন করিতেছেন। এবং মনে মনে ভাবিতেছেন, "আমি কি নৃশংস! একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি! অথবা নৃশংসতাই বা কি? দুষ্টের দমন অবশ্যই কর্ত্তব্য। যখন বন্ধুর কন্যার জীবনরক্ষার্থ এ কার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ্য করিব। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। রোহিণী পাপীয়সী, পাপের দণ্ড দিব; পাপস্রোতের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম না। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে। আর পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার পাপ পুণ্যের যিনি দণ্ড পুরস্কার করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত্তা। বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি জানি,

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রহরাতীত হইল। তখন নিশাকর দেখিলেন, নিঃশব্দ পাদবিক্ষেপে রোহিণী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য নিশাকর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা?"

রোহিণীও নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জন্য বলিল, "তুমি কে?"

নিশাকর বলিল, "আমি রাসবিহারী।"

রোহিণী বলিল, "আমি রোহিণী।"

নিশাকর। এত রাত্রি হলো কেন?

রোহিণী। একটু না দেখে শুনে ত আস্‌তে পারি নে। কি জানি কে কোথা দিয়ে দেখতে পাবে। তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে।

নিশা। কষ্ট হোক্ না হোক্, মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি ভুলিয়া গেলে।

রোহিণী। আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন হইবে কেন? একজনকে ভুলিতে না পারিয়া এদেশে আসিয়াছি; আর আজ তোমাকে না ভুলিতে পারিয়া এখানে আসিয়াছি।

এই কথা বলিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া পিছন হইতে রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিল। রোহিণী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে?"

গম্ভীর স্বরে কে উত্তর করিল, "তোমার যম।"

রোহিণী চিনিল যে গোবিন্দলাল। তখন আসন্ন বিপদ্ বুঝিয়া চারি দিক্ অন্ধকার দেখিয়া রোহিণী ভীতিকম্পিতস্বরে বলিল, "ছাড়! ছাড়! আমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। আমি যে জন্য আসিয়াছি, এই বাবুকে না হয় জিজ্ঞাসা কর।"

এই বলিয়া রোহিণী যেখানে নিশাকর বসিয়াছিল, সেই স্থান অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। দেখিল, কেহ সেখানে নাই। নিশাকর গোবিন্দলালকে দেখিয়া পলকের মধ্যে কোথায় সরিয়া গিয়াছে। রোহিণী বিস্মিতা হইয়া বলিল, "কৈ, কেহ কোথাও নাই যে!"

গোবিন্দলাল বলিল, "এখানে কেহ নাই। আমার সঙ্গে ঘরে এস।"

রোহিণী বিষণ্নচিত্তে ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল ভৃত্যবর্গকে নিষেধ করিলেন, "কেহ উপরে আসিও না।"

ওস্তাদজী বাসায় গিয়াছিল।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। রোহিণী, সম্মুখে নদীস্রোতোবিকম্পিতা বেতসীর ন্যায় দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। গোবিন্দলাল মৃদুস্বরে বলিল, "রোহিণী!"

রোহিণী বলিল, "কেন?"

গো। তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে।

রো। কি?

গো। তুমি আমার কে?

রো। কেহ নহি, যত দিন পায়ে রাখেন তত দিন দাসী। নহিলে কেহ নই।

গো। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রেখেয়াছিলাম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ্, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যাজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি। তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলাম? তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্য ভ্রমর,—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর—তাহা পরিত্যাগ করিলাম?

এই বলিয়া গোবিন্দলাল আর দুঃখ ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রোহিণীকে পদাঘাত করিলেন।

রোহিণী বসিয়া পড়িল। কিছু বলিল না, কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু চক্ষের জল গোবিন্দলাল দেখিতে পাইলেন না।

গোবিন্দলাল বলিলেন, "রোহিণী, দাঁড়াও।"

রোহিণী দাঁড়াইল।

গো। তুমি একবার মরিতে গিয়াছিলে। আবার মরিতে সাহস আছে কি?

রোহিণী। তখন মরিবার ইচ্ছা করিতেছিল। অতি কাতর স্বরে বলিল, "এখন আর না মরিতে চাহিব কেন? কপালে যা ছিল, তা হলো।"

গো। তবে দাঁড়াও। নড়িও না।

রোহিণী দাঁড়াইয়া রহিল।

গোবিন্দলাল পিস্তলের বাক্স খুলিলেন, পিস্তল বাহির করিলেন। পিস্তল ভরা ছিল। ভরাই থাকিত।

পিস্তল আনিয়া রোহিণীর সম্মুখে ধরিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, "কেমন মরিতে পারিবে?"

রোহিণী ভাবিতে লাগিল। যে দিন অনায়াসে, অক্লেশে, বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, আজি সে দিন রোহিণী ভুলিল। সে দুঃখ নাই, সুতরাং সে সাহসও নাই। ভাবিল, "মরিব কেন? না হয় ইনি ত্যাগ করেন, করুন। ইঁহাকে কখনও ভুলিব না, কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন? ইঁহাকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইঁহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের সুখরাশি যে মনে করিব, সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা। মরিব কেন?"

রোহিণী বলিল, "মরিব না, মারিও না। চরণে না রাখ, বিদায় দেও।"

গো। দিই।

এই বলিয়া গোবিন্দলাল পিস্তল উঠাইয়া রোহিণীর ললাটে লক্ষ্য করিলেন।

রোহিণী কাঁদিয়া উঠিল, বলিল। "মারিও না! মারিও না! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ। আমি আর তোমায় দেখা দিব না, আর তোমার পথে আসিব না। এখনই যাইতেছি। আমায় মারিও না!"

গোবিন্দলালের পিস্তলে খট্ করিয়া শব্দ হইল। তার পর বড় শব্দ, তার পর সব অন্ধকার! রোহিণী গতপ্রাণা হইয়া ভূপতিতা হইল।

গোবিন্দলাল পিস্তল ভূমে নিক্ষেপ করিয়া অতি দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

পিস্তলের শব্দ শুনিয়া রূপা প্রভৃতি ভৃত্যবর্গ দেখিতে আসিল। দেখিল, বালক-নখর-বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে। গোবিন্দলাল কোথাও নাই!

দশম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় বৎসর

সেই রাত্রেই চৌকিদার থানায় গিয়া সংবাদ দিল যে, প্রসাদপুরের কুঠিতে খুন হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ থানা সে স্থান হইতে ছয় ক্রোশ ব্যবধান। দারোগা আসিতে পরদিন বেলা প্রহরেক হইল। আসিয়া তিনি খুনের তদারকে প্রবৃত্ত হইলেন। রীতিমত সুরতহাল ও লাস তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন। পরে রোহিণীর মৃতদেহ বান্ধিয়া ছাঁদিয়া গোরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া, চৌকিদারের সঙ্গে ডাক্তারখানায় পাঠাইলেন। পরে স্নান করিয়া আহারাদি করিলেন। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া অপরাধীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথায় অপরাধী? গোবিন্দলাল রোহিণীকে আহত করিয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, আর প্রবেশ করেন নাই। এক রাত্রি এক দিন অবকাশ পাইয়া গোবিন্দলাল কোথায় কত দূর গিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। কোন্ দিকে পলাইয়াছেন, কেহ জানে না। তাঁহার নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। গোবিন্দলাল প্রসাদপুরে কখনও নিজ নাম ধাম প্রকাশ করেন নাই; সেখানে চুনিলাল দত্ত নাম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন্ দেশ থেকে আসিয়াছিলেন, তাহা ভৃত্যেরা পর্য্যন্তও জানিত না। দারোগা কিছুদিন ধরিয়া একে ওকে ধরিয়া জোবানবন্দী করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে তিনি আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেমা রিপোর্ট দাখিল করিলেন।

তখন যশোহর হইতে ফিচেল খাঁ নামে একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিব্ ইনস্পেক্টর প্রেরিত হইল। ফিচেল খাঁর অনুসন্ধানপ্রণালী আমাদিগের সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। কতকগুলি চিঠিপত্র তিনি বাড়ী তল্লাসীতে পাইলেন। তদ্দ্বারা তিনি গোবিন্দলালের প্রকৃত নাম ধাম অবধারিত করিলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি কষ্ট স্বীকার করিয়া ছদ্মবেশে হরিদ্রাগ্রাম পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কিন্তু গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে যান নাই, সুতরাং ফিচেল খাঁ সেখানে গোবিন্দলালকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এ দিকে নিশাকর দাস সে করাল কালসমান রজনীতে বিপন্না রোহিণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রসাদপুরের বাজারে আপনার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে মাধবীনাথ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের নিকট সুপরিচিত বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করেন নাই; এক্ষণে নিশাকর আসিয়া তাঁহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন। শুনিয়া মাধবীনাথ বলিলেন, "কাজ ভাল হয় নাই। একটা খুনোখুনি হইতে পারে।" ইহার পরিণাম কি ঘটে, জানিবার জন্য উভয়ে প্রসাদপুরের বাজারে প্রচ্ছন্নভাবে অতি সাবধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রভাতেই শুনিলেন যে, চুনিলাল দত্ত আপন স্ত্রীকে খুন করিয়া পলাইয়াছে। তাঁহারা বিশেষ ভীত ও শোকাকুল হইলেন; ভয় গোবিন্দলালের জন্য; কিন্তু পরিশেষে দেখিলেন, দারোগা কিছু করিতে পারিলেন না। গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান নাই। তখন তাঁহারা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া, অথচ অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় বৎসর

ভ্রমর মরে নাই। কেন মরিল না, তাহা জানি না। এ সংসারে বিশেষ দুঃখ এই যে, মরিবার উপযুক্ত সময়ে কেহ মরে না। অসময়ে সবাই মরে। ভ্রমর যে মরিল না, বুঝি ইহাই তাহার কারণ। যাহাই হউক, ভ্রমর উৎকট রোগ হইতে কিয়দংশে মুক্তি পাইয়াছে। ভ্রমর আবার পিত্রালয়ে। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের যে সংবাদ আনিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী অতি সঙ্গোপনে তাহা জ্যেষ্ঠা কন্যা ভ্রমরের ভগিনীর নিকট বলিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি গোপনে তাহা ভ্রমরের নিকট বলিয়াছিল। এক্ষণে ভ্রমরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিনী বলিতেছিল, "এখন তিনি কেন হলুদগাঁয়ের বাড়ীতে আসিয়া বাস করুন না? তা হলে বোধ হয় কোন আপদ্ থাকিবে না।"

ভ্র। আপদ্ থাকিবে না কিসে?

যামিনী। তিনি প্রসাদপুরে নাম ভাঁড়াইয়া বাস করিতেন। তিনিই যে গোবিন্দলাল বাবু তাহা ত কেহ জানে না।

ভ্রমর। শুন নাই কি যে, হলুদগাঁয়েও পুলিসের লোক তাঁহার সন্ধানে আসিয়াছিল? তবে আর জানে না কি প্রকারে?

যামিনী। তা না হয় জানিল।—তবু এখানে আসিয়া আপনার বিষয় দখল করিয়া বসিলে টাকা হাতে হইবে। বাবা বলেন, পুলিস টাকার বশ।

ভ্রমর কাঁদিতে লাগিল—বলিল: "সে পরামর্শ তাঁহাকে কে দেয়? কোথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব যে, সে পরামর্শ দিব। বাবা একবার তাঁর সন্ধান করিয়া ঠিকানা করিয়াছিলেন—আর একবার সন্ধান করিতে পারেন কি?"

যামিনী। পুলিসের লোক কত সন্ধানী—তাহারাই অহরহ সন্ধান করিয়া যখন ঠিকানা পাইতেছে না, তখন বাবা কি প্রকারে সন্ধান পাইবেন? কিন্তু আমার বোধ হয়, গোবিন্দলাল বাবু আপনিই হলুদগাঁয়ে আসিয়া বসিবেন। প্রসাদপুরের সেই ঘটনার পরেই তিনি যদি হলুদগাঁয়ে দেখা দিতেন, তাহা হইলে তিনিই যে প্রসাদপুরের বাবু, এ কথায় লোকের বড় বিশ্বাস হইত। এইজন্য বোধ হয়, এত দিন তিনি আইসেন নাই। এখন আসিবেন, এমন ভরসা করা যায়।

ভ্র। আমার কোন ভরসা নাই।

যা। যদি আসেন?

ভ্র। যদি এখানে আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে দেবতার কাছে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আসুন। যদি না আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয়, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আর ইহজন্মে তাঁহার হরিদ্রাগ্রামে না আসা হয়। যাহাতে তিনি নিরাপদ্ থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেই মতি দিন।

যা। আমার বিবেচনায়, ভগিনি! তোমার সেইখানেই থাকা কর্ত্তব্য। কি জানি, তিনি কোন্ দিন অর্থের অভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়েন? যদি আমলাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেন? তোমাকে না দেখিলে তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন।

ভ্র। আমার এই রোগ। কবে মরি, কবে বাঁচি—আমি সেখানে কার আশ্রয়ে থাকিব?

যা। বল যদি, না হয়, আমরা কেহ গিয়া থাকিব—তথাপি তোমার সেখানেই থাকা কর্ত্তব্য।

ভ্রমর ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি হলুদগাঁয়ে যাইব । মাকে বলিও, কালই আমাকে পাঠাইয়া দেন। এখন তোমাদের কাহাকে যাইতে হইবে না। কিন্তু আমার বিপদের দিন তোমরা দেখা দিও।"

যা। কি বিপদ্ ভ্রমর ?

ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যদি তিনি আসেন ?"

যা। সে আবার বিপদ্ কি ভ্রমর? তোমার হারাধন ঘরে যদি আসে, তাহার চেয়ে—আহ্লাদের কথা আর কি আছে ?

ভ্র। আহ্লাদ দিদি ! আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে !

ভ্রমর আর কথা কহিল না। তাহার মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমরের মর্ম্মান্তিক রোদন, যামিনী কিছুই বুঝিল না। ভ্রমর মানস চক্ষে, ধূমময় চিত্রবৎ, এ কাণ্ডের শেষ যাহা হইবে, তাহা দেখিতে পাইল। যামিনী কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী বুঝিল না যে গোবিন্দলাল হত্যাকারী, ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম বৎসর

ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেল। যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামী ত আসিল না। দিন গেল, মাস গেল—স্বামী ত আসিল না। কোন সংবাদও আসিল না। এইরূপে তৃতীয় বৎসরও কাটিয়া গেল। গোবিন্দলাল আসিল না। তার পর চতুর্থ বৎসরও কাটিয়া গেল, গোবিন্দলাল আসিল না। এদিকে ভ্রমরেরও পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হাঁপানি কাশি রোগ—নিত্য শরীরক্ষয়—যম অগ্রসর—বুঝি আর ইহজন্মে দেখা হইল না।

তার পর পঞ্চম বৎসর প্রবৃত্ত হইল। পঞ্চম বৎসরে একটা ভারি গোলযোগ উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রামে সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছে। সংবাদ আসিল যে, গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিল—সেইখান হইতে পুলিস ধরিয়া যশোহরে আনিয়াছে। যশোহরে তাঁহার বিচার হইবে।

জনরবে এই সংবাদ ভ্রমর শুনিলেন। জনরবের সূত্র এই। গোবিন্দলাল, ভ্রমরের দেওয়ানজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি জেলে চলিলাম—আমার পৈতৃক বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা যদি তোমাদিগের অভিপ্রায়সম্মত হয়, তবে এই সময়। আমি তাহার যোগ্য নহি। আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।

তবে ফাঁসি যাইতে না হয়, এই ভিক্ষা। জনরবে এ কথা বাড়ীতে জানাইও, আমি পত্র লিখিয়াছি, এ কথা প্রকাশ করিও না।" দেওয়ানজী পত্রের কথা প্রকাশ করিলেন না—জনরব বলিয়া অন্তঃপুরে সংবাদ পাঠাইলেন।

ভ্রমর শুনিয়াই পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। শুনিবামাত্র মাধবীনাথ কন্যার নিকট আসিলেন। ভ্রমর, তাঁহাকে নোটে কাগজে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাহির করিয়া দিয়া সজলনয়নে বলিলেন, "বাবা, এখন যা করিতে হয় কর।—দেখিও—আমি আত্মহত্যা না করি।"

মাধবীনাথও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা। নিশ্চিন্ত থাকিও—আমি আজই যশোহরে যাত্রা করিলাম। কোন চিন্তা করিও না। গোবিন্দলাল যে খুন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে, তোমার আট-চল্লিশ হাজার টাকা বাঁচাইয়া আনিব—আর আমার জামাইকে দেশে আনিব।"

মাধবীনাথ তখন যশোহরে যাত্রা করিলেন। শুনিলেন যে, প্রমাণের অবস্থা অতি ভয়ানক। ইন্‌স্পেক্টর ফিচেল খাঁ মোকদ্দমা তদারক করিয়া সাক্ষী চালান দিয়াছিলেন। তিনি রূপো, সোণা প্রভৃতি যে সকল সাক্ষীরা প্রকৃত অবস্থা জানিত, তাহাদিগের কাহারও সন্ধান পান নাই। সোণা নিশাকরের কাছে ছিল—রূপা কোন্ দেশে গিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। প্রমাণের এরূপ দুরবস্থা দেখিয় নগদ কিছু দিয়া ফিচেল খাঁ তিনটি সাক্ষী তৈয়ার করিয়াছিল। সাক্ষীরা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে বলিল যে, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলাল স্বহস্তে পিস্তল মারিয়া রোহিণীকে খুন করিয়াছেন—আমরা তখন সেখানে গান শুনিতে গিয়াছিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আহেলা বিলাতী—সুশাসন জন্য সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রশংশিত হইয়া থাকেন—তিনি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোবিন্দলালকে সেশনের বিচারে অর্পণ করিলেন। যখন মাধবীনাথ যশোহরে পৌছিলেন, তখন গোবিন্দলাল জেলে পচিতেছিলেন। মাধবীনাথ পৌছিয়া, সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া বিষণ্ণ হইলেন।

তিনি সাক্ষীদিগের নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের বাড়ী গেলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, "বাপু! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যা বলিয়াছ, তা বলিয়াছ। এখন জজ সাহেবের কাছে ভিন্ন প্রকার বলিতে হইবে। বলিতে হইবে যে, আমরা কিছু জানি না। এই পাঁচ পাঁচ শত টাকা নগদ লও। আসামী খালাস হইলে আর পাঁচ পাঁচ শত দিব।"

সাক্ষীরা বলিল, "খেলাপ হলপের দায়ে মারা যাইব যে।"

মাধবীনাথ বলিলেন, "ভয় নাই। আমি টাকা খরচ করিয়া সাক্ষীর দ্বারা

প্রমাণ করাইব যে, ফিচেল খাঁ তোমাদিগের মারপিট করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছে।”

সাক্ষীরা চতুর্দ্দশ পুরুষ মধ্যে কখনও হাজার টাকা একত্রে দেখে নাই। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

সেশনে বিচারের দিন উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল কাঠগড়ার ভিতর। প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়া হলফ পড়িল। উকীল সরকার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলালকে চেন?”

সাক্ষী। কই—না—মনে ত হয় না।

উকীল। কখনও দেখিয়াছ?

সাক্ষী। না।

উকীল। রোহিণীকে চিনিতে?

সাক্ষী। কোন্ রোহিণী?

উকীল। প্রসাদপুরের কুঠিতে যে ছিল?

সাক্ষী। আমার বাপের পুরুষে কখনও প্রসাদপুরের কুঠিতে যাই নাই।

উকীল। রোহিণী কি প্রকারে মরিয়াছে?

সাক্ষী। শুনিতেছি আত্মহত্যা হইয়াছে।

উকীল। খুনের বিষয় কিছু জান?

সাক্ষী। কিছু না।

উকীল তখন, সাক্ষী, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যে জোবানবন্দী দিয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া সাক্ষীকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, তুমি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে এই সকল কথা বলিয়াছিলে?”

সাক্ষী। হাঁ, বলিয়াছিলাম।

উকীল। যদি কিছু জান না, তবে কেন বলিয়াছিলে?

সাক্ষী। মারের চোটে। ফিচেল খাঁ মারিয়া আমাদের শরীরে আর কিছু রাখে নাই।

এই বলিয়া সাক্ষী একটু কাঁদিল। দুই চারি দিন পূর্ব্বে সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে জমি লইয়া কাজিয়া করিয়া মারামারি করিয়াছিল; তাহার দাগ ছিল। সাক্ষী অম্লানমুখে সেই দাগগুলি ফিচেল খাঁর মারপিটের দাগ বলিয়া জজ সাহেবকে দেখাইল।

উকীল সরকার অপ্রতিভ হইয়া দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষীও

এইরূপ বলিল। সে পিঠে রাঙচিত্রের আটা দিয়া ঘা করিয়া আসিয়াছিল—হাজার টাকার জন্য সব পারা যায়—তাহা জজ সাহেবকে দেখাইল।

তৃতীয় সাক্ষী ঐরূপ গুজরাইল। তখন জজ সাহেব প্রমাণাভাব দেখিয়া আসামীকে খালাস দিলেন। এবং ফিচেল খাঁর প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার আচরণ সম্বন্ধে তদারক করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে উপদেশ দিলেন।

বিচারকালে সাক্ষীদিগের এইরূপ স্বপক্ষতা দেখিয়া গোবিন্দলাল বিস্মিত হইতেছিলেন। পরে যখন ভিড়ের ভিতর মাধবীনাথকে দেখিলেন, তখনই সকল বুঝিতে পারিলেন। খালাস হইয়াও তাঁহাকে আর একবার জেলে যাইতে হইল—সেখানে জেলর পরওয়ানা পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি যখন জেলে ফিরিয়া যান, তখন মাধবীনাথ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কাণে কাণে বলিলেন, "জেল হইতে খালাস পাইয়া, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমার বাসা অমুক স্থানে।"

কিন্তু গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস পাইয়া, মাধবীনাথের কাছে গেলেন না। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না। মাধবীনাথ চারি পাঁচ দিন তাঁহার সন্ধান করিলেন। কোন সন্ধান পাইলেন না।

অগত্যা শেষে একাই হরিদ্রাগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ বৎসর

মাধবীনাথ আসিয়া ভ্রমরকে সংবাদ দিলেন, গোবিন্দলাল খালাস হইয়াছে, কিন্তু বাড়ী আসিল না, কোথায় চলিয়া গেল, সন্ধান পাওয়া গেল না। মাধবীনাথ [চ]লিয়া গেলে ভ্রমর অনেক কাঁদিল, কিন্তু কি জন্য কাঁদিল, তাহা বলিতে পারি না।

এ দিকে গোবিন্দলাল খালাস পাইয়াই প্রসাদপুরে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, প্রসাদপুরের গৃহে কিছু নাই, কেহ নাই। গিয়া শুনিলেন যে, অট্টালিকায় তাঁহার [যে] সকল দ্রব্যসামগ্রী ছিল, তাহা কতক পাঁচ জনে লুঠিয়া লইয়া গিয়াছিল—অবশিষ্ট লাওয়ারেশ বলিয়া বিক্রয় হইয়াছিল। কেবল বাড়ীটি পড়িয়া আছে—তাহারও কবাট চৌকাট পর্য্যন্ত বার ভূতে লইয়া গিয়াছে। প্রসাদপুরের বাজারে [দু]ই এক দিন বাস করিয়া গোবিন্দলাল, বাড়ীর অবশিষ্ট ইট কাঠ জলের দামে এক [ব্য]ক্তিকে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইলেন, তাহা লইয়া কলিকাতায় গেলেন।

কলিকাতায় অতি গোপনে সামান্য অবস্থায় গোবিন্দলাল দিনযাপন করিতে [ল]াগিলেন। প্রসাদপুর হইতে অতি অল্প টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহা এক

বৎসরে ফুরাইয়া গেল। আর দিনপাতের সম্ভাবনা নাই। তখন, ছয় বৎসরের পর, গোবিন্দলাল মনে ভাবিলেন, ভ্রমরকে একখানি পত্র লিখিব।

গোবিন্দলাল কালি, কলম, কাগজ লইয়া, ভ্রমরকে পত্র লিখিব বলিয়া বসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব—গোবিন্দলাল পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতে গিয়া কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে পড়িল, ভ্রমর যে আজিও বাঁচিয়া আছে তাহারই বা ঠিকানা কি? কাহাকে পত্র লিখিব? তার পর ভাবিলেন, একবার লিখিয়াই দেখি। না হয়, আমার পত্র ফিরিয়া আসিবে। তাহা হইলেই জানিব যে ভ্রমর নাই।

কি লিখিব, এ কথা গোবিন্দলাল কতক্ষণ ভাবিলেন, তাহা বলা যায় না। তার পর, শেষ ভাবিলেন, যাহাকে বিনাদোষে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি, তাহাকে যা হয়, তাই লিখিলেই বা অধিক কি ক্ষতি হইবে? গোবিন্দলাল লিখিলেন,

"ভ্রমর!

ছয় বৎসরের পর এ পামর আবার তোমায় পত্র লিখিতেছে। প্রবৃত্তি হয় পড়িও; না প্রবৃত্তি হয়, না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিও।

"আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, বোধ হয় সকলই তুমি শুনিয়াছ। যদি বলি, সে আমার কর্ম্মফল, তুমি মনে করিতে পার, আমি তোমার মনরাখা কথা বলিতেছি। কেন না, আজি আমি তোমার কাছে ভিখারী।

"আমি এখন নিঃস্ব। তিন বৎসর ভিক্ষা করিয়া, দিনপাত করিয়াছি। তীর্থস্থানে ছিলাম, তীর্থস্থানে ভিক্ষা মিলিত। এখানে ভিক্ষা মিলে না—সুতরাং আমি অন্নাভাবে মারা যাইতেছি।

"আমার যাইবার এক স্থান ছিল—কাশীতে মাতৃক্রোড়ে। মার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে—বোধ হয় তাহা তুমি জান। সুতরাং আমার আর স্থান নাই—অন্ন নাই।

"তাই, আমি মনে করিয়াছি, আবার হরিদ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব—নহিলে খাইতে পাই না। যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, পরদার-নিরত হইল, স্ত্রীহত্যা পর্য্যন্ত করিল, তাহার আবার লজ্জা কি? যে অন্নহীন তাহার আবার লজ্জা কি? আমি এ কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি বিষয়াধিকারিণী—বাড়ী তোমার—আমি তোমার বৈরিতা করিয়াছি—আমায় তুমি স্থান দিবে কি?

"পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?"

পত্র লিখিয়া সাত পাঁচ আবার ভাবিয়া গোবিন্দলাল পত্র ডাকে দিলেন। যথাকালে পত্র ভ্রমরের হস্তে পৌঁছিল।

পত্র পাইয়াই, ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল। পত্র খুলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, ভ্রমর শয়নগৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তখন ভ্রমর, বিরলে বসিয়া, নয়নে সহস্র ধারা মুছিতে মুছিতে, সেই পত্র পড়িল। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িল। সেদিন ভ্রমর আর দ্বার খুলিল না। যাহারা আহারের জন্য ত্যহাকে ডাকিতে আসিল, তাহাদিগকে বলিল, "আমার জ্বর হইয়াছে—আহার করিব না।" ভ্রমরের সর্ব্বদা জ্বর হয়; সকলে বিশ্বাস করিল।

পরদিন নিদ্রাশূন্য শয্যা হইতে যখন ভ্রমর গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাঁহার যথার্থ ই জ্বর হইয়াছে। কিন্তু তখন চিত্ত স্থির—বিকারশূন্য। পত্রের উত্তর যাহা লিখিবেন, তাহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। ভ্রমর তাহা সহস্র সহস্রবার ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এখন আর ভাবিতে হইল না। পাঠ পর্য্যন্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

"সেবিকা" পাঠ লিখিলেন না। কিন্তু স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণম্য; অতএব লিখিলেন,

"প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চ বিশেষ"

তারপর লিখিলেন, "আপনার পত্র পাইয়াছি। বিষয় আপনার। আমার হইলেও আমি উহা দান করিয়াছি। যাইবার সময় আপনি সে দানপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, স্মরণ থাকিতে পারে। কিন্তু রেজিষ্ট্রী অপিসে তাহার নকল আছে। আমি যে দান করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ। তাহা এখনও বলবৎ।

"অতএব আপনি নির্ব্বিঘ্নে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া আপনার নিজ সম্পত্তি দখল করিতে পারেন। বাড়ী আপনার।

"আর এই পাচ বৎসরে আমি অনেক টাকা জমাইয়াছি। তাহাও আপনার। আসিয়া গ্রহণ করিবেন।

"ঐ টাকার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ আমি যাচ্ঞা করি। আট হাজার টাকা আমি উহা হইতে লইলাম। তিন হাজার টাকায় গঙ্গাতীরে আমার একটি বাড়ী প্রস্তুত করিব; পাঁচ হাজার টাকায় আমার জীবন নির্ব্বাহ হইবে।

"আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয়ে যাইব। যতদিন না আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট,—আপনিও যে সন্তুষ্ট, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

"আপনার দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম।"

যথাকালে পত্র গোবিন্দলালের হস্তগত হইল—কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু

কোমলতাও নাই। গোবিন্দলালও লিখিয়াছিলেন, ছয় বৎসরের পর লিখিতেছি, কিন্তু ভ্রমরের পত্রে সে রকম কথাও একটা নাই। সেই ভ্রমর!

গোবিন্দলাল পত্র পড়িয়া উত্তর লিখিলেন, "আমি হরিদ্রাগ্রামে যাইব না। যাহাতে এখানে আমার দিনপাত হয়, এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে পাঠাইয়া দিও।"

ভ্রমর উত্তর করিলেন, "মাস মাস আপনাকে পাঁচ শত টাকা পাঠাইব। আরও অধিক পাঠাইতে পারি, কিন্তু অধিক টাকা পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা। আর আমার একটি নিবেদন—বৎসর বৎসর যে উপস্বত্ব জমিতেছে—আপনি এখানে আসিয়া ভোগ করিলে ভাল হয়। আমার জন্য দেশত্যাগ করিবেন না—আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে।"

গোবিন্দলাল কলিকাতাতেই রহিলেন। উভয়েই বুঝিলেন, সেই ভাল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সপ্তম বৎসর

বাস্তবিক ভ্রমরের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। অনেক দিন হইতে ভ্রমরের সাংঘাতিক পীড়া চিকিৎসায় উপশমিত ছিল। কিন্তু রোগ আর বড় চিকিৎসা মানিল না। এখন ভ্রমর দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিলেন। অগ্রহায়ন মাসে ভ্রমর শয্যাশায়িনী হইলেন, আর শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠেন না। মাধবীনাথ স্বয়ং আসিয়া নিকটে থাকিয়া নিস্ফল চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। যামিনী হরিদ্রাগ্রামের বাটীতে আসিয়া ভগিনীর শেষ শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রোগ চিকিৎসা মানিল না। পৌষ মাস এইরূপে গেল। মাঘ মাসে ভ্রমর ঔষধ ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন। ঔষধ সেবন এখন বৃথা। যামিনীকে বলিলেন, "আর ঔষধ খাওয়া হইবে না দিদি—সম্মুখে ফাল্গুন মাস—মাসের পূর্ণিমার রাত্রে যেন মরি। দেখিস্ দিদি—যেন ফাল্গুনের পূর্ণিমার রাত্রি পলাইয়া যায় না। যদি দেখিস্ যে, পূর্ণিমার রাত্রি পার হই—তবে আমায় একটা অন্তরটিপনি দিতে ভুলিস না। রোগ হউক, অন্তরটিপনিতে হউক—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাত্রে মরিতে হইবে। মনে থাকে যেন দিদি।"

যামিনী কাঁদিল, কিন্তু ভ্রমর আর ঔষধ খাইল না। ঔষধ খায় না, রোগের শান্তি নাই—কিন্তু ভ্রমর দিন দিন প্রফুল্লচিত্ত হইতে লাগিল।

এত দিনের পর ভ্রমর আবার হাসি তামাসা আরম্ভ করিল—ছয় বৎসরের পর এই প্রথম হাসি তামাসা। নিবিবার আগে প্রদীপ হাসিল।

যত দিন যাইতে লাগিল—অন্তিম কাল দিনে দিনে যত নিকট হইতে লাগিল—ভ্রমর তত স্থির, প্রফুল্ল, হাস্যমূর্ত্তি। শেষে সেই ভয়ঙ্কর শেষ দিন উপস্থিত হইল। ভ্রমর পৌরজনের চাঞ্চল্য এবং যামিনীর কান্না দেখিয়া বুঝিলেন, আজ বুঝি দিন ফুরাইল। শরীরের যন্ত্রণাও সেইরূপ অনুভূত করিলেন। তখন ভ্রমর যামিনীকে বলিলেন, "আজ শেষ দিন।"

যামিনী কাঁদিল। ভ্রমর বলিল, "দিদি—আজ শেষ দিন—আমার কিছু ভিক্ষা আছে—কথা রাখিও।"

যামিনী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না।

ভ্রমর বলিল, "আমার এক ভিক্ষা ; আজ কাঁদিও না।—আমি মরিলে পর কাঁদিও—আমি বারণ করিতে আসিব না—কিন্তু আজ তোমাদের সঙ্গে যে কয়েকটা কথা কহিতে পারি, নির্ব্বিঘ্নে কহিয়া মরিব, সাধ করিতেছে।"

যামিনী চক্ষের জল মুছিয়া কাছে বসিল—কিন্তু অবরুদ্ধ বাষ্পে আর কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর বলিতে লাগিল, "আর একটি ভিক্ষা—তুমি ছাড়া আর কেহ এখানে না আসে। সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব—কিন্তু এখন আর কেহ না আসে। তোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পাব না।"

যামিনী আর কতক্ষণ কান্না রাখিবে ?

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল। ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, রাত্রি কি জ্যোৎস্না ?"

যামিনী জানেলা খুলিয়া দেখিয়া বলিল, "দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।"

ভ্র। তবে জানালাগুলি সব খুলিয়া দাও—আমি জ্যোৎস্না দেখিয়া মরি। দেখ দেখি, ঐ জানেলার নীচে যে ফুলবাগান, উহাতে ফুল ফুটিয়াছে কি না।

সেই জানেলায় দাঁড়াইয়া প্রভাতকালে ভ্রমর, গোবিন্দলালের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। আজি সাত বৎসর ভ্রমর সে জানেলার দিকে যান নাই—সে জানেলা খোলেন নাই।

যামিনী কষ্টে সেই জানেলা খুলিয়া বলিল, "কই এখানে ত ফুলবাগান নাই—এখানে কেবল খড়বন—আর দুই-একটা মরা মরা গাছ আছে—তাতে ফুল পাতা কিছুই নাই।"

ভ্রমর বলিল, "সাত বৎসর হইল, ওখানে ফুলবাগান ছিল। বে-মেরামতে গিয়াছে। আমি সাত বৎসর দেখি নাই।"

অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর ভ্রমর বলিলেন, "যেখান হইতে পার দিদি, আজ আমায় ফুল আনাইয়া দিতে হইবে। দেখিতেছ না, আজি আমার ফুলশয্যা?"

যামিনীর আজ্ঞা পাইয়া দাস দাসী রাশীকৃত ফুল আনিয়া দিল। ভ্রমর বলিল, "ফুল আমার বিছানায় ছড়াইয়া দাও—আজ আমার ফুলশয্যা।"

যামিনী তাহাই করিল। তখন ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। যামিনী বলিল, "কাঁদিতেছ কেন দিদি?"

ভ্রমর বলিল, "দিদি, একটি বড় দুঃখ রহিল। যে দিন তিনি আমায় ত্যাগ করিয়া কাশী যান, সেই দিন যোড়হাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দেবতার কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম, এক দিন যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম, আমি যদি সতী হই, তবে আবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে। কই, আর ত দেখা হইল না। আজিকার দিন—মরিবার দিনে, দিদি যদি একবার দেখিতে পাইতাম! এক দিনে, দিদি সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম!"

যামিনী বলিল, "দেখিবে?" ভ্রমর যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—বলিল, "কার কথা বলিতেছ?"

যামিনী স্থিরভাবে বলিল, "গোবিন্দলালের কথা। তিনি এখানে আছেন—বাবা তোমার পীড়ার সংবাদ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। শুনিয়া তোমাকে একবার দেখিবার জন্য তিনি আসিয়াছেন। আজ পৌঁছিয়াছেন। তোমার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে পারি নাই—তিনিও সাহস করিয়া আসিতে পারেন নাই।"

ভ্রমর কাঁদিয়া বলিল, "একবার দেখা দিদি! ইহজন্মে আর একবার দেখি! এই সময়ে আর একবার দেখা।"

যামিনী উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে গোবিন্দলাল—সাত বৎসরের পরে নিজ শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দুজনেই কাঁদিতেছিল। এক জনও কথা কহিতে পারিল না।

ভ্রমর, স্বামীকে কাছে আসিয়া বিছানায় বসিতে ইঙ্গিত করিল।—গোবিন্দলাল কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় বসিল। ভ্রমর তাঁহাকে আরও কাছে আসিতে বলিল, —গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল। তখন ভ্রমর আপন করতলের নিকট স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু লইয়া মাথায় দিল। বলিল, "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিও জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

গোবিন্দলাল কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ভ্রমরের হাত, আপন হাতে তুলিয়া লইলেন। সেইরূপ হাতে হাত রহিল। অনেকক্ষণ রহিল। ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমর মরিয়া গেল। যথারীতি তাহার সৎকার হইল। সৎকার করিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল গৃহে বসিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবধি, তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন নাই।

আবার রজনী পোহাইল। ভ্রমরের মৃত্যুর পরদিন, যেমন সূর্য্য প্রত্যহ উঠিয়া থাকে, তেমনি উঠিল। গাছের পাতা ছায়ালোকে উজ্জল হইল—সরোবরের কৃষ্ণবারি ক্ষুদ্র বীচি বিক্ষেপ করিয়া জ্বলিতে লাগিল; আকাশের কালো মেঘ শাদা হইল—ভ্রমর যেন মরে নাই। গোবিন্দলাল বাহির হইলেন।

গোবিন্দলাল দুই জন স্ত্রীলোককে ভাল বাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল—ভ্রমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন —যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দার-ঘর্ষণপীড়িত বাসুকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধম্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়সাগর, মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত, সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে—সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে। কিন্তু তখন সেই পূর্ব্বপরিজ্ঞাতস্বাদ বিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়সুধা—স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর, সর্ব্ব-রোগের ঔষধস্বরূপ, দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবল-প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া, রোহিণী অত্যাজ্য্যা, তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথায় এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।

যদি তখন গোবিন্দলাল, রোহিণীর যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া স্নেহময়ী ভ্রমরের কাছে যুক্তকরে আসিয়া দাঁড়াইত, বলিত, "আমায় ক্ষমা কর—আমায় আবার

হৃদয়প্রান্তে স্থান দাও।" যদি বলিত, "আমার এমন গুণ নাই, যাহাতে আমায় তুমি ক্ষমা করিতে পার, কিন্তু তোমার ত অনেক গুণ আছে, তুমি নিজগুণে আমায় ক্ষমা কর" বুঝি তাহা হইলে, ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিত। কেন না, রমণী ক্ষমাময়ী, দয়াময়ী, স্নেহময়ী ;—রমণী ঈশ্বরের কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষ, দেবতার ছায়া ; পুরুষ দেবতার সৃষ্টিমাত্র। স্ত্রী আলোক ; পুরুষ ছায়া। আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে পারিত ?

গোবিন্দলাল তাহা পারিল না। কতকটা অহঙ্কার—পুরুষ অহঙ্কারে পরিপূর্ণ—কতকটা লজ্জা—দুষ্কৃতকারীর লজ্জাই দণ্ড। কতকটা ভয়—পাপ, সহজে পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারে না। ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার পথ নাই। গোবিন্দলাল আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহার পর গোবিন্দলাল হত্যাকারী। তখন গোবিন্দলালের আশা ভরসা ফুরাইল। অন্ধকার আলোকের সম্মুখীন হইল না।

কিন্তু তবু, সেই পুনঃপ্রজ্বলিত, দুর্ব্বার, দাহকারী ভ্রমরদর্শনের লালসা বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, গোবিন্দলালকে দাহ করিতে লাগিল। কে এমন পাইয়াছিল ? কে এমন হারাইয়াছে ? ভ্রমরও দুঃখ পাইয়াছিল, গোবিন্দলালও দুঃখ পাইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী। গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য।—ভ্রমরের সহায় ছিল—যম সহায়। গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই।

আবার রজনী পোহাইল—আবার সূর্য্যালোকে জগৎ হাসিল। গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।—রোহিণীকে গোবিন্দলাল স্বহস্তে বধ করিয়াছেন—ভ্রমরকেও প্রায় স্বহস্তে বধ করিয়াছেন। তাই ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইলেন।

আমরা জানি যে, সে রাত্রি গোবিন্দলাল কি প্রকারে কাটাইয়াছিলেন। বোধ হয় রাত্রি বড় ভয়ানকই গিয়াছিল। দ্বার খুলিয়াই মাধবীনাথের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মাধবীনাথ তাঁহাকে দেখিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিলেন—মুখে মনুষ্যের সাধ্যাতীত রোগের ছায়া।

মাধবীনাথ তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলেন না—মাধবীনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহজন্মে আর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথা কহিবেন না। বিনাবাক্যে মাধবীনাথ চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভ্রমরের শয্যাগৃহতলস্থ সেই পুষ্পোদ্যানে গেলেন। যামিনী যথার্থই বলিয়াছেন, সেখানে আর পুষ্পোদ্যান নাই। সকলই ঘাস, খড় ও জঙ্গলে পুরিয়া গিয়াছে—দুই একটি অমর পুষ্পবৃক্ষ সেই জঙ্গলের মধ্যে

অর্দ্ধমৃতবৎ আছে—কিন্তু তাহাতে আর ফুল ফুটে না। গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেই খড়বনের মধ্যে বেড়াইলেন। অনেক বেলা হইল—রৌদ্রের অত্যন্ত তেজঃ হইল—গোবিন্দলাল বেড়াইয়া বেড়াইয়া শ্রান্ত হইয়া শেষে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তথা হইতে গোবিন্দলাল কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া, কাহারও মুখপানে না চাহিয়া বারুণী-পুষ্করিণী-তটে গেলেন। বেলা দেড় প্রহর হইয়াছে। তীব্র রৌদ্রের তেজে বারুণীর গভীর কৃষ্ণোজ্জ্বল বারিরাশি জ্বলিতেছিল—স্ত্রী-পুরুষ বহুসংখ্যক লোক ঘাটে স্নান করিতেছিল—ছেলেরা কালো জলে স্ফটিক চূর্ণ করিতে করিতে সাঁতার দিতেছিল। গোবিন্দলালের তত লোকসমাগম ভাল লাগিল না। ঘাট হইতে যেখানে বারুণীতীরে, তাঁহার সেই নানাপুষ্পরঞ্জিত নন্দনতুল্য পুষ্পোদ্যান ছিল, গোবিন্দলাল সেই দিকে গেলেন। প্রথমেই দেখিলেন, রেলিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—সেই লৌহনির্ম্মিত বিচিত্র দ্বারের পরিবর্ত্তে কঞ্চির বেড়া। ভ্রমর গোবিন্দলালের জন্য সকল সম্পত্তি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ উদ্যানের প্রতি কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই। একদিন যামিনী সে বাগানের কথা বলিয়াছিলেন —ভ্রমর বলিয়াছিল, "আমি যমের বাড়ী চলিলাম—আমার সে নন্দনকাননও ধ্বংস হউক। দিদি, পৃথিবীতে যা আমার স্বর্গ ছিল—তা আর কাহাকে দিয়া যাইব ?"

গোবিন্দলাল দেখিলেন, ফটক নাই—রেলিং পড়িয়া গিয়াছে। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—ফুলগাছ নাই—কেবল উলুবন, আর কচুগাছ, ঘেঁটু ফুলের গাছ, কালকাসন্দা গাছে বাগান পরিপূর্ণ। লতামণ্ডপ সকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে—প্রস্তরমূর্ত্তি সকল দুই তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে—তাহার উপর লতা সকল ব্যাপিয়াছে, কোনটা বা ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। প্রমোদ-ভবনের ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ঝিলমিল শার্সি কে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে—মর্ম্মর প্রস্তরসকল কে হর্ম্ম্যতল হইতে খুলিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে—সে বাগানে আর ফুল ফুটে না—ফল ফলে না—বুঝি সুবাতাসও আর বয় না।

একটা ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল, গোবিন্দলাল সেইখানে বসিয়া রহিলেন। প্রচণ্ড সূর্য্যতেজে তাঁহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুই অনুভব করিলেন না। তাঁহার প্রাণ যায়। রাত্রি অবধি কেবল ভ্রমর ও রোহিণী ভাবিতেছিলেন। একবার ভ্রমর, তার পর রোহিণী, আবার ভ্রমর, আবার রোহিণী। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে রোহিণীকে দেখিতে লাগিলেন। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইয়া উঠিল। সেই উদ্যানে বসিয়া প্রত্যেক বৃক্ষকে ভ্রমর বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল—প্রত্যেক বৃক্ষচ্ছায়ায় রোহিণী বসিয়া আছে দেখিতে

লাগিলেন। এই ভ্রমর দাঁড়াইয়াছিল—আর নাই—এই রোহিণী আসিল, আবার কোথায় গেল? প্রতি শব্দে ভ্রমর বা রোহিণীর কণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। ঘাটে স্নানকারীরা কথা কহিতেছে, তাহাতে কখনও বোধ হইল ভ্রমর কথা কহিতেছে—কখনও বোধ হইতে লাগিল রোহিণী কথা কহিতেছে—কখনও বোধ হইল তাহারা দুই জনে কথোপকথন করিতেছে। শুষ্ক পত্র নড়িতেছে—বোধ হইল ভ্রমর আসিতেছে—বনমধ্যে বন্য কীটপতঙ্গ নড়িতেছে—বোধ হইল রোহিণী পলাইতেছে। বাতাসে শাখা দুলিতেছে—বোধ হইল ভ্রমর নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে—দয়েল ডাকিলে বোধ হইল রোহিণী গান করিতেছে। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইল।

বেলা দুই প্রহর—আড়াই প্রহর হইল—গোবিন্দলাল সেইখানে—সেই ভগ্নপুত্তল-পদতলে—সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে। বেলা তিন প্রহর, সার্দ্ধ তিন প্রহর হইল—অস্নাত অনাহারী গোবিন্দলাল সেইখানে, সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে—ভ্রমর-রোহিণীময় অনলকুণ্ডে। সন্ধ্যা হইল, তথাপি গোবিন্দলালের উত্থান নাই—চৈতন্য নাই। তাঁহার পৌরজনে তাঁহাকে সমস্ত দিন না দেখিয়া মনে করিয়াছিল, তিনি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অধিক সন্ধান করে নাই। সেইখানে সন্ধ্যা হইল। কাননে অন্ধকার হইল। আকাশে নক্ষত্র ফুটিল। পৃথিবী নীরব হইল। গোবিন্দলাল সেইখানে।

অকস্মাৎ সেই অন্ধকার, স্তব্ধ বিজন মধ্যে গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে রোহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন। রোহিণী উচ্চৈঃস্বরে যেন বলিতেছে,

"এইখানে!"

গোবিন্দলালের তখন আর স্মরণ ছিল না যে, রোহিণী মরিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইখানে—কি?"

যেন শুনিলেন, রোহিণী বলিতেছে—

"এমনি সময়ে!"

গোবিন্দলাল কলে বলিলেন, "এইখানে, এমনি সময়ে কি রোহিণি?"

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলাল শুনিলেন, আবার রোহিণী উত্তর করিল, "এইখানে, এমনি সময়ে, ঐ জলে,"

"আমি ডুবিয়াছিলাম!"

গোবিন্দলাল আপন মানসোদ্ভূত এই বাণী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ডুবিব?"

আবার ব্যাধিজনিত উত্তর শুনিতে পাইলেন, "হাঁ, আইস। ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইতেছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। **প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।**"

গোবিন্দলাল চক্ষু বুজিলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ন, বেপমান হইল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া সোপানশিলার উপর পতিত হইলেন।

মুগ্ধাবস্থায়, মানস চক্ষে দেখিলেন, সহসা রোহিণীমূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। তখন দিগন্ত ক্রমশঃ প্রভাসিত করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি সম্মুখে উদিত হইল।

ভ্রমরমূর্ত্তি বলিল, "মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।"

গোবিন্দলাল সে রাত্রে মূর্চ্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন। প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাঁহার লোকজন তাঁহাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। দুই তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন যে, তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না। এক রাত্রি তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কেহ আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না।

সাত বৎসর পর, তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল।

পরিশিষ্ট

গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাঁহার ভাগিনেয় শচীকান্ত প্রাপ্ত হইল। শচীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত।

শচীকান্ত প্রত্যহ সেই ভ্রষ্টশোভ কাননে—যেখানে আগে গোবিন্দলালের প্রমোদোদ্যান ছিল—এখন নিবিড় জঙ্গল—সেইখানে বেড়াইতে আসিত।

শচীকান্ত সেই দুঃখময়ী কাহিনী সবিস্তারে শুনিয়াছিল। প্রত্যহ সেইখানে বেড়াইতে আসিত, এবং সেইখানে বসিয়া সেই কথা ভাবিত। ভাবিয়া ভাবিয়া আবার সেইখানে সে উদ্যান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। আবার বিচিত্র রেলিং প্রস্তুত করিল—পুষ্করিণীতে নামিবার মনোহর কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত সোপানাবলী গঠিত করিল। আবার কেয়ারি করিয়া মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সকল পুঁতিল। কিন্তু আর রঙ্গিন ফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে বকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে সাইপ্রেস্ ও উইলো।—প্রমোদভবনের

পরিবর্ত্তে একটি মন্দির প্রস্তুত করিল। মন্দিরমধ্যে কোন দেব-দেবী স্থাপন করিল না। বহুল অর্থব্যয় করিয়া ভ্রমরের একটি প্রতিমূর্ত্তি সুবর্ণে গঠিত করিয়া, সেই মন্দিরমধ্যে স্থাপন করিল। স্বর্ণপ্রতিমার পদতলে অক্ষর খোদিত করিয়া লিখিল,

**"যে, সুখে দুঃখে, দোষে গুণে, ভ্রমরের সমান
হইবে, আমি তাহাকে এই স্বর্ণপ্রতিমা
দান করিব।"**

ভ্রমরের মৃত্যুর বার বৎসর পরে সেই মন্দিরদ্বারে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচীকান্ত সেইখানেই ছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন, "এই মন্দিরে কি আছে দেখিব।"

শচীকান্ত দ্বার মোচন করিয়া সুবর্ণময়ী ভ্রমরমূর্ত্তি দেখাইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই ভ্রমর আমার ছিল। আমি গোবিন্দলাল রায়।"

শচীকান্ত বিস্মিত, স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার বাকস্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু পরে বিস্ময় দূর হইল, তিনি গোবিন্দলালের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহাকে গৃহে লইবার জন্য যত্ন করিলেন। গোবিন্দলাল অস্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "আজ আমার দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইল। অজ্ঞাতবাস সমাপনপূর্ব্বক তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করা হইল। এখন ফিরিয়া যাইব।"

শচীকান্ত যুক্তকরে বলিলেন, "বিষয় আপনার, আপনি উপভোগ করুন।"

গোবিন্দলাল বলিলেন, "বিষয়-সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। বিষয়ে আমার কাজ নাই, তুমিই ইহা ভোগ করিতে থাক।"

শচীকান্ত বিনীতভাবে বলিলেন, "সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়?"

গোবিন্দলাল উত্তর করিলেন, "কদাপি না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার এ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"

এই বলিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। আর কেহ তাঁহাকে হরিদ্রাগ্রামে দেখিতে পাইল না।

সমাপ্ত

সংক্ষিপ্ত টীকা

"কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসের কাহিনীটি সংহত ও সরল। একটি নারীর সংগুপ্ত কামনার মধ্যে যে কত বড় একটা সমাজ-বিধ্বংসী শক্তি লুক্কায়িত থাকিতে পারে, বঞ্চিতা একটি বিধবার অন্তরের সুপ্ত আসঙ্গলিপ্সাকে প্রলোভন দেখাইয়া জাগাইয়া তুলিলে তাহা যে কত বড় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারে, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ও ঘটনা সুখময় দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে যে কত বড় অকল্যাণ বহন করিয়া আনে—তাহারই জীবন্ত চিত্র পাই আমরা এই উপন্যাসখানিতে।

ভ্রমর-গোবিন্দলাল-রোহিণীর জীবন-কথা, তাহাদের বিচিত্র সুখ-দুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের জীবনের পরিণতি—এইগুলিই উপন্যাসের কথাবস্তু। উপন্যাস-খানি দুইটি খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে ভ্রমর-গোবিন্দলালের মধুর দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে কিভাবে রোহিণীর আবির্ভাব হইল, আকাশের কোণে সঞ্চিত একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ কিভাবে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল, প্রবল একটা ঘূর্ণিবায়ু কি করিয়া গোবিন্দলালকে সকল বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিরুদ্দেশের পথে উড়াইয়া লইয়া চলিল—প্রথম খণ্ডে তাহার বর্ণনা। ভ্রমরের চরিত্রে জটিলতা নাই, ভ্রমরের জীবন ও চরিত্র স্পষ্ট। কিন্তু রোহিণী বা গোবিন্দলালের জীবন বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিকাশ ও পরিণতি লাভ করিতেছে—লেখক যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে এই বিকাশের স্তর-পরম্পরা দেখাইয়াছেন।

নিরুদ্দিষ্ট গোবিন্দলাল ও রোহিণীর সন্ধান পাওয়া গেল। ভ্রমরের পিতা এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। হিতে বিপরীত হইল। নারীহত্যাকারী গোবিন্দলালের আর ভ্রমরের নিকট ফিরিবার কোন পথ রহিল না। দীর্ঘ সাত বৎসর অনুপস্থিতির পর ভ্রমরের মৃত্যুর সময় গোবিন্দলাল উপস্থিত হইলেন। ভ্রমরের মৃত্যুতে উপন্যাস শেষ হইল। শেষাংশ দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

পরিশিষ্ট অংশে দ্বাদশবর্ষ অজ্ঞাতবাসের শেষে সন্ন্যাসিবেশে গোবিন্দলালের হরিদ্রাগ্রামে আবির্ভাব ও ভগবৎপাদপদ্মে মন সমর্পণ করিয়া শান্তিলাভ—উপন্যাসের বহির্ভূত ঘটনা। সন্তপ্ত গোবিন্দলালের সম্মুখে ভ্রমরের শেষ নিশ্বাসত্যাগেই প্রকৃত উপন্যাস শেষ হইয়াছে।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ—জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের উইল লইয়া পিতাপুত্রে বিরোধ। কৃষ্ণকান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই উইল করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্বিনীত হরলালের তাহা সহ্য হইল না। কৃষ্ণকান্ত উইল ছিঁড়িয়া আবার উইল করিলেন—এবার হরলাল তিন আনার পরিবর্তে এক আনা। হরলাল বিধবা-বিবাহের ভয় দেখাইলেন—কৃষ্ণকান্ত হরলালকে ত্যাজ্যপুত্র করিলেন।

এই কৃষ্ণকান্তের বার বার উইল পরিবর্তন কাহিনীটিকে ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত পারিবারিক ট্র্যাজেডির মূল যে এই উইল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সকল সমালোচকই পাঠকের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ভ্রমর-গোবিন্দলাল-রোহিণীর কাহিনীর নাম 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হওয়ার কারণও ইহাই।

কৃষ্ণকান্ত ন্যায়পরায়ণ অভিজ্ঞ জমিদার। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মধ্যে একটা একরোখা গোঁ আছে, নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন ; যাহার জন্য, যে উদ্দেশ্যে তিনি উইল পরিবর্তন করিতেছেন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কিনা সেদিকে তিনি দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না। হরলালকে তিনি শাসিত করিতে পারিলেন না, পরে গোবিন্দলালের অংশ ভ্রমরের নামে লিখিয়া দিয়াও গোবিন্দলালকে তিনি সংশোধন করিতে পারিলেন না। রায় পরিবারের সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর এই জেদ বর্তমান, হয়তো ইহাই রায়বংশের আভিজাত্য বা রক্তের ধারা। কৃষ্ণকান্ত ও গোবিন্দলাল একদিক্ দিয়া উভয়েই সমান—উভয়েই তুল্যরূপ unimaginative—কল্পনাশক্তি কাহারও নাই। গোবিন্দলালের অংশ ভ্রমরকে লিখিয়া দিলে তাঁহারই বংশের ছেলে গোবিন্দলাল এ ব্যাপারটা কিভাবে গ্রহণ করিবে, তাহার পৌরুষ আহত হইবে এবং সে ভ্রমরের নিকট হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইবে, এই সহজ কথাটা কৃষ্ণকান্ত বুঝিতে পারেন নাই। গোবিন্দলালের কল্পনাশক্তির দৈন্যও যথেষ্ট আছে।

বাঙ্গালীর উইল প্রায়ই গোপন থাকে না—উইলের যাহারা লেখক ও সাক্ষী তাহারাই বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে উইলের কথা বলিয়া দিয়া কলহ ও বিরোধ বাধাইয়া দেয়। প্রবল স্বার্থসংঘর্ষ বাধিয়া উঠিলে এক একজন এক এক পক্ষে যোগ দিয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। বাঙ্গালী চরিত্রের এই দুর্বলতার উপর লেখক কটাক্ষ করিয়াছেন।

উইলের কথা জানিতে পারিয়া হরলাল রাগিয়া আগুন হইল।

'এটা কি হইল ?'

'আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে।'

'আমি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের গোঁফ পুড়াইয়া দিয়াছিলাম, এক্ষণে এই উইল সেইরূপ পুড়াইব।'

পর পর এই তিনটি বাক্যে হরলালের অবাধ্যতা, অসংযম ও অশিষ্টতার চিত্র স্পষ্ট। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত শক্ত লোক। পুত্রের রক্ত চক্ষু দেখিয়া বা তাহার হুম্‌কিতে ভয় পাইয়া মত পরিবর্তন করিবার মত মানুষ তিনি নহেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—হরলালের সংশোধনের কোনও আশা নাই বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণকান্তও আবার উইল পরিবর্তন করিতেছেন। এবার হরলালের ভাগে কিছুই থাকিবে না। এই সংবাদ পাইয়া হরলাল হরিদ্রাগ্রামে আসিল ও ব্রহ্মানন্দের সাহায্যে উইল জালের চেষ্টা করিল।

এই দুইদিন কোন স্থানে লুকাইয়া ছিলাম—বাড়ীতে উপস্থিত হইবার তাহার মুখ নাই।

দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও—বৃদ্ধ বয়সে একটু বেশী দুধ খাওয়া দরকার। মতি গোয়ালিনীকে অগ্রিম টাকা দিয়া দুধের বন্দোবস্ত করিয়া লইও। এইরূপ সাধারণ অর্থও হইতে পারে। অথবা হরলাল মতি গোয়ালিনীর সঙ্গে ব্রহ্মানন্দের একটা অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত করিতেছে তাহাও হইতে পারে। হরলাল যে প্রকৃতির লোক তাহাতে সব রকম অশিষ্ট ইঙ্গিতই সে নিরীহ ব্রহ্মানন্দকে করিতে পারে। গোয়ালা ফোয়ালার কোন এলাকা রাখি না—ব্রহ্মানন্দের এই কথাই মনে হয় শেষোক্ত ইঙ্গিতই হরলাল করিয়াছিল।

কৃষ্ণকান্ত রায়ের ও চারিজন সাক্ষীর দস্তখত করিয়া দিলেন—কোনও রকম দুষ্কর্মেই হরলাল হারে না; সে একাই পাঁচটি দস্তখত জাল করিল।

বুদ্ধির খেলাটা খেলেছ ভাল—ব্রহ্মানন্দ হরলালের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে। অল্পবয়সেই হরলাল কত বড় পাকা খেলোয়াড় হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিয়া এই প্রৌঢ় তাহার বৈষয়িক বুদ্ধির বাহাদুরী দিতেছে।

ইচ্ছা করে বটে কিন্তু ভয় করে—সাধারণ লোকের চিরকালের এই সংশয় এই দুর্বলতা। লোভ আছে অথচ সাহস নাই। সংসারের অধিকাংশ লোকই এই ধরনের।

বলি, ভায়া কি গেলে ?—যথেষ্ট সাহস নাই অথচ অসদুপায়ে অনায়াসে এতটা টাকা উপার্জন করিবার লোভও ত্যাগ করা কঠিন। তাই ব্রহ্মানন্দ হরলালকে ডাকিয়া ফিরাইলেন।

বদল করি কি প্রকারে? দেখিতে পাইবে যে?—অকার্য করিতে আর এখন কোন নীতিগত বাধা নাই; কিন্তু ধরা পড়িবার আশঙ্কাই এখন একমাত্র বাধা।

হায় ফলাহার! কত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুমি মর্মান্তিক পীড়া দিয়াছ—হজম করিবার সামর্থ্য নাই অথচ সুখাদ্য গ্রহণের লোভ আছে। ব্রহ্মানন্দ বুঝিলেন হরলালের হাজার টাকা হজম করা যাইবে না, কিন্তু এতটা টাকার লোভও ছাড়া যাইতেছে না।

সহস্র বৎসর সে সজ্জিত পাত্রের নিকট বসিয়া তর্ক-বিতর্ক করেন ইত্যাদি—মন যদি একবার লোভাবিষ্ট হইয়া পড়ে তখন বহু চেষ্টা করিয়াও মনকে দুষ্কার্য হইতে বিমুখ করা কঠিন। সজ্জিত খাদ্যদ্রব্যের নিকটে বসিয়া থাকিলে রসনা এমনই রসার্দ্র হইয়া উঠিবে যে, খাদ্য-গ্রহণের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি শেষ পর্যন্ত টিকিবে না। ব্রহ্মানন্দের সেই অবস্থা হইয়াছে। বিপদের আশঙ্কা আছে প্রচুর কিন্তু হাজার টাকার লোভও ত্যাগ করা কঠিন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মানন্দের সাহসে কুলাইল না। হরলাল রোহিণীর সাহায্য গ্রহণ করিল।

কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল—উইল বদলাইবার কৌশলটি ভালভাবে অভ্যাস করিয়াই ব্রহ্মানন্দ গিয়াছেন, কিন্তু কার্যকালে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মানন্দ পারিলেন না।

এই রোহিণীকে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে—রোহিণী এই কাহিনীর প্রতিনায়িকা। তাহার পরিচয় প্রথমে দিবার সময় লেখক এইটুকুই বলিতে চাহেন যে, ব্রহ্মানন্দের ঘরে সে রন্ধনরতা—এইটুকুই তাহার প্রকৃত পরিচয় নয়। তাহার পূর্ণ যৌবন, অসামান্য রূপ, গুণও অনেক, দোষের মধ্যে বিধবার কিছু কিছু আচরণ সে পালন করিত না।

রোহিণী শিহরিল—হরলালের গুণপণা ও প্রকৃতি কাহারও অবিদিত ছিল না। দুপুরবেলা রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া কি কথা বলিবে এই আশঙ্কায় রোহিণী শিহরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে ভাবটা অনায়াসেই সামলাইয়া লইয়া অভ্যর্থনা করিল ও নিমন্ত্রণ করিয়া সরু চালের ভাত চড়াইবার অনুমতি চাহিল।

এই পরিচ্ছেদে হরলাল-রোহিণী-সংবাদটি বেশ উপভোগ্য।

হরলাল একদিন রোহিণীকে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার সময় কতকগুলি দুষ্ট লোকের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। সে কথা রোহিণীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া সে জানিয়া লইল, রোহিণীর সেজন্য কৃতজ্ঞতা আছে কিনা এবং কোন অনুরোধ করিলে রোহিণী তাহা রক্ষা করিবে কিনা।

উইল চুরির ব্যাপার সে তখন রোহিণীকে জানাইল। রোহিণী অস্বীকার করিল।

হরলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—দীর্ঘনিশ্বাসটি কৃত্রিম, হরলাল অভিনয় করিতেছে মাত্র। রোহিণী বুদ্ধিমতী হইয়াও ইহা বুঝিতে পারিল না।

আজ যদি আমার স্ত্রী থাকিত, আমি তোমার খোসামোদ করিতাম না—হরলাল টাকার প্রলোভনে রোহিণীকে উইল চুরি করিতে রাজী করাইতে না পারিয়া শেষে অব্যর্থ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। রোহিণীর সর্বাপেক্ষা দুর্বল স্থানে আঘাত দিয়া এই বিধবা যুবতীর সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও লালসাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু হরলাল অগ্রসর হইতেছে খুব ধীরে—কৌশলী ব্যাধের মতন।

ইচ্ছা তো আছে কিন্তু মনের মত বিধবা পাই কৈ?—হরলাল বুঝিতে পারিয়াছে অস্ত্রনিক্ষেপ ঠিক মতই হইয়াছে। তাই আরও একটু অগ্রসর হইতেছে!

দেখ রোহিণী, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত—এবার হরলাল আরও অগ্রসর।

তুমিও একটা বিবাহ করিতে পাব—কেন করিবে না?—অত্যন্ত স্পষ্ট ও সরল এই প্রশ্নে রোহিণী হরলালের কথা কোন্ দিকে যাইতেছে বুঝিতে পারিল; সুতরাং খানিকটা স্ত্রীসুলভ লজ্জায় মাথার কাপড় একটু টানিয়া রোহিণী মুখ ফিরাইল।

তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রামসুবাদমাত্র, সম্পর্কে বাধে না—হরলাল চরম অস্ত্র নিক্ষেপ করিল।

বিষণ্ণ হইয়া হরলাল ফিরিয়া চলিল—হরলাল প্রায় স্পষ্ট ভাষাতেই জানাইয়াছে যে, রোহিণীর সহিত তাহার বিবাহ শাস্ত্রসম্মতভাবে হইতে পারে। কিন্তু রোহিণী এই প্রস্তাবে স্পষ্ট কোন উত্তর করিল না দেখিয়া হরলাল বুঝিতে পারিল না ব্যাপার কি দাঁড়াইল। এতখানি অভিনয়, এত বক্তৃতা সবই বুঝি নিষ্ফল হইল মনে করিয়া দুঃখিতভাবেই হরলাল চলিয়া যাইতেছিল।

কাগজখানা না হয় রাখিয়া যান, দেখি কি করিতে পারি—রোহিণীর নরম সুরের কথাতেই বুঝা গেল হরলালের অভিনয় ব্যর্থ হয় নাই, টোপ সমস্তটাই মাছে গিলিয়াছে।

নোট না, শুধু উইলখানা রাখুন—অর্থলোভে নয়, কোন্ লোভে, কি আশায় রোহিণী এ কাজ করিতে চাহিতেছে তাহা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—আসল উইল কৃষ্ণকান্তের দেরাজ হইতে রোহিণী চুরি করিল ও জাল উইলখানি সেখানে রাখিয়া আসিল।

ভাল, সন্দেহ রাখার দরকার কি?—রোহিণী দেখিতে চায়, কৃষ্ণকান্তের উইল দেরাজের কোন্‌খানে আছে এবং কোন্ স্থান হইতে চাবি লইয়া দেরাজ খুলিতে হয়।

এ কি জেলের চাবি পড়িল?—আফিংয়ের নেশায় স্বপ্ন ও বাস্তব মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বাস্তবে যাহা ঘটিতেছে তাহা মনে হইতেছে স্বপ্ন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—রোহিণী আসল উইলখানা চুরি করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু হরলাল তাহা রোহিণীর নিকট হইতে আদায় করিতে পারিল না। ইহা লইয়া উভয়ে বিবাদ বাধিল—যে চুরি করে, কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র তাহাকে গৃহিণী করিতে পারে না—হরলালের এই কথায় রোহিণী হরলালকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিয়া দূর করিয়া দিল।

ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মানন্দ বাড়ী ছিল না—হরলালের রান্নাঘরের ভিতর উঁকি দিয়া দেখার ভঙ্গীটি সংশয়জনক; হঠাৎ কেহ দেখিলে হরলালের সঙ্গে রোহিণীর একটা অবৈধ প্রণয়-সম্পর্ক কল্পনা করিয়া ফেলিত।

রোহিণী বড় চাহিয়া দেখে না—রোহিণী কাজ হাসিল করিয়া আসিয়াছে। আসল উইলখানা তাহার কাছেই। এখন গরজ হরলালের। রোহিণী উদাসীনতার ভান করিয়া দর বাড়াইতেছে।

চাহিয়া দেখ, হাঁড়ি ফাটিবে না—হরলাল পূর্বদিনের মত প্রণয়ের অভিনয় করিয়া যাইতেছে। উইলখানা আগে হাতে আসুক।

তোমার কাছে থাকাও যা, আমার কাছে থাকাও সে—রোহিণী প্রলুব্ধ হইয়া চুরি করিয়াছে। কিন্তু বিষয়বুদ্ধিতে সে হরলালের চেয়ে কম নয়। উইলখানা সে হাতছাড়া করিতেছে না। পূর্বদিন হরলালের কথায় যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল, এই কথার মধ্য দিয়া হরলালকে সে তাহা স্মরণ করাইয়া দিল।

যখন আপনি বিধবা বিবাহ করিবেন তখন আপনার স্ত্রীকে এই উইল দিব—রোহিণী হরলালের উপর টেক্কা দিয়াছে। এইবার হরলালকে হয় রাজী হইতে হইবে, নতুবা মুখোস খুলিতে হইবে।

হরলাল বুঝিল উপযুক্ত হইয়াছে। রোহিণীও বুঝিল উপযুক্ত হইয়াছে—হরলাল বুদ্ধির খেলায় যে রোহিণীর নিকট পরাজিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিল। টাকার লোভ দেখাইয়া বা প্রণয়ের অভিনয় করিয়া কিছুতেই রোহিণীর নিকট হইতে আসল উইল সে আদায় করিতে পারিবে না। রোহিণীও বুঝিতে পারিল উইল চুরি করাতে হরলালের সঙ্গে তাহার বিবাহের কোন সম্ভাবনাই নাই।

রোহিণীও বুঝিল সে হারিয়াছে—হরলাল কার্যসিদ্ধির জন্য প্রণয়ের অভিনয় করিয়াছে মাত্র। তাহার এই অপমান ও প্রত্যাখ্যান তাহার দুষ্কর্মের দণ্ড।

হরলাল পুরুষ মানুষ, এই পরাজয় হাসি দিয়া ঢাকিয়া সে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু রাগে দুঃখে রোহিণীর চোখে জল আসিল।

হরলাল চলিয়া গেল বটে, কিন্তু একটি ফুৎকারে যে স্তিমিত অগ্নিকে শিখারূপে জ্বালাইয়া গেল তাহা একদিন একটি দাম্পত্য-জীবনকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিবে। রোহিণী বালবিধবা; নিজের দুর্ভাগ্যকে নতশিরে বহন করিয়া চলিতে পারে, এমন প্রকৃতি তাহার নয়। অবশ্য সমাজের আরও দশজন মন্দভাগিনীর মতন যাহা হারাইয়াছে এবং যাহা পাইল না তাহার জন্য দুঃখ করিয়াই হয়তো তাহার অবশিষ্ট জীবন কাটিত; কিন্তু হরলালের সঙ্কেতময় প্রলোভন তাহার মনে আশার সঞ্চার করিয়া, কামনার আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়া তাহার শিথিল সংযমকে শিথিলতর করিয়া তুলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে গিয়া রোহিণীর ক্রন্দন। যাহার চাকরাণী নাই তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সংবাদ, কোন্দল এবং ময়লা এই চারিটি জিনিস নাই—ব্রহ্মানন্দ ঘোষ গরীব মানুষ—তাহার ঘরে ঝি-চাকরাণী নাই, বাসন মাজা, জল তোলা রোহিণীকেই করিতে হয়। এই বিষয়টি বলিতে গিয়া দাসী-চাকরাণী সম্বন্ধে লেখক একটি মন্তব্য করিয়াছেন। মন্তব্যটি একটু অবান্তর হইলেও বেশ উপভোগ্য। লোকে সুবিধার জন্য দাসী-চাকরাণী রাখে, কিন্তু ইহারা এমন অশান্তি মাঝে মাঝে সৃষ্টি করে যে মনে হয়, এ আপদ বাড়ীতে না রাখিলেই গৃহস্থের মঙ্গল। ধূর্ততা ও প্রবঞ্চনা ইহাদের স্বভাব, মিথ্যা গুজব রটাইয়া, একজনের কথা অন্যজনের কানে দিয়া ইহারা পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে, রাত দিন ঝগড়া করা ইহাদের অভ্যাস এবং বাড়ীময় ময়লা-আবর্জনা ইহারা জমাইয়া রাখে।

দল বাঁধিয়া যত হাল্‌কা মেয়ের সঙ্গে ইত্যাদি—রোহিণীর চালচলন একটু আলাদা রকমের। পাড়ার অল্পবয়সের মেয়েরা জল আনিতে যায়, তাহাদের সহজ আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে একটা হাল্‌কা ভাব ফুটিয়া উঠে। রোহিণী তাহাদের সাহচর্যে আনন্দ পায় না। তাহার অপরিতৃপ্ত হৃদয় তাহার মনে একটা গাম্ভীর্য সঞ্চার করিয়াছিল।

ঊর্ধ্ব বিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ—মার্জার ও কোকিল রোহিণীর কটাক্ষে বিদ্ধ হইত—ইহা লেখকের শ্লেষ।

কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে—বসন্তের

পুষ্পপ্রাচুর্যের মধ্যে বারুণী পুষ্করিণীর তীরে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। রোহিণীর চিত্ত এই কোকিলের ডাকে বিচলিত হইল। এই প্রসঙ্গে লেখক নর-নারীর জীবনে কুহরবের প্রভাব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছেন। কোকিলের ডাক, তাহার মধুর অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর বাস্তবিকই অনেক সময় মানুষকে উদাস করিয়া দেয়। এই ডাক শুনিলে মনে হয়, জীবনের কী যেন মহামূল্য জিনিস হারাইয়া গিয়াছে এবং জীবন যেন অসার হইয়া পড়িয়াছে। একটা অতৃপ্তি, হৃদয়-দাহকারী একটা তৃষ্ণা যেন কিছুতেই মিটিতেছে না।

কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল—বারুণী পুষ্করিণীর অপরূপ শোভার মধ্যে, বসন্তের পুষ্পসমারোহের মধ্যে কোকিলের ডাক শুনিয়া রোহিণী নিজ হৃদয়ের রিক্ততা অনুভব করিল। তাহার নিরানন্দ ব্যর্থ জীবনের বোঝা মৃত্যু পর্যন্ত বহিয়া যাইতে হইবে। অপরিতৃপ্ত কামনার রাশি নিরন্তর তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। ক্রন্দন ব্যতীত তাহার আর উপায় কি ?

কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না—অতৃপ্তি, ভোগাকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাখ্যান, প্রতিশোধগ্রহণের স্পৃহা,—বহু প্রকার ভাব মিলিয়া রোহিণীর মানসিক অবস্থাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং কোন্ দুঃখ যে রোহিণীকে কাঁদাইতেছে তাহা সঠিকভাবে বলা লেখকের পক্ষে কঠিন। নারীহৃদয়ের জটিলতা, তাহার সুখ-দুঃখের রহস্য আবিষ্কার করা সহজ নয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—গোবিন্দলালের সহিত রোহিণীর প্রথম সম্ভাষণ।

এ সকল এক রকম বুঝানো যায়—বারুণী পুষ্করিণীর সুন্দর পরিবেশ, চারিদিকে বিচিত্র পুষ্পপত্রের মধ্য দিয়া বসন্তশোভার বিকাশ, কোকিলের তান প্রভৃতি বাহ্য ব্যাপার।

কিন্তু রোহিণীর মনের কামনা ও বাহিরের এই পরিবেশ রোহিণীর প্রণয়তৃষ্ণার্ত বঞ্চিত হৃদয়ের মধ্যে কি আলোড়ন তুলিয়াছে তাহার বর্ণনা করা কঠিন।

আমিও গোলে পড়িলাম, গোবিন্দলালও বড় গোলে পড়িল—রোহিণীর ক্রন্দনের সঠিক ব্যাখ্যা যে শুধু লেখকই করিতে পারিতেছেন না তাহা নয়—আরও একজন তাহা লক্ষ্য করিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি বর্তমান উপন্যাসের নায়ক গোবিন্দলাল। রোহিণীর জীবন লইয়া লেখক স্বয়ং বিপন্ন একথা তিনি ইঙ্গিতে বলিয়াছেন এবং রোহিণীকে লইয়া অতঃপর গোবিন্দলাল বিপন্ন হইবেন, সে কথারও আভাস এইখানে দিতেছেন। গোবিন্দলালের সেই ভাবী বিপদের সূচনা এইখানে। লেখক যেন অস্পষ্টভাবে বলিতে চাহিতেছেন

যে, রোহিণীর প্রতি সহানুভূতি তাঁহার ও গোবিন্দলালের উভয়েরই আছে—কিন্তু কেহই রোহিণীকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং রোহিণীর প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি সত্ত্বেও উভয়কেই রোহিণীকে হত্যা করিতে হইবে। সেই গোলের এই স্থচনা।

হরলালের প্রণয়ের অভিনয় রোহিণীর হৃদয়ের স্থপ্ত কামনাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান ও অপমান তাহার হৃদয় ভাঙিয়া দিয়াছে। রোহিণীর অন্তরের ক্রন্দন লেখক যেন শুনিতে পাইতেছেন, কিন্তু লেখকের নীতিবোধ এবং গোবিন্দলালের মধুর দাম্পত্য-জীবন মাঝখানে থাকিয়া বাধা স্থষ্টি করিতেছে ; তাই রোহিণীকে লইয়া লেখক বড় গোলে পড়িয়াছেন।

রোহিণী কি ভাবিতেছিল বলিতে পারি না—এই কথা বলিয়া লেখক দক্ষতার সহিত রোহিণীর মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া রোহিণীর মনোভাব এইরূপ দাঁড়ায় :—রোহিণীর বালবৈধব্যের জন্য তাহার দায়িত্ব কতখানি ? কি পাপ সে করিয়াছে যে, জীবনের সকল সুখ হইতে সে বঞ্চিত হইবে ? দুঃখভোগই যদি তাহার অদৃষ্ট তবে এত রূপযৌবন সে পাইল কেন ? যাহারা সকল সুখে সুখী তাহারা কি রোহিণীর চেয়ে গুণবতী ? নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে ও সমাজের বিরুদ্ধে একটা অস্পষ্ট বিদ্রোহের ভাব এবং পরশ্রীকাতরতা, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এই দুইটি ভাব রোহিণী-চরিত্রে এখন ধরা পড়িতেছে।

দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সংবরণ করে না—রোহিণীর হৃদয়ের ঈর্ষা ও অসূয়ার প্রতি লেখকের সহানুভূতি নাই। কিন্তু রোহিণীর ক্রন্দনের মধ্যে যে বেদনা প্রকাশ পাইতেছে সেই বেদনাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা কর্তব্য।

তোমরা রোহিণীর জন্য একবার আহা বল—সুনীতি-দুর্নীতির সকল প্রশ্ন মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া গিয়া লেখক রোহিণীর দুঃখে পাঠককে একটু সহানুভূতি জানাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু এখানেও লেখক সতর্ক ; রোহিণীর জন্য একবার 'আহা' বলিতেই তিনি অনুরোধ করিয়াছেন মাত্র। প্রতিকারহীন দুঃখের সম্মুখে রোহিণীর নিয়তি রোহিণীকে ঠেলিয়া দিতেছে, সহানুভূতি প্রকাশ ব্যতীত লেখক বা পাঠক আর কি করিতে পারেন ?

একটু দুঃখ উপস্থিত হইল—উদারহৃদয় পরদুঃখকাতর গোবিন্দলালের পক্ষে ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

এ স্ত্রীলোক সচ্চরিত্রা হউক, দুশ্চরিত্রা হউক—গোবিন্দলাল প্রথম মনে করিয়াছিলেন রোহিণী পাড়ার কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আসিয়া কাঁদিতেছে। কিন্তু অনেকক্ষণ একই স্থানে একই ভাবে বসিয়া কাঁদিতে দেখিয়া গোবিন্দলালের

পূর্ব ধারণার পরিবর্তন হইল। কিন্তু স্ত্রীলোকটি কি দুঃখে কাঁদিতেছে তাহা গোবিন্দলাল জানেন না। কিন্তু একজন যে মনের দুঃখে কাঁদিতেছে তাহাই যথেষ্ট। সহানুভূতিতে এ ক্রন্দনরতার দুঃখ নিবারণ করা যায় কিনা এই চিন্তা করিয়া রোহিণীর দিকে গোবিন্দলাল অগ্রসর হইলেন। রোহিণীর রোদনরতা মূর্তির অপরিহার্য আকর্ষণে গোবিন্দলাল অগ্রসর হইয়া মনে মনে এই যুক্তিজাল রচনা করিতেছেন কিনা বলা যায় না। সহানুভূতি জানাইতে চারিত্রিক প্রশ্ন উঠে কেন? মনে হয়, রোহিণীর দিকে নিজ হইতে অগ্রসর হইবার সময় একটা অস্পষ্ট দুর্বলতা গোবিন্দলাল মনে মনে অনুভব করিয়াছেন এবং মানুষ হইয়া মানুষের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছি এই রকম একটা মানবতার নীতি আওড়াইয়া দুর্বল মনকে প্রবোধ দিতেছেন।

রোহিণী দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল—হরলালের কথা শুনিয়া রোহিণী শিহরিয়া উঠিয়াছিল। এখন নিকটে গোবিন্দলালকে দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। পুরুষের উপস্থিতি, যাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র রহস্যের গন্ধ আছে, তাহা প্রণয়-সম্ভাবনা বহন করিয়া আনে, কাজেই উহা রোহিণীর প্রণয়-বুভুক্ষু হৃদয়ে চমক ও শিহরণ সৃষ্টি করিল।

যে রোহিণী হরলালের সঙ্গে মুখরার ন্যায় কথোপকথন করিয়াছিল····· পারিল না—ইহা রোহিণীর অভিনয় নয়; গোবিন্দলালের কণ্ঠস্বরে যে সহানুভূতির স্পর্শ সে পাইয়াছিল তাঁহাতেই সে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। হরলালের সহিত চলিয়াছিল রোহিণীর বুদ্ধি ও ধূর্ততার যুদ্ধ। হরলালের প্রকৃতিও রোহিণী জানিত। স্বার্থহানিতে প্রত্যাখ্যানে, অপমানে জ্বলিয়া হরলালকে সে তিরস্কার করিয়া দূর করিয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের অযাচিত সহানুভূতির প্রকাশ তাহার হৃদয় গলাইয়া দিয়াছে। কথার উত্তর দিবার তাহার শক্তি ছিল না। রোহিণী নিজেও জানে না, কিন্তু এক মুহূর্তেই সে গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়ানুভব করিয়াছে।

গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন—রোহিণীর বালবৈধব্য ও তজ্জনিত দুঃখের কথাই গোবিন্দলালের মনে উদয় হইল। রূপযৌবনসম্পন্না নারীর এত সৌন্দর্য অথচ কী গভীর ইহার জীবনের দুঃখ। গোবিন্দলালের মানসিক অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে প্রথমে করুণা-সহানুভূতি হইতে সঞ্জাত একটা স্নেহের (প্রণয়ের) আকর্ষণও নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি বোধ করিতেছেন।

একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে—রোহিণীর কথার এই দৃঢ়তা কি সূচনা করিতেছে তাহা স্পষ্ট নয়। গোবিন্দলালের সমবেদনা রোহিণীর হৃদয়ে

শক্তিসঞ্চার করিয়াছে; হয়তো গোবিন্দলাল তাহার অজেয় নহে ইহা সে তখন অনুভব করিয়াছে এবং এই কথার মধ্য দিয়া সেই প্রত্যয় প্রকাশ পাইয়াছে। পুরুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রণয়ের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলে নারী অন্তরে যথেষ্ট শক্তি অনুভব করে, বিশেষ করিয়া যদি সেই পুরুষকে জয় করা তাহার কাম্য হয়।

গোবিন্দলাল চলিয়া গেলে রোহিণী ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িল এবং শূন্য কলসী জলে পূর্ণ করিল। এই জলে ঝাঁপাইয়া পড়া ও বক্ বক্ গল্ গল্ করিয়া কলসীতে জল ভরার চিত্র হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রত্যাখ্যাতা অপমানিতা রোহিণীর সমস্ত বেদনা-গ্লানি নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া কী আনন্দে তাহার হৃদয় আপ্লুত হইয়াছে।

পরে অন্তঃশূন্য কলসী পূর্ণতোয়া হইলে—গোবিন্দলাল রোহিণীর শূন্যহৃদয় পূর্ণ করিয়া দিয়া গেলেন। কলসীর পূর্ণতোয়তা রোহিণীর শূন্যহৃদয়ের সাময়িক পূর্ণতার সূচনা করিতেছে।

কাজটা ভাল হয় নাই—উইল-চুরি কাজটা যে ভাল হয় নাই উহা আবার নূতন করিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু এই বোধ নৈতিক,—বুদ্ধিসঞ্জাত নয়। গোবিন্দলালের প্রতি সে একটা আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে, সেই গোবিন্দলাল মাত্র এক পাই পাইবে। ইহাই তাহার অনুশোচনার কারণ। এই ভালমন্দজ্ঞানের মূলে রহিয়াছে রোহিণীর গোবিন্দলালের প্রতি অস্পষ্ট প্রণয়াসক্তি।

উপায় আমি, দড়ি সহযোগে—গোবিন্দলাল যে বঞ্চিত হইবে এই দুঃখে রোহিণীর মরিতে ইচ্ছা করিতেছে। পুরুষ-হৃদয়ের সামান্য প্রীতি পাইলে রোহিণী করিতে পারে না এমন কাজ নাই। হরলালের সহিত বিবাহ হইবে এই ভরসায় একবার উইল চুরি করিতে পারিয়াছিল, এখন গোবিন্দলালের সহানুভূতির প্রতিদানে সে মরিতে পারে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—সেই রাত্রি রোহিণী জাগিয়া কাটাইল; তাহার হৃদয়ে সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে। গোবিন্দলালের সর্বনাশ করা সম্ভব নয়, কিন্তু যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা সংশোধন করিবার উপায় কি? অনেক ভাবিয়াও রোহিণী এ সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না—অবশেষে গোবিন্দলালের মূর্তি চিন্তা করিয়া সমস্ত রজনী বিনিদ্র কাটাইল।

আমার কাছে একটা মোটা কথা শুন—দর্শন-বিজ্ঞানের যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের হৃদয়ে এই দ্বন্দ্ব, বিপরীতমুখী

দুইটি ভাবের সংঘর্ষ দেখা যায়। রোহিণীর হৃদয়ও এক গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্বে মথিত হইতেছে।

রোহিণী দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে কাঁদিল—গোবিন্দলালের প্রতি নবজাত আসক্তির প্রমাণ। রোহিণীর প্রেমের গভীরতা নাই, নিষ্ঠাও হয়তো নাই, কিন্তু প্রথম আকর্ষণের তীব্রতা অনস্বীকার্য।

নবম পরিচ্ছেদ—রোহিণী অতঃপর প্রতিদিন বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যায়, কোকিলের ডাক শুনে, গোবিন্দলালকে দেখে এবং অন্তরে সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব অনুভব করে। গোবিন্দলালের মূর্তি রোহিণীর মানসপটে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল এবং গোবিন্দলালের প্রতি সে প্রণয়াসক্ত হইল। কিন্তু গোবিন্দলালের নিকট এ কথা বলিবার নয়, সুতরাং মনের কথা মনেই লুকাইয়া রাখিল। জীবন-ভার বহন করা রোহিণীর পক্ষে কঠিন মনে হইল, সে মনে মনে রাতদিন মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু গোবিন্দলালের সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে—রোহিণী স্থির করিল পূর্বে যেমন ভাবে উইল চুরি করিয়াছিল, সেইভাবে আসল উইলখানা রাখিয়া জাল উইলটা লইয়া আসিবে। কিন্তু এইবার রোহিণী ধরা পড়িল।

কিন্তু সুমতি-কুমতির সদ্ভাব অতিশয় বিপত্তিজনক—বিবেকবোধ যখন অসাড় হইয়া যায়, তখন অন্যায়ের পথে, পাপের পথে কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না। মানুষের পক্ষে এই অবস্থা অত্যন্ত অকল্যাণকর।

কেন যে এত কালের পর তাহার এ দুর্দশা হইল ইত্যাদি—গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর এই আসক্তির কারণ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কোন একটা ব্যাপার বা ঘটনার উপর জোর দিয়া কিছু বলা যায় না। তবে যে কারণ পরম্পরা ঘটিয়া গিয়াছে লেখক সেইগুলির উল্লেখ করিতেছেন।

একেবারেই বুঝিল যে মরিবার কথা—রোহিণীর অবৈধ আসক্তি যে কার্যতঃ কখন সফলতার পথে অগ্রসর হইতে পারে না সে বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিল। কিন্তু সমস্ত জানিয়াও বুঝিয়াও সে এ পথ হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা করে না।

অনেক সুখী জনে মৃত্যু কামনা করে—পার্থিব সুখের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছে, সুখের স্বপ্ন হঠাৎ কোন্ দিন ভাঙিয়া যাইবে এই আশঙ্কায়ও সুখী মৃত্যু কামনা করে। যে পাইয়াছে তাহারও সর্বদা ভয়—কখন হারাই।

কেহ কেহ তাহা পারে, কিন্তু রোহিণী সে দলের নহে—রাতদিন মৃত্যু কামনা করে অথচ আত্মহত্যা করিতে সাহস পায় না। বেশীর ভাগ লোকই এই প্রকার। দুইচার জন অবশ্য সাহস করিয়া আত্মহত্যা করে। কিন্তু রোহিণীর সে সাহস নাই।

ধরা পড়ি পড়িব—রোহিণী গোবিন্দলালের কল্যাণ-কামনায় বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু এই স্বেচ্ছায় বিপদ্-বরণ কি কেবলই সৎকর্মের জন্য? ধরা পড়িলে গোবিন্দলালের সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যাইবে। মনের গুপ্ত কোণে এইরূপ একটা ভরসা ছিল না কি?

এই যুবতীর স্থিরতা, নিশ্চয়তা, দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইতে লাগিলেন—কৃষ্ণকান্ত যখন প্রথম জাগিয়া উঠিয়া 'কে ও' বলিয়াছিলেন তখন রোহিণীর ভয় হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সাময়িক। যে কাজের জন্য আসিয়াছে তাহা অসমাপ্ত রাখিয়া আত্মরক্ষার সঙ্কল্প তাহার ছিল না। রোহিণীর যেন কোন ভয় নাই, কোন ভবিষ্যতের চিন্তা নাই। কৃষ্ণকান্ত তাঁহার বহুদিনের তীক্ষ্ণবুদ্ধি দিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না—যে চুরি করিতে আসিয়াছে, সে এই অসীম সাহস পায় কি করিয়া।

দশম পরিচ্ছেদ—অতি প্রত্যূষে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের নিকট দাসীমহল হইতে সংবাদ গেল যে, রোহিণী গতরাত্রে চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে এবং কাছারীর গারদে আবদ্ধ আছে। ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধুর দাম্পত্য-জীবনের একটি ছবি এই পরিচ্ছেদে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'আবার তুমি এখানে কেন?'

'তুমি এখানে কেন?'

'আমি একটু বাতাস খেতে এলাম। তাও কি তোমার সইল না।'

'স'বে কেন? এখনই আবার খাই খাই?'

'তুমি আর একবার নথ নাড়ো, ভোমরা! আমি আর একবার দেখি।'

স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের এই টুকরাগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় কত স্বচ্ছ, কত অনাবিল গতিতে ভ্রমর-গোবিন্দলালের দাম্পত্য-জীবনের ধারা বহিয়া যাইতেছিল।

রোহিণীর ধরা পড়িবার সংবাদ চাকরাণী মহলে যে আলোড়ন ও বিস্ফোরণ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে চিত্রিত হইয়াছে। এতদিন পরে একটা খবরের মত খবর আসিয়াছে। এক নম্বর হইতে পাঁচ নম্বর সমস্ত চাকরাণীর দল প্রত্যেকেই ধীরে ধীরে চাখিয়া চাখিয়া একটু একটু করিয়া ছাড়িতেছে—সবটা একসঙ্গে বলিয়া ফেলিলেই যে মিটিয়া যাইবে।

গোবিন্দলালের বিশ্বাসই ভ্রমরের বিশ্বাস—ভ্রমর নিজের বলিয়া কিছু রাখে নাই। তাহার চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস সবই গোবিন্দলালের নিকট বিলাইয়া

দিয়াছিল। স্বামীর চোখ দিয়া সে দেখিত, স্বামীর মন দিয়া সে বুঝিত। এইভাবে সর্বস্ব ঢালিয়া দিয়া ভালবাসার জন্যই গোবিন্দলালও কালো রূপে মুগ্ধ ও গুণে পরিতৃপ্ত ছিলেন।

সে তোমায় কালো না বলিয়া উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে—ইহা গোবিন্দলালের নিছক দুষ্টামি। ভ্রমরের কালো রং লইয়া ভ্রমরকে একটু আঘাত করিয়া তাহাকে ক্ষেপাইয়া রাগাইয়া আর একবার নথ নাড়া দেখিবার ইচ্ছা।

রোহিণীকে বাঁচাইতে—নিবিড় প্রেমের ফলে উভয়ের হৃদয় উভয়ের নিকট স্বচ্ছ দর্পণের মত প্রতিভাত হইতেছিল। রোহিণীর কথা শুনিয়া গোবিন্দলাল যে রোহিণীর উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন ভ্রমর তাহা বুঝিতে পারিয়াছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ—রোহিণীর জন্য কৃষ্ণকান্তের নিকট গোবিন্দলালের ওকালতি।

দেখিলে বজ্জাতি—রোহিণী যদি সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়া মার্জনা চাহিত তবে কৃষ্ণকান্ত ক্ষমা করিতেন। একটি স্ত্রীলোকের উপর দণ্ডবিধান করিতে তাঁহার আভিজাত্যে বাধিত। কিন্তু রোহিণীর সত্যগোপনের দৃঢ় সঙ্কল্পই কৃষ্ণকান্তকে রোহিণীর প্রতি সহানুভূতিহীন করিয়া তুলিয়াছে।

বাবাজীর কিছু গরজ দেখছি—রোহিণীর কটাক্ষপাতে প্রথমেই গোবিন্দলাল অনমনস্ক হইয়া কৃষ্ণকান্তের কথা শুনিতে পায় নাই, তাও বৃদ্ধের দৃষ্টি এড়ায় নাই। রোহিণীর প্রতি ভ্রাতুষ্পুত্রের একটু আকর্ষণ আছে তাহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন; এবার গোবিন্দলালের ওকালতিতে নিজের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আরও নিঃসংশয় হইলেন।

আমিও তার উপর এক চাল চালিব—গোবিন্দলাল স্বয়ং রোহিণীর জামিন হইতেছে ইহা কৃষ্ণকান্ত ভাল চোখে দেখেন নাই। গোবিন্দলালের গরজের মূলে রোহিণীর প্রতি আসক্তি আছে তাহা তিনি পূর্বেই কল্পনা করিয়াছিলেন। রোহিণী যাহাতে গোবিন্দলালকে নির্জনে একা না পায় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। সুতরাং সমস্ত প্রকার অকল্যাণ নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় গোবিন্দলালের স্ত্রীর সাক্ষাতে উভয়ের কথোপকথন। গোবিন্দলালের চালাকির উপর টেক্কা দিয়াছেন মনে করিয়া বৃদ্ধ আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—কলঙ্কের বন্ধনে রোহিণীর প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ।

আমাকে উহার কাছে একা রাখিয়া যাইতে যদি তোমার ভয় হয়, তবে না হয় আড়াল হইতে শুনিও—গোবিন্দলাল একথা বলা মাত্র ভ্রমর অপ্রতিভ হইয়া স্থান ত্যাগ করিল। ওদিক্ মাড়াইল না।

আমি অবিশ্বাসযোগ্য কথাও কখনও কখনও বিশ্বাস করি—বক্তার কথা যদি আন্তরিক বলিয়া বোধ হয়, তবে সাধারণ লোকে যে কথা অবিশ্বাস করে গোবিন্দলাল সে কথা বিশ্বাস করেন।

তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব—রোহিণী গোবিন্দলালকে লইয়া কি পরীক্ষা করিতে চাহিতেছে যে গোবিন্দলালকে সে জয় করিতে পারিবে কিনা ও ভ্রমরের নিকট হইতে তাহাকে ছিনাইয়া লইতে পারিবে কিনা। পূর্বেই রোহিণী বলিয়াছে তাহা অসম্ভব। এ পরীক্ষা, শুধু রোহিণীর মনোভাব-জ্ঞাপনে গোবিন্দলালের মনের কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা দেখিবার ইচ্ছা।

এই কেশ—আপনি কাঁচি আনিতে বলুন ইত্যাদি—রূপ, সজ্জা, প্রসাধন, কালো চুলের গোছা এ সকলে তাহার প্রয়োজন কি? রোহিণীর কথা বলিবার ভঙ্গী—সে যে কত অসহায়, চুলের গোছাও সে যে এখনই কাটিয়া ফেলিতে পারে, ইত্যাদি নাটকীয় উক্তি গোবিন্দলালকে ব্যথিত করিয়াছে, রোহিণীর ভাগ্য ভাল, ভ্রমর বা অপর কোনও স্ত্রীলোক এ সময় উপস্থিত ছিল না।

যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই, যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব না—গোবিন্দলাল রোহিণীকে কাঁদিতে দেখিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তাহার কি দুঃখ জানিতে পারিলে সাধ্যমত তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়াছিলেন। গোবিন্দলালের দিক্ হইতে তাহা সহানুভূতি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু সেই ব্যাপারটা রোহিণী এত নাটকীয় ভঙ্গীতে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল যে, গোবিন্দলাল অভিভূত হইয়া পড়িলেন। গোবিন্দলাল তখনও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না, রোহিণীকে এমন জিনিস তিনি কি দিয়াছেন!

ইহজন্মে আমি বলিতে পারিব না—কি—রোহিণীর বাক্‌চাতুর্য প্রশংসনীয়। "আর কিছু বলিবেন না" বলিয়া গোবিন্দলালকে কোন প্রশ্ন করিতে না দিয়া তাহার কথাগুলি সে তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিতে চায়। এমন সুযোগ জীবনে আর মিলিবে না।

এ রোগের চিকিৎসা নাই, আমার মুক্তি নাই, আমি বিষ পাইলে খাইতাম—আর বলিবার বাকী রহিল কি? গোবিন্দলাল তো দূরের কথা, নিতান্ত অন্ধের নিকটও রোহিণীর সমস্ত মনটাই ইহার পর স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইবে।

একবার ছাড়িয়া দিন, কাঁদিয়া আসি—রোহিণীর প্রণয় ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার বাক্‌চাতুর্য প্রকাশ পাইয়াছে আরও বেশী।

প্রেম মানুষকে (বিশেষতঃ নারীকে) মূক করিয়া তোলে, বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটিতে চায় না। (বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনীকে পাঠক-পাঠিকা স্মরণ করিবেন)। এত প্রগল্‌ভতা আসিল কোথা হইতে ?

রোহিণী যেন নানা অস্ত্র-ব্যবহারে পারদর্শী রণনিপুণ সেনাপতি, শত্রুর দুর্গে বিজয়-পতাকা উড়াইবার পূর্বে সমস্ত শক্তি দিয়া যেন চরম আঘাত হানিতেছে।

রোহিণি, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই—একটি বিধবা সুন্দরী নারীর মুখে এই প্রেমনিবেদন শুনিয়া গোবিন্দলালের মনে যে প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহাতে গোবিন্দলালের চরিত্রের মূল কথাটি উজ্জ্বল হইয়াছে। তাঁহার রাগও হইল না, আনন্দও হইল না—হইল একটু দুঃখ। মৃত্যু ব্যতীত এ রোগের শান্তি নাই, কিন্তু একজন যুবতী নারী অবৈধ প্রণয়ের জ্বালা মিটাইতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিবে ইহা গোবিন্দলালের ভাল লাগিল না।

আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন? —তাহার এই প্রেম জ্ঞাপনের প্রতিদানস্বরূপ গোবিন্দলালের মুখ হইতে একটু স্বীকারোক্তি, অসতর্ক মুহূর্তে একটি কথা বাহির করিবার কী চেষ্টাই রোহিণা করিতেছে। গোবিন্দলালকে যাচাই করিবার কোন ত্রুটিই রোহিণী করে নাই।

এ পর্যন্ত আমরা গোবিন্দলালকে নিষ্পাপ ও আনন্দচরিত্র দেখিলাম। ইহার পর ঘটনাপরম্পরা এমনভাবে জোট বাঁধিল, নানাস্থান হইতে বিরোধী শক্তিগুলি আসিয়া এমনভাবে দল বাঁধিয়া দাঁড়াইতে লাগিল যে, গোবিন্দলাল যেন কতকটা নিয়তি-তাড়িত হইয়াই পতনের অভিমুখে ধাবিত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—গোবিন্দলালের চেষ্টায় কৃষ্ণকান্তের হাত হইতে রোহিণী মুক্তি পাইল।

ভ্রমর শ্বশুরকে কোনপ্রকার অনুরোধ করিতে রাজী হইল না—বৈষয়িক ব্যাপারে ভ্রমর কোন কথা লইয়া কৃষ্ণকান্তের নিকট যায় নাই, আর বালিকা কুলবধূ হইয়া কৃষ্ণকান্ত যাহাকে শাস্তি দিতে চাহেন তাহার জন্য অনুরোধ করা ভ্রমরের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কিন্তু গল্পের অনুরোধে ভ্রমরকে দিয়া রোহিণীর মুক্তির ব্যবস্থা করিলে কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের গরজ এবং দুর্বলতার সন্ধান পাইতেন না।

রোহিণীর কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে বলিতে প্রাতে তাঁহার কোন লজ্জা করে নাই, এখন একটু লজ্জা করিতে লাগিল—লেখকের এই উক্তিটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নিদর্শন। সকালবেলায় গোবিন্দলাল রোহিণীর হইয়া ওকালতি করিতে গিয়াছিলেন রোহিণীকে সহায়হীনা ভাগ্যবিড়ম্বিতা মনে করিয়া। কিন্তু এখন রোহিণীর নিজ

মুখ হইতে তিনি শুনিয়াছেন তাহার প্রণয়াসক্তির কথা, ইহার জন্যই মনের ভিতর একটা লজ্জা ও দুর্বলতা দেখা দিয়াছে। এখন রোহিণীর হইয়া কৃষ্ণকান্তকে অনুরোধ করিতে গোবিন্দলালের বাধিতেছে।

বুড়া রঙ্গ দেখিতে লাগিল—গোবিন্দলালের দুর্বলতা কোথায় এবং কেন, তাহা কৃষ্ণকান্ত বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসিতেছেন। গোবিন্দলাল যে রোহিণীর কথা বলিতে আসিয়াছেন এবং লজ্জাবশতঃ কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণকান্ত মনে মনে কৌতুক বোধ করিতেছেন।

তোমরা যদি বিবেচনা কর উহার কোন দোষ নাই, তবে ছাড়িয়া দাও—কৃষ্ণকান্ত পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুরোধে রোহিণীকে শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু গোবিন্দলালকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার কঠোর শাস্তির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এখন গোবিন্দলালের দুর্বলতা বুঝিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং রোহিণীকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার স্পষ্ট আদেশ দিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ—ভ্রমর গোবিন্দলালের মুখ হইতেই শুনিল, রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালবাসে।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। রোহিণী রাজী হইয়াছিল, কিন্তু বাড়ী আসিয়াই সে মত বদলাইল।

রোহিণীর চরিত্রের বিকাশের দিক্ দিয়া অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রোহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া যাইবে না স্থিরসিদ্ধান্ত করিল। এই হরিদ্রাগ্রাম তাহার স্বর্গ—এখানেই সে সজ্ঞানে পুরুষের প্রতি সর্বপ্রথম প্রণয়ের আকর্ষণ অনুভব করিয়াছে। এ স্থান ত্যাগ করিয়া গেলে তাহার পক্ষে গোবিন্দলালকে দেখা সম্ভব হইবে না। কিন্তু এই মানসিক দুর্বলতাকে রোহিণী সহজে প্রশ্রয় দেয় নাই। সে বার বার ভগবানের কাছে, তাহার পরিচিত দেবদেবীর নাম করিয়া শক্তি প্রার্থনা করিয়াছে, শান্তি চাহিয়াছে। বার বার বলিয়াছে—"আমায় সুমতি দাও, আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।"

একদিকে বাসনা, অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জ্বালা, সদ্যোজাগ্রত প্রণয়ের দুর্দম আকর্ষণ, আর অন্যদিকে নারীর অস্থিমজ্জাগত একটা মানবীয় বিবেকের দংশন। পরে অবশ্য কলুষিত সম্ভোগের আগুনে এই বিবেক পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল।

যে তোমায় দেখিয়া মরিয়াছে সে কি মরিতে পারে?—ভ্রমরের বিশ্বাস রোহিণীকে মরিতে বলিলেও সে আত্মহত্যা করিতে পারিবে না, কারণ সে শুধু

প্রেমবিবশা নহে, গোবিন্দলালের প্রেমমুগ্ধা। ভ্রমরের দৃষ্টিতে গোবিন্দলাল কত বড় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আর এই গোবিন্দলালকে স্বামিরূপে পাইয়া তাঁহার প্রেমলাভে ধন্য হইয়া তাহা হারানোর দুঃখ যে কত মর্মান্তিক—ভ্রমর পরে কি অবর্ণনীয় দুঃখজ্বালা ভোগ করিয়াছে, তাহার পরিমাণ বুঝিতে পারা যায় এই কথায়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—রোহিণীর বারুণীর পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিবার চেষ্টা। ভ্রমর পাষাণময়ী স্ত্রীমূর্তি অর্ধাবৃতা দেখিয়া তাহাকে কালামুখী বলিয়া গালি দিত—ভ্রমরের নারীসুলভ লজ্জাই শুধু এই কথায় প্রকাশ পাইতেছে না। বোধ হয়, নারীর হাস্যে, লাস্যে ও রূপলাবণ্যের ছটায় পুরুষকে রূপমুগ্ধ বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়াসক্ত করা ভ্রমরের নিকট অমার্জিত রুচির ব্যাপার বলিয়া বোধ হইত। পূর্ব পরিচ্ছেদে রোহিণী তাহার ভালবাসার কথা গোবিন্দলালকে নিজমুখে প্রকাশ করিয়া বলিল কি করিয়া তাহা ভাবিয়া ভ্রমর বিস্ময় বোধ করিয়াছিল।

বারুণী পুষ্করিণীতে রোহিণীর এই আত্মহত্যার চেষ্টার জন্য অন্য রকম ব্যাখ্যা করিয়া রোহিণী-চরিত্রের মৌলিক সত্তা কেহ কেহ একেবারে পরিবর্তন করিয়া দিতে চান। তাঁহারা মনে করেন, রোহিণী গোবিন্দলালের কল্যাণে, গোবিন্দ-লালের ঐকান্তিক প্রেমে আত্মবিসর্জন করিতে গিয়াছিল। ভ্রমর-গোবিন্দলালের সুখময় দাম্পত্য-জীবনের অকাল অবসান ঘটিবে, এত বড় অভিজাত একটি পরিবারে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে এই সব ভাবিয়া নিজেকে গোবিন্দলালের সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইতে চাহিয়াছিল। রোহিণী চরিত্রের এই ব্যাখ্যা সমালোচকগণের নিরঙ্কুশ কল্পনায়—বঙ্কিমের রোহিণীর সহিত ইহার কোন মিল নাই। রোহিণীর মধ্যে একটা নীচবৃত্তি বরাবরই ছিল। হরলালের কথায় তাহার স্ত্রী হইবার ভরসায় অল্পক্ষণের মধ্যেই আপন বিবেকের সঙ্গে রফা করিয়া উইল চুরি করিতে সে স্বীকৃতা হইয়াছিল আসঙ্গলিপ্সা পূর্ণ করিবার জন্য। বারুণীর ঘাটে তাহার অশ্রুবর্ষণ গোবিন্দলালের প্রেমে নয়। নিজের কামনার পূর্ণতার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সে কাঁদিতেছিল। ভ্রমরের কথায় সে যে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল তাহা আপনার কামনার অপরিসীম জ্বালায়, গোবিন্দলালের প্রতি কোনও শুভেচ্ছার প্রেরণা হইতে নয়। রোহিণীর এই আত্মহত্যার চেষ্টাকে কোনও ক্রমেই আত্মবিসর্জনের গৌরব দেওয়া যায় না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—গোবিন্দলাল রোহিণীকে বাঁচাইলেন।

কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন ইত্যাদি—এ আক্ষেপোক্তি গোবিন্দলালেরও যেমন লেখকেরও তেমনি।

এই সুন্দরীর আত্মঘাতের তিনি নিজেই মূল—গোবিন্দলালের প্রতি আসক্তি পোষণ করিবার ফলেই রোহিণীর এইভাবে জীবনান্ত হইল, ইহা ভাবিয়া গোবিন্দলাল যেন নিজেকে অপরাধী মনে করিল।

মালীকে মুনিব যদি শালগ্রামশিলা চর্বণ করিতে বলিত—এই অতিব্যঞ্জনের উদ্দেশ্য হইল রোহিণীর রূপকে আরও উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠা করা। মালীর পক্ষে রোহিণীর মুখে ফুঁ দেওয়া অসম্ভব।

লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া ভ্রমরের কপালে লাগিল—সেই সময় হইতেই ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গিল। যে-সময় গোবিন্দলাল রোহিণীর মুখে মুখ লাগাইয়া ফুৎকার দিয়াছিলেন সেই সময় বিড়াল মারিতে গিয়া ভ্রমর লাঠির আঘাতে আহত হইল। ঘটনা দুইটি এইভাবে সংযুক্ত করিয়া এই সময় হইতেই ভ্রমরের অকল্যাণের সূত্রপাত ইহাই লেখক বলিতে চাহেন। বর্ণনাটি সুন্দর ব্যঞ্জনাগর্ভ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—রোহিণী ও গোবিন্দলাল ; গোবিন্দলালের শক্তি-প্রার্থনা। আমি পাপপুণ্য জানি না, আমি পাপপুণ্য মানি না—সমাজের নীতি ও ধর্মবোধের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ রোহিণীর মধ্যে ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড ?—বালবৈধব্য, সংসারের ভোগসুখে অল্পবয়স হইতেই বঞ্চিত হওয়া—রোহিণীর এই শাস্তি কোন্ পাপের ফলে ?

চিরকাল ধরিয়া দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা একেবারে মরা ভাল—বুভুক্ষু হৃদয়, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, কামনার জ্বালা রাত্রিদিন মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা দিতেছে। এই জ্বালাময় জীবন বহন করা অপেক্ষা একমুহূর্তে যদি সকল জ্বালার অবসান করিয়া দেওয়া যায় তবে মন্দ কি ?

সম্মুখেই শীতল জল। কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না—কথাগুলি গোবিন্দলালকে লক্ষ্য করিয়াই। গোবিন্দলাল এই কথা শুনিবার পর এ প্রসঙ্গ একরকম জোর করিয়াই বন্ধ করিলেন।

আমি মরিব, ভ্রমর মরিবে—নানা ঘটনার সংঘাত গোবিন্দলালকে রোহিণীর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন এবং এই আকর্ষণের পরিণাম যে তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবনের পরিসমাপ্তি তাহাও বুঝিতে পারিয়াছেন। এই সুখের সংসার ভাঙ্গিয়া যাইবে, ভ্রমর এই আঘাত সহ্য করিতে পারিবে না। ভ্রমর মরিবে। ভ্রমর ব্যতীত গোবিন্দলালের জীবন অর্থহীন, তাঁহার বাঁচা-মরা সমান। গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রতি আকর্ষণের প্রথম অবস্থায়, রূপজ মোহের প্রথম স্তরে, শুভাশুভবোধ ও

কর্তব্যজ্ঞান হইতে একটুও ভ্রষ্ট হন না। নিজের দুর্বলতা অন্তরে অনুভব করিতেছেন, একটা মোহ তাঁহাকে বিপথে চালিত করতে পারে এ আশঙ্কা করিতেছেন, কিন্তু নিজের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস তাহার নাই। সেইজন্য ভগবানের নিকট শক্তি চাহিতেছেন, এই দুর্বলতা যেন কাটাইয়া উঠিতে পারেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—গোবিন্দলালের অধিক রাত্রিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন; ভ্রমব ও গোবিন্দলালের কথোপকথন এবং ভ্রমরের অন্তরে অকল্যাণের পূর্বাভাস।

আজি এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাগানে ছিলে কেন?—একটা অনৈসর্গিক শক্তিবলে ভ্রমব বুঝিতে পারিয়াছে একটা অমঙ্গল যেন আসন্ন অথবা অকল্যাণকব কিছু যেন ইহার মধ্যেই ঘটিয়া গিয়াছে।

তোমার মুখ দেখিয়া, তোমার কথার আওয়াজে—ভ্রমরের মত গোবিন্দলালকে কে আর এত জানে! ভ্রমর গোবিন্দলালের কথায়, কণ্ঠস্বরে ও হাবভাবে অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছে একটা কিছু হইয়াছে।

তামাসা রাখ। কথাটা ভাল নহে—ভ্রমর একটা আভাস পাইতেছে এবং পাইতেছে তাহার মনে। এই অনুভব প্রত্যক্ষ নয় সত্য, কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা আকুল হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ ভাবী অমঙ্গল এমনি করিয়াই মনেপ্রাণে অনুভব করিতে পারে।

আর এক দিন বলিব ভ্রমর—আজ নহে— অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রোহিণীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া সেই কথা ভ্রমরের নিকট গোপন রাখা —গোবিন্দলালের এই সতর্কতা উপন্যাসের গতি-নির্ধারণে সর্বাপেক্ষা বেশী সহায়তা করিয়াছে। গোবিন্দলাল-ভ্রমরের জীবনে কোন ট্র্যাজেডি ঘটিত না, যদি গোবিন্দলাল বাগানে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত কথা ভ্রমরকে তখনই জানাইতেন।

সে কালো মেঘখানা কিছুতেই নামিল না—যে অকল্যাণের ছায়া ভ্রমরের অন্তরে স্পর্শ করিয়াছে ভ্রমর তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ—রোহিণীর রূপ গোবিন্দলালকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে ছিল, তাই গোবিন্দলাল বিষয়কর্মে মনোনিবেশ করিয়া রোহিণীকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। কৃষ্ণকান্তের অনুমতি লইয়া তিনি মহাল তদারক করিতে বন্দরখালি যাত্রা করিলেন। ভ্রমর সঙ্গে যাইতে চাহিল, কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী পুত্রবধূকে যাইতে দিলেন না। রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রবল, ভ্রমর হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই—গোবিন্দলালের অবস্থায় ও বয়সে রূপতৃষ্ণা, বিশেষতঃ,

নারীর দেহের রূপলাবণ্যের প্রতি একটা আকর্ষণ ও মোহ থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভ্রমরের সান্নিধ্যে এই রূপতৃষ্ণা মূর্ছিত ছিল মাত্র। ভ্রমরের দৈহিক রূপলাবণ্যের অভাব ছিল বলিয়াই ভ্রমর স্বামীর এই রূপতৃষ্ণা তৃপ্ত করিতে পারে নাই।

মরিতে হয় মরিব, কিন্তু তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা কৃতঘ্ন হইব না—প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রবৃত্তির পথে চলিবার সময় বিবেক বা কর্তব্যবুদ্ধির তাড়না সহ্য করিতে হয়। গোবিন্দলালের গোপন রূপতৃষ্ণা তাঁহাকে রোহিণীর দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এই আকর্ষণের প্রচণ্ডতা তিনি অনুমান করিতে পারিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কর্তব্যবুদ্ধি শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। বাহিরের কতকগুলি ঘটনা-পরম্পরা গোবিন্দলালকে এই যুদ্ধে জয়ী হইতে দিল না।

ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না—রোহিণীকে ভুলিবার উপায় কেবল বন্দরখালি-যাত্রা নয়, তাহাকে ভুলিবার উপায় হলো ভ্রমর। ভ্রমরের সান্নিধ্য গোবিন্দলালকে অনায়াসেই জয়ী করিতে পারিত। কিন্তু হঠাৎ ভ্রমরের শাশুড়ী প্রকাণ্ড প্রতিকূল শক্তিরূপে আবির্ভূত হইলেন। এই শাশুড়ীর কথা আমরা এতক্ষণ শুনি নাই বা তাঁহাকে একবার দেখি নাই; কিন্তু ভ্রমর-গোবিন্দলালের একান্ত দুঃসময়ে যখন ইঁহাদের একসঙ্গে অবস্থিতি নিতান্ত প্রয়োজন তখন তিনি ভ্রমরকে পুত্রের সহিত যাইতে দিলেন না। মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতে এই সব ক্ষুদ্র ঘটনা কম সাহায্য করে না।

শুইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল—গোবিন্দলাল সে রাত্রে ভ্রমরের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না—ভ্রমরের মন পূর্ব হইতেই ভাবী অকল্যাণের আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়াছিল। এখন গোবিন্দলালের সঙ্গে যাইতে না পারিয়া ভ্রমর অস্থিরচিত্তে নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিতেছে এবং অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ—ভ্রমরের কিছু ভাল লাগে না। কথনো খাটের বিছানা তুলিতেছে, কথনো পাখা খুলিতেছে। চাকরাণীদের ফুল আনিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। সকল প্রকার মেলামেশা, আমোদ-আহ্লাদ বন্ধ করিয়াছে ও জর হইয়াছে বলিয়া না খাইয়া শুইয়া আছে। কবিরাজ আসিল—পাচন ও বড়ীর ব্যবস্থা হইল—ভ্রমর জানালা দিয়া ঔষধ ফেলিয়া দিল। পুরানো আমলের ক্ষীরি চাকরাণী জানাইল—যাঁর জন্ত ভ্রমর পাগল তিনি তো রোহিণীর

চিন্তায় বিভোর। রোহিণীকে সেদিন অত রাত্রে গোবিন্দলালের বাগান হইতে আসিতে অনেকেই দেখিয়াছে। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে মারিল এবং অবশেষে কাঁদিল। ভ্রমর ভাবিতে লাগিল, সেদিন গোবিন্দলাল কি এই কথাই গোপন করিয়াছিলেন? কিন্তু গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমরের অবিশ্বাস হইল না। আর সত্যই যদি গোবিন্দলাল অবিশ্বাসী হইয়া থাকেন, তবে ভ্রমর মরিলেই সব ফুরাইবে।

মনের ভিতর যে মন,............স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস নাই—ভ্রমর আপন অন্তরের গভীরতম তলদেশ আলোড়ন করিয়া আপন অন্তরের প্রেম ও সহানুভূতির সহায়তায় গোবিন্দলাল সত্যই রোহিণীতে আসক্ত কিনা জানিতে চেষ্টা করিল। গোবিন্দলালের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হইল না। সম্ভবতঃ গোবিন্দলালের এই রূপোন্মত্ততার অন্তরালে যে ভ্রমরগত হৃদয়টি ছিল, ভ্রমর আপনার প্রেমের বলে তাহার সন্ধান পাইল। গোবিন্দলালও পরে বুঝিয়াছিলেন ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। রূপমোহের শক্তি প্রচণ্ড হইলেও তাহা বাহিরের জিনিস। ইহা একপ্রকার স্নায়ুর চাঞ্চল্য; ইহার অবসাদ আছে, প্রতিক্রিয়া আছে।

একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ—গোবিন্দলাল-রোহিণীর প্রণয়-কাহিনী অতি-রঞ্জিত হইয়া গ্রামময় রাষ্ট্র হইল। পাড়ার ও গ্রামের নানা বয়সের মেয়েরা উপযাচিকা হইয়া ভ্রমরের নিকট আসিয়া জানাইল—ভ্রমর, তোমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।

গ্রামবাসিনীদের এত উৎসাহের কারণ এই যে, ভ্রমর কালো হইয়াও এত ঐশ্বর্য ও এমন স্বামী পাইয়াছিল। ভ্রমর আর সহিতে না পারিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল ও আকুলভাবে স্বামীকে ডাকিতে লাগিল। এ সন্দেহ ভঞ্জন করিবে কে?

বলি মেজ বৌ, মেজবাবুকে অষুধ কর—সুরধুনীর এই আলাপের উপক্রমণিকা একাধারে সহানুভূতি, অযাচিত উপদেশ এবং প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপপূর্ণ।

আমায় গালি দিও না যে, তোমরা আমায় না বলিয়া মরিয়াছে—এক কথা বহু-লোকের মুখে শুনিতে শুনিতে গোবিন্দলালের উপর ভ্রমরের অটল বিশ্বাসও টলিয়া উঠিয়াছে। যাহা রটিয়াছে তাহা যদিও কিছু সত্য হয় তবে ভ্রমরের মরাই মঙ্গল। বিশ্বাস টলিলেও স্বামীর প্রতি স্নেহ পূর্ববৎ। এই কথায় ভ্রমরের স্নেহশীল অভিমানী চিত্তের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

দ্বাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ—রোহিণী ভ্রমরকে জ্বালাইতে আসিয়াছে। রোহিণীর কানে গেল যে গুজব রটিয়াছে গোবিন্দলাল রোহিণীকে সাত হাজার টাকার গহনা দিয়াছেন। রোহিণী মনে করিল নিশ্চয় ভ্রমর এই গুজব রটাইয়াছে। তখন অন্যের নিকট ধার করিয়া বেনারসী শাড়ী ও কতকগুলি গিল্‌টির গহনা পুঁটুলি করিয়া আনিয়া রোহিণী ভ্রমরকে দেখাইল এবং বলিল মেজবাবুর অনুগ্রহে তাহার দুর্দিন কাটিয়াছে। কিন্তু লোকে যতটা বলে ততটা নয়, সাত হাজার টাকা নয়, তবে তিন হাজার টাকার গহনা সে পাইয়াছে।

সাত হাজার টাকা লোকে বলে কেন?—রোহিণীর নির্লজ্জতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। রোহিণীর কথা বলার কৌশল অর্থাৎ বাক্‌চাতুর্যের অনেক দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু এইখানে স্থির সুস্থ মস্তিষ্কে লোকের মনে কষ্ট দিবার প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য তাহার কতখানি তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বীর দুর্বল স্থানে চরম আঘাত করিয়া ভ্রমরের ব্যথা রোহিণী উপভোগ করিতেছে। ইহা তাহার চরিত্রের অন্ধকার দিক ব্যক্ত করিয়াছে।

সোণায় পা দিতে নাই—মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। একটুও চঞ্চল না হইয়া, একটুও রাগ না করিয়া, কথার মধ্য দিয়া এতখানি দংশন যে করিতে পারে, তাহার চরিত্রের ইতরতা সুস্পষ্ট।

ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ—গোবিন্দলাল ভ্রমরের অভিমানপূর্ণ পত্র পাইলেন; ব্রহ্মানন্দ ও ভ্রমর নানারূপ অসঙ্গত গুজব রটনা করাইতেছে এই মর্মে গোবিন্দলালকে একখানি অনুযোগপূর্ণ পত্র লিখিলেন। পত্র দুখানি পাইয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে রওনা হইলেন।

এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই—ভ্রমরের পূর্ণ অভিমান এই কথার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভ্রমর আঘাত পাইয়াছে মর্মান্তিক, কিন্তু পত্রখানার মধ্য দিয়া ভ্রমরের গুরুতর অভিমানই যে প্রকাশ পাইতেছে তাহা গোবিন্দলাল ধরিতে পারেন নাই। 'তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই' একথা ভ্রমর কী ব্যথা পাইয়া, কত অভিমানে লিখিতেছে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও গোবিন্দলাল বুঝিতে পারেন নাই। কল্পনাশক্তির দীনতা বা অভাব ইহার কারণ। এই unimaginative প্রকৃতি রায়বংশের প্রায় সকলেরই আছে।

চতুর্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ—গোবিন্দলাল বাড়ী আসিয়া শুনিলেন ভ্রমর পিত্রালয়ে গিয়াছে।

যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিও না—কারণ out of sight, out of mind. যদি প্রেম-বন্ধন দৃঢ় করিবে, তবে সূতা ছোট করিও—ভালবাসার পাত্রকে নয়নের আড় করিলে, লেখকের মতে, বিপদের সম্ভাবনা আছে। গোবিন্দলালের জমিদারী দেখিতে যাওয়াটাই ভ্রমরের দিক্ দিয়া ভাল হয় নাই।

যা ভাঙ্গে, আর তা গড়ে না—অদর্শনের ফলে একবার যদি একটা ব্যবধান রচিত হইয়া যায় তবে সে ব্যবধান থাকিয়াই যায়। যেমনটি পূর্বে ছিল তাহা আর হইতে চায় না।

মুক্তবেণীর পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ?—প্রণয়ী যদি চক্ষুর আড়াল হয় তবে তাহার প্রতি প্রণয় স্তিমিত হইয়া আসে এবং অপর প্রণয়ীর প্রতি তাহার ভাবের গুরুতর পরিবর্তন হয়। নদীর সম্মিলিত প্রবহমান জলরাশি যদি শাখা বিভক্ত হইয়া যায়, তবে সেই দ্বিধা বা ত্রিধা-বিচ্ছিন্ন জলরাশি পুনরায় একত্রিত হইতে দেখা যায় না।

ভ্রমর গোবিন্দলালকে যদি একা বন্দরখালি যাইতে না দিত তবে তাহার প্রতি গোবিন্দলালের এমন গুরুতর ভাবান্তর উপস্থিত হইত না। অবশ্য গোবিন্দলাল বাহিরে গিয়াছিলেন এই আশায়, কিছুকাল রোহিণীকে দেখিতে না পাইলে রোহিণীর রূপের দুরন্ত মোহ হইতে তিনি মুক্তি পাইবেন। কিন্তু ফল এমনই বিপরীত হইল যে, ভ্রমরেরই প্রভাব তাঁহার প্রাণ হইতে মুছিয়া গেল এবং রোহিণীর প্রতি প্রবলতরভাবে তিনি আকৃষ্ট হইলেন। দু'দিনের বিচ্ছেদ ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি করিল তাহা লুপ্ত না হইয়া ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া চলিল।

বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত—ভ্রমর-গোবিন্দলাল যদি একসঙ্গে থাকিতেন রোহিণীর ব্যাপার লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া বাধিত। ইহার ফলে তখন সমস্ত ব্যাপারটা প্রকাশ পাইয়া যাইত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এতখানি ব্যবধান গড়িয়া উঠিত না।

ভ্রমরের এত ভ্রম ঘটিত না। এত রাগ হইত না। রাগে এই সর্ব্বনাশ হইত না—লেখক কার্য-কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দিতেছেন। উভয়ের অদর্শন হইতেই নানা জনশ্রুতির প্রভাবে ভ্রমরের ভ্রম, এই ভ্রম হইতে ক্রোধ। ক্রোধ ও অভিমান হইতে সর্বনাশ।

ভ্রমর শুনিলেন, স্বামী আসিতেছে ইত্যাদি—ভ্রমর পূর্বের চিঠিতে যেমন লিখিয়াছিল তেমনি করিল। গোবিন্দলাল বাড়ী আসিতেছে জানিতে পারিয়া নিজের মিথ্যা অসুখের সংবাদ দিয়া আবার সেই অসুখের কথা শ্বশুরবাড়ীতে

গোপন রাখিতে বলিয়া তাহার মাতার নিকট সংবাদ পাঠাইল। মায়ের প্রাণ, মেয়ের অসুখের সংবাদ পাইয়াই আকুল হইয়া উঠিল। ভ্রমরের পিতা ভ্রমরকে আনিবার জন্য কৃষ্ণকান্তকে পত্র দিলেন। পত্রে লেখা ছিল ভ্রমরের মাতার গুরুতর পীড়া। কৃষ্ণকান্ত অগত্যা ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠাইলেন। গোবিন্দলাল এই সময় বাড়ী আসিতেছেন। সুতরাং মাত্র চার দিনের কড়ারে ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার অনুমতি দিলেন।

ভ্রমরের শাশুড়ী থাকিয়াও নাই, তবে তিনি অঘটন করা ছাড়া একটি বারও গৃহিণীর কাজ করেন নাই। ভ্রমরের মাতা কন্যার অসুখের সংবাদ পাইয়াই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। একমাত্র কৃষ্ণকান্ত একটুখানি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দলাল আসিয়া সব দেখিয়া ভ্রমরকে আনিবার ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিলেন।

এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল!—কার্যগতিকে ভ্রমর গোবিন্দলালের উপর অবিশ্বাস করিয়াছে, সন্দেহ করিয়াছে, অভিমান করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু গোবিন্দলাল এখন পর্যন্ত নির্দোষ! ভ্রমর চিঠিতে যাহাই লিখুক না কেন, কার্যকালে সত্যই সে এভাবে পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে গোবিন্দলাল একথা স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। এবার গোবিন্দলালের দুর্জয় অভিমান হইল। যেখানে প্রেম প্রবল সেখানে অভিমানও প্রচণ্ড। যতই গোবিন্দলাল ভ্রমরের এই ব্যবহার চিন্তা করেন ততই ক্রোধ ও অভিমান প্রবলতর হয়। 'যাহার ভ্রমর নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে না?' এই একটি কথায় গোবিন্দলালের অভিমান, ক্রোধ এবং আহত পৌরুষের অহংকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, উপন্যাসের শীর্ষস্থানীয় ভ্রান্তি এইখানে। গোবিন্দলালের প্রতি অবিশ্বাস ও অভিমানের বশবর্তী হইয়া ভ্রমরের পিতৃগৃহে যাত্রা হইতেই নায়ক-নায়িকার ভাগ্যকে নূতন ধারায় প্রবাহিত করিয়াছে। এই ঘটনার পর হইতেই গোবিন্দলালের দোলাচল চিত্তকে নিঃসংশয়িতভাবে রোহিণীর দিকে হেলাইয়াছে।

কিন্তু আমরা মনে করি ইহা 'শীর্ষস্থানীয় ভ্রান্তি' হইলেও উপন্যাসের 'আদি ভ্রান্তি' হইল রোহিণীকে উদ্ধার করিয়া রোহিণীর অঙ্গ স্পর্শ করার কথা ভ্রমরের নিকট গোপন রাখা। আসল ঘটনা জানিবার জন্য ভ্রমর ছটফট করিয়াছে, গোবিন্দলাল সত্য গোপন করিয়া গিয়াছেন। দুই বৎসর পরে যখন ভ্রমর আরও একটু বড় হইবে তখন তিনি বলিবেন। আসল ঘটনা তখন গোবিন্দলাল যদি

প্রকাশ করিয়া বলিতেন তবে পাড়াপড়শীর প্ররোচনা ও গুজব ভ্রমরের বিশ্বাস টলাইতে পারিত না। সত্য গোপন করিয়া ভ্রমরের চিত্তে সন্দেহের প্রথম রেখাপাত করেন গোবিন্দলাল। গোবিন্দলালের সত্যগোপনই প্রথম মারাত্মক ভুল এবং এই ভুলের রন্ধ্রেই শনি প্রবেশ করিল।

এই দুইটি মতবাদ হইতে আসল কথা দাঁড়াইতেছে নায়ক-নায়িকার জীবনের দুঃখময় পরিণতির জন্য দায়িত্ব কাহার বেশী—ভ্রমরের না গোবিন্দলালের? এই ট্র্যাজেডির মূলে অনেকের স্বার্থ, ষড়যন্ত্র, পারিবারিক ও সামাজিক নানা পরিস্থিতি ও ঘটনা কাজ করিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভ্রমর ও গোবিন্দলাল এই দুইজনের কাহাকে ইহার জন্য প্রধানভাবে দায়ী করা যায় এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব গোবিন্দলালের দায়িত্ব সর্বাধিক।

পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ—গোবিন্দলাল ও রোহিণীর আলাপ।

মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাঁদাইব—ভ্রমরের প্রতি অভিমান তখনো গোবিন্দলালের যায় নাই। ভ্রমরকে এখন কিছুদিন পিত্রালয়েই রাখা যাউক তাহা হইলে ভ্রমরের সমুচিত শিক্ষা হইবে, ভ্রমর তাহা হইলে ভবিষ্যতে এত স্পর্ধা দেখাইতে পারিবে না। বিধাতাপুরুষ গোবিন্দলালের অভিপ্রায় বুঝিয়া অলক্ষ্যে হয়তো একটু হাসিলেন।

ভ্রমরের সঙ্গে কলহ, এ কথা ভাবিয়া কান্না আসিল—গোবিন্দলালের ক্রোধের উপশম হয় নাই, কিন্তু ভ্রমরের অনুপস্থিতি, তাহার অভাব গোবিন্দলালকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। গোবিন্দলালের এ অবস্থা জটিল। শেষ পর্যন্ত 'স্বামী হইয়া স্ত্রীর কাছে হেঁট হইব, যে স্ত্রী রাগ করিয়া বাপের বাড়ী গিয়াছে তাহাকে সাধাসাধি করিয়া এত তাড়াতাড়ি আনিবার প্রয়োজন কি' এইরকম পৌরুষের অহংকার তাহাকে বাধা দিতেছে।

ভুলিবার সাধ্য কি?—ভ্রমরের অভাববোধ গোবিন্দলালকে এত মর্মপীড়িত করিতেছে যে, বিস্মৃতির মধ্যে তিনি শান্তি পাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ভ্রমরকে এইভাবে ভুলিতে পারা গেল না।

ভ্রমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, রোহিণীর চিন্তা—ক্ষুদ্র রোগের উপশমের জন্য গোবিন্দলাল উৎকট বিষগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। ভ্রমরের অদর্শনজনিত হৃদয়ের যে শূন্যতা তাহা রোহিণীর রূপের চিন্তা দিয়া পূর্ণ করিতে চাহিলেন। গোবিন্দলাল সজ্ঞানে নিজের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আপনি কি আমাকে ডাকিলেন?—উপযাচিকা হইয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা। রোহিণী সাহস পাইয়া মণ্ডপ মধ্যে উঠিল—রোহিণীর এই বেপরোয়া ভাব গোবিন্দলালকে আসক্ত করিবার জন্য যে একটা অন্তিম চেষ্টা তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। নতুবা গোবিন্দলালের স্পষ্ট 'ডাকি নাই' শুনিয়াও মণ্ডপে উঠিয়া আসে কি উদ্দেশ্যে! রোহিণী ও গোবিন্দলালের কাহিনী সমস্ত গ্রামে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অবশ্য রোহিণীর স্বার্থসাধনে সুবিধাই হইয়াছে। ফলকথা রোহিণীর চালচলনে লজ্জার স্পর্শ মাত্র নাই।

যা বলিবার তা বলিতেছি—কুৎসা-সংক্রান্ত প্রশ্নের এই প্রকার উত্তরের মধ্যেও রোহিণীর নির্লজ্জতা সুস্পষ্ট।

কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া বলিব কি?—গোবিন্দলালকে আসক্ত করিবার জন্য রোহিণীকে এখানে 'মরিয়া' বলিয়া অনুমান করা যায়। এই সময়, এই সুযোগ, —ভ্রমর পিত্রালয়ে, বর্ষণমুখর এই সন্ধ্যায় সজ্জিত পুষ্পমণ্ডপের মধ্যে একটি বিলাসী যুবককে রূপলাবণ্যের মোহে আসক্ত করিয়া তোলা এতই কি অসম্ভব?

গৃহে যাইবার পূর্ব্বে বুঝিয়া গেল···গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপমুগ্ধ—রোহিণীর প্রয়াস সার্থক হইল। গোবিন্দলালের দোলাচল চিত্ত রোহিণীর দিকে ঝুঁকিল। ভ্রমর অনুপস্থিত, বাহিরের বাধা নাই। ভ্রমরের উপর দুর্জয় অভিমান ভিতরের বাধাকেও শিথিল করিয়া দিয়াছে।

ষড়বিংশতিতম পরিচ্ছেদ—গোবিন্দলালের অংশ ভ্রমরের নামে লিখিয়া দিয়া কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু।

কিন্তু যেমন বাহ্যজগতে মাধ্যাকর্ষণে তেমনিই অন্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে প্রতিপদে পতনশীলের গতি বর্ধিত হয়—চমৎকার একটি উপমার সাহায্যে গোবিন্দলালের মনোভাব ও তাঁহার পতনের ইতিহাসটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোন বস্তুকে ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নে ছাড়িয়া দিলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফলে তাহার গতি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং ভূমি হইতে অল্প উচ্চে তাহার গতি হয় দ্রুততম। সেইরূপ পাপের আকর্ষণেও পাপীর অধঃপতনের গতি ক্রমশঃ বাড়িয়া যায় এবং ধ্বংসপ্রাপ্তির পূর্বে পতনবেগ চরমে উঠে। ইহার একটি কারণ এই যে, পরাভূত বিবেক-বুদ্ধি পাপের মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইতে থাকে এবং পাপীর চিত্ত ক্রমশঃ অধিকতর নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিয়া দ্রুততর বেগে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়।

পাপের আকর্ষণে গোবিন্দলালের পতনের গতিও অতি অল্পকাল মধ্যেই চরমে

উঠিল। ভ্রমর রূপসী ছিল না, কিন্তু তাহার হৃদয় ছিল। গোবিন্দলাল তাহার প্রেমে তৃপ্ত হইয়াছিলেন। রোহিণীর রূপের ছটায় যখন প্রথম গোবিন্দলালের চমক লাগিল তখন চিত্তের সামান্য বিচলিত অবস্থা অনুভব করিয়া তিনি ভগবানের নিকট আকুলভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন ভগবান্ তাঁহার চিত্তে দৃঢ়তা ও শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে এই নৈতিক অধঃপতন হইতে রক্ষা করেন। রোহিণীকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে প্রথমেই জাগে নাই। কিন্তু ক্রমশঃ এই রূপের চমক তৃষ্ণায় এবং তারপর দুর্দমনীয় লালসায় পরিণত হইল। তাঁহার বিবেক অন্তর্হিত হইল এবং তিনি স্থির করিলেন—এইবার ভ্রমরের গুণের সেবা ছাড়িয়া রোহিণীর রূপের সম্ভোগে জীবনের অবশিষ্ট অংশ কাটাইয়া দিবেন। গোবিন্দলালের অনুপস্থিতে ভ্রমরের পিত্রালয়ে গমনে গোবিন্দলাল ক্রুদ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় পাপের পথে দ্বিগুণ বেগে ছুটিলেন। তাঁহার চিত্তে ভ্রমরের প্রভাব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গেল—রোহিণীর রূপসম্ভোগের উগ্র কামনা তাঁহার চিত্তকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিল। এইরূপে গোবিন্দলালের অধঃপতনবেগ ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া চরমে উঠিল।

উপমাটি অতি বিস্ময়করভাবে সত্য।

কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন, বলিলেন! "কতক্ষণ মিয়াদ?"—কৃষ্ণকান্তের বিষয়বুদ্ধি ও ন্যায়ান্যায়বিচারবুদ্ধির খ্যাতি ছিল। এখন আপনার মৃত্যু সম্বন্ধেও আসন্ন ভবিষ্যৎটাকে বুঝিয়া লইতে কষ্ট হইতেছে না। কৃষ্ণকান্তের মনের বলও সহজ নয়।

কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া ইত্যাদি—কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের চরিত্র সংশোধনের জন্য উপদেশ দেওয়ার সময় ও সুযোগ পাইলেন না। মৃত্যু আসন্ন, অথচ এত বড় একটা অন্যায় দেখিয়া ও বুঝিয়া তিনি মৃত্যুর পূর্বে কোনও প্রতিবিধান করিয়া যাইবেন না, ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য হইল। তিনি গোবিন্দলালের অংশ ভ্রমরের নামে লিখিয়া পুনর্বায় উইল পরিবর্তন করিলেন। ইহাতে হাতে যথেষ্ট টাকা পড়িবার পথ বন্ধ হইবে, যাহাতে গোবিন্দলাল বাধ্য হইয়া সংযত হইবেন। কিন্তু ইহাতেও হিতে বিপরীত হইল। গোবিন্দলাল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া এবং স্ত্রীর দাক্ষিণ্যের পাত্র হইয়া ভ্রমরের প্রতি আরও বিরূপ হইলেন। দুঃসময় যখন আসে তখন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর শুভ প্রচেষ্টাও অকল্যাণ প্রসব করে।

মুহুরি গোবিন্দলালের মুখপানে চাহিল—মুহুরী মেজবাবুকে ইশারায় সন্তুষ্ট করিল। কৃষ্ণকান্তের আর কতক্ষণ? মেজবাবুকে চটানো ঠিক হইবে না। মুহুরীর বৈষয়িক বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব লক্ষ্যণীয়।

সপ্তবিংশতিতম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের সাক্ষাৎ। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া ভ্রমর আসিল। দু'জনেই অশ্রুবর্ষণ করিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিলেন, তাঁহার কিছু বলিবার আছে, শ্রাদ্ধের পরে বলিবেন। ভ্রমর বলিল, তাহারও কিছু বলিবার আছে। উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও প্রণয়ের অভাব যে ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছিল তাহা আত্মীয়-স্বজন বুঝিতে পারিল না। পরস্পরের সান্নিধ্যে যে প্রীতি ও আনন্দ উছলিয়া উঠিত তাহা এখন নাই। উভয়ে পূর্ব্বের মত একত্রে থাকিতে পারেন না, কোন একটা উপলক্ষ করিয়া একজন উঠিয়া যান। উভয়ের হৃদয় অন্ধকারময়। সেই অন্ধকার আলো করিবার জন্য গোবিন্দলাল ভাবিতেন রোহিণীকে, আর ভ্রমর ডাকিত যমকে।

সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রমর—কৃষ্ণকান্ত রায়-পরিবারের মস্তকস্বরূপ ও বিশাল আশ্রয় ছিলেন। ভ্রমরের শাশুড়ী থাকিয়াও নাই। কৃষ্ণকান্ত ভ্রমরের পক্ষেও একটা মস্ত ভরসা ছিলেন। ভ্রমরের এই বিপদের সময় কৃষ্ণকান্ত বাঁচিয়া থাকিলে গোবিলাল-ভ্রমরের সম্পর্ক আবার পূর্ব্বের মত হইবার সম্ভাবনা ছিল, কারণ কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়াইত না, এবং পরিবারের মর্যাদা ও মঙ্গল অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু ভ্রমরের পক্ষে অকল্যাণকর হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কৃষ্ণকান্ত বাঁচিয়া থাকিলে রোহিণী-গোবিন্দলালের মিলন সম্ভাবনাকে বেশীদূর অগ্রসর হইতে দিতেন না।

গোবিন্দলালকে দেখিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল—শোকের সময় প্রিয়ব্যক্তির সাক্ষাৎ শোক বৃদ্ধি করে। ভ্রমরের মনের যে অশান্তি কৃষ্ণকান্ত রায়ের শোকের মধ্যে চাপা পড়িয়াছিল, গোবিন্দলালকে দেখিয়া তাহাই শোকাশ্রুরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মানসিক পবিবর্তন অত্যন্ত স্পষ্ট। যাহাদের জীবন এতকাল একই ধারায় প্রবাহিত হইত, তাহারা যেন আজ একে অন্য হইতে কত দূরে সরিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমের বর্ণনা-কৌশল এখানে অনবদ্য। কয়েকটি মাত্র কথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ব্যবধান গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার স্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

অষ্টাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ—উইল লইয়া কথায় কথায় গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মধ্যে স্থায়ী বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল।

উইলের কথা শুনিয়াছ?—বহুদিন পরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলাপের সূত্রপাত লক্ষ্য করিবার। কিছুদিন পূর্ব্বেও কল্পনা করিতে পারা যাইত না যে, ভ্রমর—

গোবিন্দলাল এইরূপভাবে কথা বলিতে পারেন। পরিবর্তন অবশ্য গোবিন্দলালেরই অধিক। ভ্রমরের অভিমান তাহার সারল্য নষ্ট করে নাই। সে সরলভাবেই বলিয়াছে, ভ্রমরের সম্পত্তির অর্থ গোবিন্দলালেরই সম্পত্তি।

এখন তোমায় আমায় একটু প্রভেদ হইয়াছে—গোবিন্দলালের উপর ভ্রমরের যখন বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই তখন গোবিন্দলালই বা ভ্রমরের সম্পত্তিকে নিজের বলিয়া মনে করে কি করিয়া ?

আজি কালি ওকথা সাজে না, ভ্রমর—ভ্রমরের পিত্রালয়ে যাওয়ার উপর ইঙ্গিত। এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব—রোহিণীর রূপচ্ছটায় গোবিন্দলালের মন হইতে ভ্রমর ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল। রূপসম্ভোগের একটা দুর্দমনীয় লালসা তাহার প্রাণকে চঞ্চল ও অভিভূত করিয়া তুলিতেছিল। পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা সপ্তদশবর্ষীয়া পত্নী ভ্রমর, তাহাকে উপেক্ষা করিতে গিয়াও গোবিন্দলাল ভাবিতেছেন—ভ্রমরের মত গুণ আর কাহার! বিনা দোষে এই নিরপরাধা পত্নীকে ত্যাগ করিবার একটা সন্তোষজনক কারণ নিজের মনের সম্মুখে ধরিতে হয়, বিবেকের ক্ষীণ প্রতিবাদে একটা যুক্তি দেখাইয়া স্তব্ধ করিতে হয়—তাই গোবিন্দলাল বলিতেছেন ভ্রমরের গুণ ছিল, এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া কি চিরকাল গুণের সেবাই করিতে হইবে? বাকী জীবনটা রোহিণীর রূপের সেবা করিয়া কাটাইয়া দিলে ক্ষতি কি ?

আমার এ অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব—কথাগুলি লক্ষ্য করিবার। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীর রূপসম্ভোগে জীবন কাটাইয়া দিবার সংকল্প মনে উদিত হওয়াতেই গোবিন্দলালের নিকট নিজের জীবনটা অসার, আশাশূন্য ও প্রয়োজনশূন্য মনে হইতেছে। যাহার জীবনে কোনও প্রয়োজন নাই, সে বাঁচিল, কি মরিল তাহাতে কি আসে যায়? যাহার জীবনে কোনও আশা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ নাই, তাহার জীবন যদি যথেচ্ছ ব্যভিচারের মধ্য দিয়া কাটে তবে ক্ষতি কি? পাপের দাহ গোবিন্দলালের জীবনের সমস্ত সম্পদ ও মাধুর্য একেবারে পোড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার আশা নাই, প্রয়োজন নাই, ভবিষ্যৎ নাই, আছে শুধু আপাতমধুর রূপমোহের মধ্যে নিঃশব্দে তলাইয়া গিয়া এই জীবনের অবসান।

মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব—নিজের জীবন বা দেহকে লক্ষ্য করিয়াই গোবিন্দলাল এই উক্তি করিতেছেন। নিজের জীবনের অন্ধকারময়

পরিণাম তিনি বুঝিতে পারিতেছেন অথচ রূপতৃষ্ণার মোহ তিনি কাটাইয়া উঠিতে পরিতেছেন না।

এই কথা কয়টির ভিতর দিয়া নিজের জীবনের প্রতি একটা উদাস উপেক্ষার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দলালের মনোভাবটি বিশ্লেষণ করিলেই ধরা পড়ে যে, রোহিণীর রূপের আগুনে ঝাঁপ দিয়াই জীবনের মমতা তিনি বিসর্জন দিয়াছেন, জীবনের প্রতি ধিক্কার জাগিয়া উঠিতেছে। যে-কোনও মুহূর্তে নিজের হাতে এই ভঙ্গুর জীবন তিনি বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারেন। অসংযত রূপতৃষ্ণার আগুনে একটা সতেজ সরল জীবন কিরূপ বিকৃত হইয়া পুড়িয়া যাইতেছে।

ঊনত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ—গোবিন্দলালের ধ্বংসাবশিষ্ট বিবেকবুদ্ধি ভ্রমরকে এইভাবে ত্যাগ করার বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলিতেছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের রূপমোহ পরাভূত বিবেকের কণ্ঠরোধ করিল। ভ্রমর যে অবিশ্বাস করিয়াছিল, জিজ্ঞাসা না করিয়া অভিমানের বশে পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল তাহা ভ্রমরের পক্ষে স্বাভাবিক, পরস্ত্রীতে আসক্ত স্বামীর সহিত স্ত্রীর এই ব্যবহার অস্বাভাবিক নয়—এই যুক্তি গোবিন্দলালের মনে ধরিল না। উইল পরিবর্তনও যে গোবিন্দলালের চরিত্র-সংশোধনের জন্যই কৃষ্ণকান্ত করিয়া গেলেন, তাহা গোবিন্দলাল বুঝিয়াও বুঝিলেন না।

তবে আর কি করিবে? গোল্লায় যাও—গোবিন্দলালের মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান হইল। দুর্বল বিবেকবুদ্ধি গোবিন্দলালকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। স্রোতের মুখে তৃণের মত তিনি ভাসিয়া গেলেন। কিন্তু গোবিন্দলাল নিঃসন্দেহে বুঝিলেন—রোহিণীর রূপসম্ভোগের মত্ততার মধ্যে নিজের জীবনের অকল্যাণকর অন্ধকারময় পরিণাম।

ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ—কাশী যাইবার পূর্বে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের কথোপকথন। কাহিনীর দিক্ হইতে এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত মুহূর্তটি চরম মুহূর্ত। ভ্রমর-গোবিন্দলালের দাম্পত্য-জীবনের সকল সাধ, সকল আশার এইখানেই অবসান হইল।

ভ্রমরের সঙ্গে গোবিন্দলালের একটা আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়াও গোবিন্দলালের মাতা প্রতিকারের কোনও চেষ্টা করিলেন না। পুত্র থাকিতে বিষয় পুত্রবধূর হইল—ইহা বৃদ্ধার পক্ষে অসহ্য বোধ হইল—ভ্রমরের প্রতি বিরূপতা ইহাতে আরও বাড়িয়া গেল। তিনি কাশীবাসিনী হইবেন—গোবিন্দলাল স্বয়ং মাতাকে কাশীতে লইয়া যাইবেন। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু এমন সময়ে হইল যে, সব দিক্ দিয়াই ভ্রমর নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। রোদন ব্যতীত ভ্রমরের আর কিছু

রহিল না। রোরুদ্যমানা ভ্রমর গোবিন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল, গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিবেন কি না! গোবিন্দলাল ভ্রমরের অন্নদাস হইয়া থাকিবেন না। ভ্রমর মার্জনা চাহিল। গোবিন্দলালের দাসানুদাসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিল। রোহিণীর রূপ গোবিন্দলালকে আকর্ষণ করিতেছে, তিনি ভ্রমরের কথা শুনিবেন কেন! ভ্রমরের জীবনের সকল আশা ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে। চোখের জলে পায়ে ধরিয়া সে ক্ষমা চাহিয়াছে। পরিবর্তে পাইয়াছে আরও আঘাত, আরও হৃদয়হীন ব্যবহার। এবার চোখের জল মুছিয়া অবিচলিত কণ্ঠে, সতীত্বের গৌরবে গৌরবিণী মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর মত ভ্রমর বলিল—'এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে, আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আমার জন্য কাঁদিবে। ...তুমি আমারই, রোহিণীর নও।'

গোবিন্দলাল হঠাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন—কৃষ্ণকান্ত পরলোকে, ভ্রমরকে পরিত্যাগ করা মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন মাতাকে কাশীবাসিনী করিতে পারিলেই গোবিন্দলাল একেবারে নির্বাধে রোহিণীকে লইয়া নিখোঁজ হইতে পারেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ভ্রমর এই সময় একবার ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন—ভ্রমরের এই দ্বিতীয়বার পিত্রালয়ে যাওয়া স্বামীর নামে দানপত্র প্রস্তুত করিবার জন্য। ভ্রমর তাহার পিতার সাহায্যে দানপত্র সম্পাদন করিয়া তাহা রেজেষ্টারী পর্যন্ত করাইয়াছে। আমাদের মনে হয়, ভ্রমর উপস্থিত থাকিলেও গোবিন্দলালের কাশীযাত্রা বন্ধ করিতে পারিত না।

বুঝি আমার তাও নাই—এভাবে ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া গোবিন্দলাল চলিয়া যাইতেছেন। ভ্রমর চোখের জলে মার্জনা ভিক্ষা করিয়াছে, পদতলে পড়িয়া অনুরোধ করিয়াছে। বিনা অপরাধে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা অধর্ম একথা মনে আসিয়াছে। কিন্তু রোহিণীর রূপের আকর্ষণ অনিবার্য বেগে গোবিন্দলালকে টানিতেছে। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মত এ দুর্বার আকর্ষণে কর্তব্য, বংশমর্যাদা, পত্নীপ্রেম, সহজ ধর্মাধর্মবোধ—গোবিন্দলালের সকল পবিত্র ও সুকুমার মনোবৃত্তি ভাসিয়া গেল। 'বুঝি আমার তাও নাই'—ইহা খেদোক্তি, নিজের জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিয়া সজ্ঞানে মৃত্যুপথ-যাত্রীর সচেতন স্বীকারোক্তি।

মনে রাখিও—এক দিন আমার জন্য তোমাকে কাঁদিতে হইবে—স্বামী ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, মুখের উপর স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছে, 'আর আসিব না।' ইহাতে ভ্রমরের ভূলুণ্ঠিত শির আর উঠিবার কথা নয়। কিন্তু ভ্রমরের অবিকম্পিত

কণ্ঠে এই ঘোষণার মধ্য দিয়া তাহার চরিত্রের আসল রূপ ফুটিয়া উঠিল। ভ্রমর সতী ও সতীধর্মে অকৃত্রিম বিশ্বাসপরায়ণা; এই শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হইতে তাহার দিব্যদৃষ্টি জন্মিয়াছে এবং এই দিব্যদৃষ্টির বলে সে জানিতে পারিতেছে, গোবিন্দলালের চিত্তে এই রূপোন্মত্ততার একদিন অবসান ঘটিবে এবং তখন দুঃখে, বেদনায় গোবিন্দলালকে ভ্রমরের কথাই স্মরণ করিতে হইবে।

তুমি আমারই—রোহিণীর নও—গোবিন্দলালের রূপোন্মত্ততার অন্তরালে যে হৃদয় আছে (গোবিন্দলাল নিজে কিন্তু সাময়িকভাবে তাহার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন।) তাহা অনুভব করিয়াই ভ্রমর এই কথা বলিতেছে। এই একটি কথার মধ্যে ভ্রমরের সমস্ত চরিত্রটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্বামী পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে—'আর আসিব না' তাহার সমস্ত কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে। তথাপি ভ্রমর তাহার সেই চরম পরাজয়ের মুহূর্তেও গর্ব করিয়া বলিতেছে—'তুমি আমারই—রোহিণীর নও'। এ শক্তি ভ্রমর কোথা হইতে পাইল? ইহা প্রেমের শক্তি।

ভ্রমর জানিতে পারিতেছে, অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছে—রোহিণীর রূপের তীব্র মোহে গোবিন্দলাল আচ্ছন্ন, আবিষ্ট। সহজে তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু এ অন্ধকার একদিন কাটিয়া যাইবে। এ মোহের একদিন অবসান ঘটিবেই। তখন হয়তো হাহাকার ব্যতীত আর কিছুই করিবার থাকিবে না, তবু এ ভুল ভাঙ্গিবে। আজ গোবিন্দলাল ভুল করিতেছেন, কিন্তু পরে যখন সে ভুল তাঁহার ভাঙ্গিবে তখন আবার তাঁহাকে ভ্রমরের নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে। কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া গোবিন্দলালকে আবার তাহার কাছে ফিরিয়া আসিতেই হইবে, পাপের দাহের শান্তির জন্য ভ্রমরের প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের মধ্যে আবার আশ্রয় খুঁজিতে হইবে। একথা যদি মিথ্যা হয়, তবে দেবতা মিথ্যা, ধর্ম নাই ও ভ্রমর অসতী।

ভ্রমরের শ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাস ছিল, নিজের সতীত্বকে পরম পবিত্র ও গৌরবের বস্তু বলিয়া সে মনে করিত। কোনও রূপ শিক্ষাপ্রসূত বিকার তাহার চিত্তকে তরল করিয়া ফেলিতে পারে নাই, বিশ্বাস করিবার ক্ষমতাকে লুপ্ত করিয়া দিতে পারে নাই। তাহার চরম পরাজয়ের মুহূর্তেও তাহার এই তেজোদৃপ্ত দিব্যদৃষ্টি-প্রসূত ভাষণ অসহায় স্বামী-পরিত্যক্তা বালিকাবধূটির চরিত্রকে জ্যোতির্মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে গমন করিয়া—ভ্রমরের চলিবার ভঙ্গিটি তাহার কথার সহিত সুন্দর মিলিয়াছে।

একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ—কিছুদিন পূর্বে ভ্রমরের সাত দিনের এক ছেলে সূতিকাগারেই মারা গিয়াছিল। আজ স্বামী-পরিত্যক্তা ভ্রমর রুদ্ধদ্বার কক্ষে সেই মৃতপুত্রের জন্য কাঁদিতে লাগিল।

আর এদিকে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে রূঢ়ভাবে দুর্বাক্য বলিয়া যখন বাহিরে আসিলেন তখন তাঁহার চক্ষুও শুষ্ক নয়। উদ্বেলিত অশ্রু চক্ষু দুইটি সজল করিয়া তুলিয়াছে। ভ্রমরের প্রীতি মনে পড়িল, যাহা ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন পৃথিবী খুঁজিলেও যে তাহা পাওয়া যাইবে না, একথাও মনে পড়িল। যাত্রা করিয়া তিনি বাহির হইয়াছেন, এখনই ফিরিবার কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তবুও গোবিন্দলালের মনে হইল ফিরিয়া যাই। কিন্তু এইমাত্র বীরদর্পে বাহির হইয়া আসিয়া আবার নতমস্তকে ফিরিয়া যাওয়া—গোবিন্দলালের পৌরুষে একটু বাধিল, একটু লজ্জা করিতে লাগিল। ভাবিলেন এখনি এত তাড়াতাড়ি ফিরিবার প্রয়োজন কি? পরে ফিরিলেই চলিবে। মাটির ভাণ্ড যখন খুশী ভাঙ্গিলেই চলিবে। বিধাতা-পুরুষ পুনরায় সকলের অলক্ষ্যে হাসিলেন।

আজি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে—ছেলেটি যদি বাঁচিয়া থাকিত তবে এই সন্তানই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারিত। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে উপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সেই সন্তানকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিতেন না।

এখন যাই। বুঝি আর ফেরা হইবে না। যাহা হউক, যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই—গোবিন্দলালের হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব থামিতেছে না। যে পথে পা বাড়াইয়াছেন সেই পথে পা দিতেই মনের মধ্যে একটা দ্বিধা উঁকি দিতেছে। হয়তো আর ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই, এই জীবনের মত হয়তো এইখানেই শেষ—এইরকম একটা পরিণামবোধ ভিতরে ভিতরে এখনই গোবিন্দলালকে পীড়া দিতেছে। কিন্তু বিবেকের এই প্রতিবাদ, অবচেতন মনের সতর্কবাণী তিনি শুনিলেন না। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মত গোবিন্দলালের সমস্ত শুভাশুভ বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া যে দুর্বার রূপমোহ তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে তাহার শক্তি এখন প্রবলতর। অপ্রতিরোধ্য প্রাক্তন যেন গোবিন্দলালকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিতেছে।

ইচ্ছা হইলেও একটু লজ্জা করিল—এইমাত্র ভ্রমরের নিকট বীরত্বের সঙ্গে গর্ব করিয়া বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লজ্জা বোধ করা অস্বাভাবিক নয়। যখন মনে করিব, তখন ফিরিব—ফিরিবার ইচ্ছা যখন আছে, তবে এত তাড়াতাড়ি কি? রাগের মুহূর্তে ভ্রমরকে মুখে যাহাই বলিয়া

াকুন না কেন, গোবিন্দলাল মনে মনে ফিরিয়া আসিবার একটা ইচ্ছা পোষণ রিতেন। 'ফিরিয়া আসা পরে যে আরও কঠিন হইতে পারে, ঘটনা-পরম্পরা আরও রুতর বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।'—এই কথা গোবিন্দলালের মনে হয় নাই, না ওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

পথে যাইতে যাইতে রোহিণীর রূপরাশি হৃদয়মধ্যে ফুটিয়া উঠিল—নানা ধায়-দ্বন্দ্বে, ভ্রমরকে এইভাবে দুঃখ দিয়া চলিয়া আসিবার সময় গোবিন্দলালের ন প্রসন্ন ছিল না। কিন্তু রোহিণীর রূপের চিন্তায় গোবিন্দলালের হৃদয়ের অবসাদ াটিয়া গেল—ভ্রমরের চিন্তাজনিত অনুশোচনার হাত হইতে গোবিন্দলাল নিষ্কৃতি াইলেন। কিন্তু তাহা সাময়িক কালের জন্য।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ—গোবিন্দলাল মাতাকে নির্বিঘ্নে কাশী পৌঁছাইয়া দিলেন। ত্রাদি আমলাদের নিকটই আসিল। অভিমানে ভ্রমর কোনও পত্র দেয় নাই। াস দুই পরে সংবাদ আসিল গোবিন্দলাল কাশী হইতে বাড়ী আসিতেছেন। ভ্রমর ঝিল, গোবিন্দলাল মাকে ভুলাইয়া অন্যত্র যাইতেছেন। ভ্রমর রোহিণীর সংবাদ াপনে লইত। রোহিণী যথারীতি জল আনে, রাঁধে, খায়। হঠাৎ একদিন শুনা াল রোহিণীর অসুখ, তারপর জানা গেল অসুখ খুব বাড়াবাড়ি। রোহিণী হত্যা তে তারকেশ্বর গিয়াছে। এদিকে বাড়ী যাইবার নাম করিয়া গোবিন্দলাল কাশী ়তে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহারও কোনও সংবাদ নাই। ওদিকে রোহিণীও ারকেশ্বর হইতে আর ফিরিল না। ভ্রমরের বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। একবার ত্রালয়ে গেল, সেখানে গোবিন্দলালের সংবাদ পাইবার আশা নাই দেখিয়া াবার হরিদ্রাগ্রামে ফিরিয়া আসিল। শাশুড়ীকে কাশীতে পত্র লিখিয়াও াবিন্দলালের সংবাদ পাইল না। এক বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। সে রুগ্নশয্যায় ন করিল।

ভ্রমর গোপনে সর্ব্বদা রোহিণীর সংবাদ লইতে লাগিল—গোবিন্দলালের ভবিষ্যৎ পিদ্ধতি সে যেন কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াছে। গোবিন্দলাল কোনও অজ্ঞাত ়ানে রোহিণীর সহিত অবৈধ প্রণয়াসক্ত হইয়া কাল কাটাইবেন এইরূপ আশঙ্কা হার পূর্ব হইতেই ছিল।

রোহিণী…তারকেশ্বরে গিয়াছে—গোপনে গোবিন্দলালের সহিত মিলিত

হইবার উদ্দেশ্যে রোহিণী হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িল। এই ব্যাপারটা যাহাতে চাপা থাকে তাহার জন্ম রোহিণীর অসুখ, অসুখের বাড়াবাড়ি, তারকেশ্বরে হত্যা দিবার কথা প্রভৃতি অনেকগুলি মিথ্যাসংবাদ রোহিণী প্রচার করিয়াছিল। অনেক কিছু ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু লেখক আমাদিগকে তাহা জানাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। গোবিন্দলালের সহিত রোহিণী বা ব্রহ্মানন্দের গুপ্ত পত্রালাপ বা সংবাদ আদান-প্রদান নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকিবে। এসব খুঁটিনাটি ব্যাপার বর্ণনা করিলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইত। কাহিনীর জন্য যতটা নিতান্ত প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত পাপচরিত্রের বর্ণনায় লেখকের বিরূপতা আছে তাহাও মনে রাখা দরকার।

আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমুখে ব্যক্ত করিব না—ভ্রমরের সন্দেহ ঘনীভূত হইয়াছে। রোহিণীর তারকেশ্বর গমনের গুজব ও গোবিন্দলালের নিরুদ্দেশ হওয়া একই সময় ঘটিতেছে। ভ্রমর এইরূপ একটা যোগাযোগের আশঙ্কাই এতদিন করিতেছিল। সন্দেহ ঘনীভূত হইয়াছে, কিন্তু একথা ভ্রমর প্রকাশ করে কেমন করিয়া? স্বামী অন্য রমণীতে আসক্ত একথা কি কাহাকেও বলা যায়?

অপরাজিতা ফুল শুকাইয়া উঠিল—প্রত্যাখ্যান ও অপমান সহ্য করিয়াছে, দীর্ঘ একবৎসর নির্বাক হইয়া বেদনা বহন করিয়াছে, গোবিন্দলালের একটু সংবাদ পর্যন্ত পাইবার উপায় নাই। ভ্রমর আর সহিতে পারিল না। সদাহাস্যময়ী মূর্তি ব্যথায় ম্লান হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ রোগশয্যাশায়িনী কন্যাকে দেখিতে আসিলেন। ভ্রমর পিতাকে বলিল, 'আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, আমাকে ব্রতনিয়ম করাও।' কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া মাধবীনাথ বাহিরে আসিয়া ক্রন্দন করিলেন। দুঃখ ক্রোধে পরিণত হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাহারা তাঁহার কন্যার সর্বনাশ করিয়াছে তিনি তাহাদের সর্বনাশ করিবেন। মাধবীনাথ গোবিন্দলালের খোঁজ-খবর লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমলাগণ কেহই বলিতে পারিল না গোবিন্দলাল কোথায় আছেন।

অনেকে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিত—অনেকে বলিত, তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই—অধিকাংশ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন চতুর লোক সমাজে কতকগুলি লোকের প্রশংসা ও কতকগুলি লোকের নিন্দা লাভ করিয়া থাকে। যাহাদের স্বার্থরক্ষা হয়, সুবিধা হয়, তাহারা প্রশংসা করে; যাহাদের স্বার্থহানি ঘটে, অসুবিধা হয়, তাহারা নিন্দা করে। নিরপেক্ষভাবে কেহই বিচার করিতে পারে না।

আমি সেই কথাই ভাবিতেছিলাম—মাধবীনাথ মোটেই কন্যার ব্রতনিয়মের কথা ভাবেন নাই—তিনি যেরূপে হউক গোবিন্দলালের সন্ধান বাহির করিয়া তাহার শাস্তি বিধানের জন্য মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন। মেয়ে এই অল্পবয়সে সংসারের সুখসাধ বিসর্জন দিয়া ব্রতনিয়ম করিতে চাহিতেছে দেখিয়া তাঁহার পিতৃহৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু আপাততঃ মেয়েকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এইভাবে কথা আরম্ভ করিলেন, ব্রতনিয়মের প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য।

বাবুর এক্ষণে অজ্ঞাতবাস—দেওয়ানজির উপযুক্ত কথা। তাঁহারা গোবিন্দলালের সংবাদ পাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত সঙ্গতভাবেই তাঁহারা করিতে পারেন। উক্তিটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহস্যের ইঙ্গিত আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মাধবীনাথ প্রতিজ্ঞা করিলেন, গোবিন্দলাল-রোহিণী যেখানেই লুকাইয়া থাকুক না কেন, তিনি খুঁজিয়া বাহির করিবেন। মাধবীনাথ গ্রামের ডাকঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাকঘরে ব্রহ্মানন্দের নামে কোনও চিঠিপত্র আসে কিনা তাহা প্রথমে তোষামোদ করিয়া, বকশিসের কথা বলিয়া ও পরে ভয় দেখাইয়া জানিয়া লইলেন। ব্রহ্মানন্দের নামে প্রতি মাসে যশোর জেলার প্রসাদপুর হইতে রেজেষ্টারী ডাকযোগে চিঠি আসিয়া থাকে। মাধবীনাথ বুঝিলেন, গোবিন্দলাল বা রোহিণী ব্রহ্মানন্দকে প্রতি মাসে টাকা পাঠায়।

কি হে বাপু, কেমন আছ? তোমাকে দেখিয়াছি না?—মাধবীনাথ হরিদাস পিয়াদাকে ডাকঘর হইতে বিদায় করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ গায়ে পড়িয়া তাহার সহিত আলাপ করিলেন।

কি কন?—কিছু দিতে চাহিবার সঙ্গে পোস্টমাস্টারের এই প্রকার উত্তরের মধ্যে তাহার সমস্ত চরিত্র পরিস্ফুট।

যে কথাটি বলিয়া দিলাম, তাহার এখনও টাকা পাই নাই—দুই-একটি কথায় চরিত্রটি কেমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি কথার উত্তর দিবার পূর্বে টাকা লইবার জন্য হাত বাহির করা একশ্রেণীর কর্মচারীর স্বভাব।

তুমি ত বিদেশী মানুষ দেখ্‌ছি—আমায় চেন কি?—এইবার মাধবীনাথ নিজ মূর্তি-ধারণের উপক্রম করিতেছেন।

আপনি যেই হউন না ইত্যাদি—পোস্টমাস্টার বাবু এখনও মাধবীনাথকে চিনিতে পারেন নাই, তাই এখনও সরকারী চালে কথাবার্তা বলিতেছেন।

পোষ্ট বাবু থরহরি কাঁপিতে লাগিলেন—মাধবীনাথ যে কত বড় দুর্দান্ত লোক, তাঁহার মাথায় যে কত রকম ফন্দী আছে, সে কথা বলিয়া যে ভয় দেখাইলেন তাহা

এই লোক অনায়াসেই সাধন করিতে পারেন। সুতরাং এই রকম লোককে চটাইলে বিদেশী মানুষ অচেনা জায়গায় একেবারে ধনেপ্রাণে মারা যাইবে। এই আশঙ্কা পোস্টমাস্টার বাবুর মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

বলা বাহুল্য যে, পোষ্ট বাবু তাহা আত্মসাৎ করিলেন—পিয়নের একটা টাকার লোভও তিনি ছাড়িতে পারিলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—রোহিণী ও গোবিন্দলালের সন্ধান মিলিল। এখন ব্রহ্মানন্দের নামে চিঠি আসে জানিতে পারিয়া ব্রহ্মানন্দের নিকট লিখিত পত্রটি হইতেও আরও কিছু জানা যায় কিনা এবং যে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা সত্য কিনা বুঝিবার জন্য চতুর মাধবীনাথ এক নূতন ফন্দী করিলেন। ব্রহ্মানন্দের কাছে চোরাই নোট আছে এবং ঐ নোট প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে এইভাবে ব্রহ্মানন্দকে ভয় দেখাইয়া মাধবীনাথ রোহিণীর পত্র দেখিয়া লইলেন। তারপর মাধবীনাথ নিশাকর দাস নামে তাঁহার এক বন্ধুর সহিত প্রসাদপুর যাইবার জন্য যশোহর রওনা হইলেন।

আপনার কোন বিপদ্ আপদ্ পড়িলেই আমাদিগকেই দেখিতে হয়—মাধবীনাথের ভূমিকাটি চমৎকার। অল্পকথার মধ্যে একটু ভয় দেখাইয়া শুভাকাঙ্ক্ষী সাজিবার এই অভিনয়টিও বেশ সুন্দর।

ব্রহ্মানন্দের মুখ শুকাইল—ব্রহ্মানন্দ কি রকম নিরীহ গোবেচারী লোক তাহা উইল বদলাইবার ব্যাপারে দেখা গিয়াছে। সুতরাং অজ্ঞাত বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহার যে মুখ শুকাইবে ইহা খুবই স্বাভাবিক।

ব্রহ্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল—চোরাই নোট তাহার কাছে। সর্বনাশ! কি ভাবে আসিল! ব্রহ্মানন্দ আশ্চর্য হইল, ভয় পাইল।

মাধবীনাথ তখন আওয়াজ ছোট করিয়া বলিলেন—সুদক্ষ অভিনেতার ন্যায় কণ্ঠস্বর ও মুখভাব মাধবীনাথ ইচ্ছামত পরিবর্তন করিতে পারেন। সম্ভবতঃ এই সকল কারণেই তাঁহার প্রশংসাকারী ও নিন্দাকারী দুই-ই ছিল।

চোরা নোট প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে—ইহা অবশ্য মাধবীনাথের খানিকটা অন্ধকারে ঢিল ফেলা। চিঠিপত্র যখন আসে, বিশেষতঃ রেজেষ্ট্রী চিঠি তখন চিঠির মধ্যে নিশ্চয় নোট থাকে।

ব্রহ্মানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল—এই কম্পন দেখিয়াই মাধবীনাথ বুঝিতে পারিলেন প্রসাদপুর হইতে টাকা আসে। সুতরাং এবার ব্রহ্মানন্দকে একটু আশ্বস্ত করিয়া চিঠিখানা পড়া দরকার।

এ নম্বরের নোট নহে। কোন ভয় নাই—ব্রহ্মানন্দের পরম হিতৈষী সাজিয়া আসল কাজ হাসিল করা ও পরে তাহাকে আশ্বাস দিয়া বিদায় দেওয়া অভিনয়ের দিক্ দিয়া নিখুঁত। কি প্রকাণ্ড ধাপ্পা দিয়া মাধবীনাথ ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে গোপন সংবাদ জানিয়া গেলেন ব্রহ্মানন্দ তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। কনস্টেবলের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে জানিয়া সে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

নিশাকর দাস উপন্যাসের শেষ অংশে মাধবীনাথের বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের সহচররূপে হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছে। উপন্যাসের নিশাকর একটি ক্ষুদ্র চরিত্র, উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রীগণের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। একান্ত প্রয়োজনের অনুরোধে গ্রন্থকার উপন্যাসের এই বিশিষ্ট চরিত্রটির সাহায্যে অতি নিপুণতার সহিত উপন্যাসের ঘটনাস্রোত সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিচালিত করিয়াছেন। গোবিন্দলাল-রোহিণীর ভাগ্যাকাশে নিশাকর সহসা ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হইয়া এক মুহূর্তে উহাদের চরম সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। রোহিণীর কলুষিত জীবন-নাট্যের শেষ যবনিকাপাতও যেমন তাহারই সাহায্যে হইয়াছে, তেমনি গোবিন্দলালের সহিত ভ্রমরের পুনর্মিলনের শেষ আশাও নির্মূল হইয়াছে। নিশাকর দাসের একটি মাত্র কূটকৌশলের উপর ভিত্তি করিয়া লেখক উপন্যাসের শেষ অংশ রচনা করিয়াছেন, নিশাকর দাসের আবির্ভাব না ঘটিলে উপন্যাসের উপসংহার অন্যভাবে চিন্তা করিতে হইত। রূপমোহ ও ভোগলিপ্সা অপনীত হইলে পাপাসক্ত যুবক-যুবতীর মধ্যে চিরবিচ্ছেদ হওয়াই স্বাভাবিক। গোবিন্দলালের চির নরকে ডুবিয়া থাকা অথবা রোহিণীকে ত্যাগ করিয়া ভ্রমরের নিকট ফিরিয়া আসা—এই দুইটির একটি করিতে হইত। কিন্তু নিশাকর মুহূর্তের মধ্যে সব ওলট-পালট করিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—প্রসাদপুরের গোপন নিবাসে নিশাকর দাসের আবির্ভাব। যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব—রোহিণী-গোবিন্দলালের অবৈধ প্রণয়াসক্ত জীবনের সমগ্র স্বরূপ লেখক আমাদিগকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে অনিচ্ছুক। আভাসে-ইঙ্গিতে এবং কাহিনীর জন্য যেটুকু না বলিলে নয়, তাহার বেশী তিনি বলিতে রাজী নহেন। পাপের চিত্র লোভনীয় করিয়া, সরস করিয়া বর্ণনা করিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। এই বিষয়ে শিল্পী বঙ্কিমের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, পাপের পরিণাম দেখাইবার জন্য, ইহার বিষময় ফল দেখাইবার জন্য, পাপের চিত্রও বিস্তৃতভাবে আঁকা যাইতে পারে। কদর্যতাকে নিরাবরণ করিয়া দেখাইলে ইহার প্রতি মানুষের বিরূপতা আসে। পাপকে

তিরস্কৃত করিবার জন্য, পাপের আপাতমধুর রমণীয়তায় অতি তিক্ত পরিণতি দেখাইবার জন্য পাপচিত্রের অঙ্কন সমর্থনযোগ্য।

অকস্মাৎ রোহিণীর তবলা বেসুরা বাজিল—আসন্ন বিপদের এইভাবে একটা ছায়াপাত করা, কার্য-কারণ-সূত্রবর্জিত একটা আকস্মিক ব্যাপারের সাহায্যে ভাবী ঘটনার পূর্বাভাস জাগাইয়া তোলা বঙ্কিমের রচনারীতির একটি বৈশিষ্ট্য। মনে হয়, যেন কোন অদৃশ্য রহস্যময় জগৎ হইতে অমঙ্গলের আভাস নামিয়া আসে, হঠাৎ অকারণে আনন্দ কমিয়া যায়, রসভঙ্গ হয়। গোবিন্দলাল যখন অর্ধমৃতা রোহিণীর মুখে ফুঁ দিয়া তাহার জীবন রক্ষা করেন, তখন ভ্রমর বিড়াল মারিতে গিয়া আপনার মাথায় আঘাত করিয়া বসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—নিশাকরের সহিত গোবিন্দলালের সাক্ষাৎ। নিশাকর ভ্রমরের প্রসঙ্গ তুলিলেন। তিনি অবশ্য মিথ্যা বানাইয়া বলিলেন, ভ্রমরের কিছু সম্পত্তি তিনি ইজারা লইবেন। গোবিন্দলালের অনুমতি প্রয়োজন। গোবিন্দলাল ভ্রমরের নাম শুনিয়াই অন্যমনস্ক হইলেন। তাঁহার ভাবান্তর লক্ষিত হইল। নিশাকর চলিয়া গেলে গোবিন্দলাল তবলা লইয়া, সেতার লইয়া, নভেল লইয়া সময় কাটাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই আজ মন বসিল না। তারপর নিজ শয়নকক্ষে দ্বাররুদ্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ওর সঙ্গে দুটো কথা কইতে পাই না? ক্ষতি কি—রোহিণীর এই দোলাচল চিত্তবৃত্তির মধ্য দিয়া লেখক গোবিন্দলালের প্রতি তাহার আন্তরিক নিষ্ঠার অভাব ইঙ্গিত করিতেছেন। কেবল সম্ভোগের মধ্য দিয়া আকাঙ্ক্ষাকে বেশী দিন বাঁচাইয়া রাখা যায় না। প্রেম পরিচয়ের মধ্য দিয়া নিবিড় হইয়া উঠে, কিন্তু সমাজবন্ধনের বাহিরে সকল কর্তব্য বিসর্জন দিয়া এই আত্মকেন্দ্রিক ভোগাসক্তি ক্রমশঃই পুরাতনের প্রতি তাহার উদগ্র আকর্ষণ হারাইয়া ফেলে। নূতন লোকের প্রতি এই আকর্ষণ চালিত করিয়া ইহাকে নবায়মান করিয়া তুলিবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। রোহিণীর কি ঘটিয়াছিল লেখক স্পষ্টভাবে সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন না।

আমরা শুনিয়াছি, এমত কথাবার্তা হইয়া থাকে—নরনারীর দৃষ্টিবিনিময়ে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জন্মিতে পারে এই কথা লেখক পরোক্ষভাবে বলিতেছেন।

নিশাকর কতক কতক বুঝিলেন—ভ্রমরের নাম উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমরের স্মৃতি যে গোবিন্দলালকে অন্যমনস্ক করিয়া তুলিয়াছে তাহা নিশাকরও ধরিতে পারিয়াছিলেন। গোবিন্দলাল এবার চিত্ত সংযত করিয়া কথা সকল শুনিলেন —গোবিন্দলাল তাঁহার নির্জনবাসে কলুষিত জীবনযাপনের মধ্যে বহুদিনের পরে

ভ্রমরের নাম শুনিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মন অতীতের সহস্র-স্মৃতিজড়িত জীবনের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। সুতরাং সম্মুখে বসিয়া নিশাকর যে কি বলিয়া গেল তাহা কানে শুনিলেও তাঁহার মনে প্রবেশ করে নাই। এবার বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযত করিয়া কথাগুলি শুনিয়া বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন।

ভ্রমরের জন্য কাঁদিল, কি নিজের জন্য কাঁদিল, তা বলিতে পারি না। বোধ হয় দুইই—আত্মবিস্মৃতির মধ্যে যদি হঠাৎ স্মৃতি জাগিয়া উঠে, নরকের বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে যদি স্বর্গের বাতাস বহিয়া যায়, তবে মানুষের মন স্থির থাকে কি করিয়া? ভোগপঙ্কিল বিলাসময় জীবনের মধ্যে ভ্রমরের পুণ্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, বিনা অপরাধে ভ্রমর যে দুঃখ পাইতেছে এবং এই দুঃখ গোবিন্দলাল সম্পূর্ণ সজ্ঞানেই ভ্রমরকে দিয়াছে—এই মনে করিয়া নিজের অধঃপতনের পরিণাম বুঝিতে পারিয়া গোবিন্দলাল রুদ্ধদ্বার কক্ষে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল।

ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় নাই—গোবিন্দলাল ভ্রমরকে দুঃখ দিয়া পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, কোন্ মুখে তিনি আর ফিরিয়া যাইবেন? যে বিষ তিনি গলাধঃকরণ করিয়াছেন তাহার ফলে সমস্ত দেহমন বেদনায় নীল হইয়া গেলেও তাহা উদ্‌গীরণ করিবার উপায় নাই। রোহিণীর সঙ্গেই এই কলুষিত জীবনের শেষ পর্যন্ত বাস করিতে হইবে। পরদারনিরত স্বামীকে ভ্রমর গ্রহণ করিবেই বা কি করিয়া।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—নিশাকর আসিয়া বড় হলে বসিলে রোহিণী পাশের কক্ষে অন্তরাল হইতে নিশাকরকে যে দেখিতেছিল তাহা নিশাকরের চক্ষু এড়ায় নাই। নিশাকর উঠিয়া যাওয়ার পর রোহিণী রূপা চাকরকে ইশারায় ডাকিয়া বলিল যে, আগন্তুক বাবুটি রোহিণীর দেশের লোক, সে নিরিবিলি আগন্তুকের সঙ্গে দুই একটা কথা বলিবে, কাজেই রূপা যেন তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করে। বাবুকে না জানাইয়া ইহা করিতে পারিলে পাঁচ টাকা বকশিস মিলিবে। রূপা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া নিশাকরের নিকট গেল। নিশাকর রূপাকে জানাইলেন যে, তিনি বাড়ীতে অপেক্ষা করিয়া রোহিণীর সহিত দেখা করিতে পারিবেন না, কারণ তাঁহার জানের একটা ভয় তো আছে। অধিকন্তু তিনি রূপাকে বলিয়া দিলেন যে, রোহিণীর খুড়ামহাশয় কয়েকটি দরকারী কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, বাবু তাড়াইয়া দিলেন, কাজেই তাহা আর বলা হইল না। নদীর ধারে যে বাঁধাঘাট আছে সেইখানে সন্ধ্যার পর রোহিণীর জন্য তিনি অপেক্ষা করিতে পারেন। রূপা আসিয়া রোহিণীকে সমস্ত কথা বলিল। নিশাকর রূপার মুখে

শুনিয়া গেলেন, রোহিণী সন্ধ্যার পর চিত্রার বাঁধাঘাটে নিশাকরের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

তামাকু ইচ্ছা করিবেন কি?—রূপা ভদ্রতা করিতে আসে নাই, নগদ পাঁচ টাকার লোভে কার্যসিদ্ধি করিতে আসিয়াছে, তাহার ভূমিকাটি চমৎকার।

নিশাকর আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইলেন—নিশাকর যে কার্যে আসিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ করিবার কোনও উপায় তিনি ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। রূপার মুখে রোহিণীর প্রস্তাব শুনিতে পাইয়া তিনি যেন অন্ধকারে পথ পাইলেন—অবিলম্বে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে ইহা বুঝিতে পারিলেন।

আর একটি কথা বলিও—নিশাকর বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া আর একটি টোপ ফেলিলেন। রোহিণী যাহাতে নিশ্চয়ই আসে সেইজন্য ব্রহ্মানন্দের দরকারী কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এমন খবর আমরা রাখি না—রোহিণী তাহার কাকার কথা শুনিয়া তাহার সংবাদ পাইবার জন্য এত বড় দুঃসাহসের কাজে রাজী হইল, ইহা লেখকের বিশ্বাস হয় না। রোহিণী ব্রহ্মানন্দকে এত ভালবাসিত না, যে তাহার একটি সংবাদ পাইবার জন্য সন্ধ্যার পর গোবিন্দলালের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া নির্জন নদীতীরে সন্ধ্যার পর অপরিচিত একটি পুরুষের সহিত দেখা করিতে আসিতে পারে। একটু দৃষ্টিবিনিময়, ভাববিনিময় হইয়াছিল—এখানে রোহিণীর স্বৈরাচারের প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত। অনবধান মৃগ পাইলে ইত্যাদি—রোহিণী যেন পুরুষকে শিকার মনে করে। রোহিণীর প্রণয়চর্চা যেন ব্যাধব্যবসায়—কাজেই অনবধান মৃগ তাহার লক্ষ্যবস্তু। লেখকের অনুমিত রোহিণীর মানসিক অবস্থাটা এইরূপ।

রোহিণী গবাক্ষপথে নিশাকরকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধা হইয়াছিল। কিন্তু মনে মনে তাহার সংকল্প ছিল, নিজের রূপে নিশাকরকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণে রূপতৃষ্ণা জাগাইয়া দিয়া নিজের পুরুষচিত্তজয়ের লিপ্সাকে চরিতার্থ করিবে। নিশাকরের প্রণয়লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রাণে আদৌ জাগে নাই।

বাঘ গোরু মারে,—সকল গোরু খায় না—লেখক রোহিণীকে বৃথা গোহত্যাকারী ব্যাঘ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বাঘ অনেক সময় কেবল হিংস্র প্রবৃত্তি তৃপ্ত করিবার জন্য গোহত্যা করে, উদরপূর্তির জন্য নহে। তেমনি বহু রূপসী রমণীও পুরুষচিত্তে শুধু রূপলালসার আগুন জ্বালাইয়া দিয়া বিজয়গৌরব অনুভব করে। প্রণয় লাভ করিয়া তৃপ্ত হইতে তাহারা চায় না। রূপের সাহায্যে পুরুষচিত্তজয়ের এই হীন প্রবৃত্তিকে হিংস্র ব্যাঘ্রের নিরর্থক গোহত্যার সঙ্গে তুলনাটি সুন্দর।

যদি এই আয়তলোচন মৃগ ইত্যাদি—রোহিণী নিশাকরকে কেবল শরবিদ্ধ

করিতে চাহে—শুধু নিশাকরের চিত্তজয় করিতে চায়। উপভোগ করিতে চায় না, শুধু জয়ই তাহার উদ্দেশ্য। জানি না, এই পাপীয়সীর পাপচিত্তে কি উদয় হইয়াছিল—রোহিণীকে এতক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া, তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া লেখক রোহিণীর মনোভাব অনুমান করিয়া লইতেছেন। মনোভাব সম্বন্ধে সঠিক জানিয়া তাহার পর কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করা একটি রীতি; অপর রীতিটি হইল কার্যকলাপ দেখিয়া মনোভাব সম্বন্ধে অনুমান করিয়া একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। বঙ্কিম দ্বিতীয় রীতিটি গ্রহণ করিয়াছেন। ফলকথা লেখক বলিতে চাহেন যে, রোহিণীর মনের চিত্র স্পষ্টভাবে জানিবার উপায় নাই, কিন্তু নিশাকরকে দেখিয়া তাহার যে একটা চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল তাহাতে কোনও ভুল নাই। নিশাকরের সহিত প্রণয়াবদ্ধ না হইলেও প্রণয়ের খেলা খেলিতে দোষ কি?

অষ্টম পরিচ্ছেদ—নিশাকর এবার সোণাকে হাত করিলেন। রূপার অসাক্ষাতে খুব গোপনে গোবিন্দলালকে জানাইতে হইবে যে, রোহিণী চিত্রার বাঁধাঘাটে সন্ধ্যার পর নিশাকরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে। রোহিণীর মৃত্যুর ব্যবস্থা এইরূপে হইল। বাঁকা পথে গিয়াছি বলিয়াই এত সঙ্কোচ হইতেছে—রোহিণীর সহিত গোপন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা এবং এই সাক্ষাতের কথা চাকরকে দিয়া গোবিন্দলালকে জানানো—এই কৌশলটি সহজ নয়। একটি স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত কিনা এই প্রশ্ন নিশাকরের মনে জাগিতেছে। মনের গুপ্ত কোণে ইহার নৃশংসতা অনুভব করিয়া একটা মৃদু বেদনাবোধও জাগিতেছে। পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কে?—রোহিণী পাপীয়সী, একটি সুখের সংসার সে ছারখার করিয়া দিল, তাহার দণ্ডবিধান কর্তব্য। কিন্তু প্রশ্ন জাগিতেছে—পাপীর দণ্ড বিধান ভগবান্ করিবেন, নিশাকর স্বহস্তে এই ভার তুলিয়া লইবেন কেন?—অনেকখানি অগ্রসর হইয়া নিশাকরের মনে তাঁহার অবলম্বিত পথের ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে।

বলিতে পারি না, হয়ত তিনিই আমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রশ্নের উত্তর নিশাকর পাইয়াছেন—ভগবান্ আপন হাতে দণ্ড বিধান করেন না। এই ক্ষেত্রে রোহিণীর দণ্ডও তিনিই দিতেছেন। নিশাকর উপলক্ষ মাত্র। নিষ্ঠুর ব্যবস্থার একটা কৈফিয়ৎ বিবেককে নিশাকর এইভাবে দিয়া সমস্ত দুর্বলতা পরিহার করিয়া চরম মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।

তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে—রোহিণীর ইহাই প্রথম অস্ত্র। নিশাকরকে জয় করিবার ইচ্ছার প্রথম প্রমাণ।

আমি যদি ভুলিবার লোক হইতাম ইত্যাদি—অসংযত ভোগেচ্ছা, চিত্তদমনের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের অভাব যে, রোহিণীর বর্তমান অবস্থার কারণ তাহা রোহিণী স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিতেছে।

একজনকে ভুলিতে না পারিয়া ইত্যাদি—যে মনোবৃত্তি, যে উদগ্র লালসা রোহিণীকে হরিদ্রাগ্রামের পরিবেশ হইতে এই কলুষিত সম্ভোগের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে, সেই মনোবৃত্তিই গোবিন্দলালের সুরক্ষিত প্রমোদভবন হইতে তাহাকে চিত্রার বাঁধাঘাটে টানিয়া আনিয়াছে। ইহাতে তাহার স্বৈরিণী মনোভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ছাড়! ছাড়! আমি মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই—বিপন্ন রোহিণীর এই উক্তি লেখকও আংশিকভাবে স্বীকার করেন। রোহিণীর উদ্দেশ্য শুধু অনবধান মৃগকে শরবিদ্ধ করা, তদতিরিক্ত নয়।

নবম পরিচ্ছেদ—গোবিন্দলাল রোহিণীকে পিস্তলের গুলি করিয়া মারিলেন।

কপালে যা ছিল, তা হলো—গোবিন্দলাল রোহিণীকে মারিতে পারে কি না প্রশ্ন করায় রোহিণী এই উত্তর দিতেছে। রোহিণীর এই উক্তিটি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। ইহা কি অনুতাপ? না কাতরোক্তি? আমাদের মনে হয়—রোহিণীর এই কথায় তাহার আকাঙ্ক্ষা যে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহার বঞ্চিত জীবনে পুরুষের যে সাহচর্য সে কামনা করিয়াছিল তাহা পাইয়াছিল বলিয়া পরিতৃপ্ত ভাব ক্ষণেকের জন্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই তো মরার সময়—সুখে যখন মন ভরিয়া উঠে, তখনই তো পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার সময়। রোহিণী হয়তো মনে করিয়াছিল—গোবিন্দলাল সত্য কি আর তাহাকে হত্যা করিবে।

সে দুঃখ নাই, সুতরাং সে সাহসও নাই—যে জ্বালায়, যে অতৃপ্তিতে, যে দুঃখে রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে মরিতে গিয়াছিল আজ সে দুঃখ নাই। সংসারে যে সুখের মুখ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে সংসার ছাড়িয়া যাওয়া যে বড়ই কঠিন। 'কপালে যা ছিল, তা হলো' কথাটি অপরাধিনী রোহিণী ভোগ-সন্তৃপ্ত ভাবের ঝোঁকে বলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ধরা পড়িয়া মরিবার যে ইচ্ছা তাহাও সাময়িক।

ইহাকে কখনও ভুলিব না, কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন?—বাঁচিবার আগ্রহ স্পষ্টভাবে রোহিণীর মনে দেখা দিতেছে। মুহূর্ত পূর্বেই সে মনে করিয়াছিল—মরা কত সহজ? আত্মকেন্দ্রিক ভোগসর্বস্ব জীবনের মমতা কিভাবে জাগিয়া উঠিতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার।

চরণে না রাখ, বিদায় দাও—রোহিণীর বক্তব্য আরও সরল, আরও দ্বিধা-বর্জিত। সে বাঁচিতে চায় কেননা তাহার ভোগকামনা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় নাই।

আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ—রোহিণীর উদগ্র আকাঙ্ক্ষা এবার পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

রোহিণীর এই শোচনীয় মৃত্যু কেহ চাহে নাই। রোহিণী ও গোবিন্দলালের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া গোবিন্দলালের মনকে রোহিণীর প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিবার জন্য মাধবীনাথ নিশাকরের সাহায্য লইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ কার্যের যে এই পরিণতি হইবে সে কথা একবারও তাঁহারা চিন্তা করেন নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন—রোহিণীর প্রতি বিরূপ হইলে, গোবিন্দলালের একবার চোখ ফুটাইয়া দিতে পারিলে অনায়াসে গোবিন্দলাল ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া আসিবে। রোহিণীই যে একমাত্র বাধা নহে, মাধবীনাথ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হইয়াও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। প্রণয়ে বিশ্বাসঘাতকতা মানুষকে কিরূপ হিংস্র করিয়া তুলিতে পারে তাহাও মাধবীনাথ অনুমান করিতে পারেন নাই। রোহিণী যে পাপ করিয়াছে তাহার ফল সে এই জীবনেই পাইবে, নীতির দিক্ দিয়া ও আর্টের দিক্ দিয়া তাহাই হয়তো কাম্য, কিন্তু প্রাণ দিয়া রোহিণী যে-ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে তাহার জন্য দায়ী মাধবীনাথ। নিশাকরের আবির্ভাব গোবিন্দলালের মনে দাম্পত্য-জীবনের সুখস্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছে, ভ্রমর ও হরিদ্রাগ্রামের তুলনায় রোহিণী ও প্রসাদপুরের জীবন যে কত হেয় ও অকিঞ্চিৎকর এই কথা তাহার মনে হইয়াছে। এইরূপ মানসিক অবস্থায় যখন গোবিন্দলাল রোহিণীকে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে দেখিলেন তখন নারীহত্যা করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। রোহিণীর এই হত্যার দৃশ্য বড়ই করুণ। রোহিণী জীবনের স্বাদ পাইয়াছে, এই সামান্য কয়েকদিনে অর্জিত জীবনের স্মৃতিসঞ্চিত মধু বিন্দু বিন্দু পান করিয়া অনায়াসে পরবর্তী জীবন কাটাইয়া দিতে পারিত। বারুণীপুকুরে যে আত্মহত্যা করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই, তাহারই এখন বাঁচিবার জন্য আকুলতা। ইহা মৃত্যুকে আরও মর্মান্তিক করিয়া তুলিয়াছে। সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা জীবনকে ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার শেষ হয় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ—গোবিন্দলাল নিরুদ্দেশ।

কাজ ভাল হয় নাই। একটা খুনোখুনি হইতে পারে—মাধবীনাথ নিশাকরকে বিশেষ কোনও উপায়ের কথা বলেন নাই, নিশাকরও কিভাবে কার্যসিদ্ধি করিবে তাহার কোনও পরিকল্পনা করিয়া প্রসাদপুরের প্রমোদভবনে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু মাধবীনাথ যখন ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত শুনিলেন, সমাজ-জীবনে মানব-চরিত্রের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইহার ফলে একটা হত্যাকাণ্ড হওয়াও বিচিত্র নয়।

এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া—গোবিন্দলাল পুলিশের চোখে ধুলি দিয়া যে আত্মগোপন করিয়া আছে, পুলিশ যে ঘটনাস্থলে বা ঘটনার অব্যবহিত পরেই তাহাকে ধরিতে পারে নাই, এইজন্য নিশ্চিন্ততা।

অথচ অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে—নূতন আর একটা অশান্তির সৃষ্টি হইল, ইহার ফল আবার কি হইবে এই ভাবিয়া বিষণ্ণতা।

একাদশ পরিচ্ছেদ—ভ্রমর শুনিল, গোবিন্দলাল খুনী।

যদি এখানে আসিলে তাঁহার মঙ্গল হয় ইত্যাদি—গোবিন্দলালের নিরাপত্তার জন্য ভ্রমরের আকুলতা লক্ষ্য করিতে হইবে। গোবিন্দলালকে দেখিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা অসীম অথচ সে ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছে যদি হলুদগাঁয়ে না আসিলে গোবিন্দলাল নিরাপদে থাকেন তবে যেন তিনি ইহজন্মে আর হলুদগাঁয়ে না আসেন। স্বামি-সন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত করিয়া সে স্বামীর কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছে। স্বামী এত বড় অন্যায় করিলেও তাঁহার জন্য ব্যাকুলতা ও তাঁহার কল্যাণাকাঙ্ক্ষা ভ্রমরের চিত্তে কত প্রবল!

কিন্তু আমার বিপদের দিনে তোমরা দেখা দিও—গোবিন্দলালের সহিত ভ্রমরের সাক্ষাতের দিনটি ভ্রমর 'বিপদের দিন' মনে করিতেছে। কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান রচিত হইয়া গিয়াছে, গোবিন্দলালকে ভ্রমর আর সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

আহ্লাদের কথা আমার আর কি আছে—গোবিন্দলাল শুধু অবৈধ প্রণয়াসক্ত হইয়া কলুষিত জীবন যাপন করেন নাই, এখন তিনি স্ত্রী-হত্যাকারী। হত্যাকারী গোবিন্দলালের সহিত, অবৈধ প্রণয়াসক্ত গোবিন্দলালের সহিত ধর্মভীরু ভ্রমর আর ইহজন্মে পূর্বের মত মিলিত হইতে পারিবে না। শ্রীসুবোধ সেনগুপ্তের এই প্রসঙ্গে উক্তিটি প্রণিধাণযোগ্য—"যে ভ্রমর কলঙ্কের জনরব শুনিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল, সে যে পরদারনিরত হত্যাকারী স্বামীকে গ্রহণ করিবে না, ইহাই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। গোবিন্দলাল যে খালাস পাইয়া ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না যাইয়া উধাও হইয়াছিলেন তাহাও পূর্ববর্তী ঘটনার সহিত সুসঙ্গতির পরিচয় দেয়।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—গোবিন্দলাল ধরা পড়িলেন। তিনি দেওয়ানজীকে পত্র দিলেন—বৃন্দাবনে বাসকালে তিনি ধরা পড়িয়াছেন। যশোহরে তাঁহার বিচার হইবে। ফাঁসি যাহাতে না হয় ইহাই গোবিন্দলালের ইচ্ছা। তাহা শুনিয়া ভ্রমর লোক পাঠাইয়া মাধবীনাথকে আনিলেন। পিতার হাতে কাগজে নোটে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া বলিলেন, 'এখন যা করিতে হয় কর। —দেখিও—আমি

আত্মহত্যা না করি।' মাধবীনাথ যশোহরে আসিলেন এবং পুলিশের তৈয়ারী তিনটি সাক্ষীকে টাকা দিয়া বশ করিয়া জজসাহেবের নিকট এলোমেলো কথা বলাইলেন। তাহার ফলে মামলা টিকিল না। গোবিন্দলাল খালাস হইলেন। কিন্তু জেল হইতে খালাস পাইয়া গোবিন্দলাল যে কোথায় গা ঢাকা দিলেন, মাধবীনাথ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহা বাহির করিতে পারিলেন না। মাধবীনাথ একাকী হরিদ্রাগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

দেখিও—আমি আত্মহত্যা না করি—বৈধব্য বরণ করা অপেক্ষা ভ্রমর মৃত্যু বরণ করিবে। তোমার আটচল্লিশ হাজার টাকা বাঁচাইব—মাধবীনাথ বিষয়ী লোক; মামলা-মোকদ্দমার কি রকম করিয়া তদ্বির করিতে হয়, তাহা তিনি সবিশেষ জানেন। বিশেষতঃ, খুনের মামলার আসামী, যে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে নাই, ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে ধরা পড়িয়াছে, তাহাকে খালাস করিবার জন্য সরকারী সাক্ষিগণকে কিছু ঘুষ দিবার ব্যবস্থা করিলেই হইবে। মাধবীনাথ এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। সাক্ষী ভাঙ্গাইতে তাঁহার হাজারখানেক টাকা লাগিয়াছিল।

আমার জামাইকে দেশে আনিব—মাধবীনাথ এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। গোবিন্দলালের আত্মাভিমান ও তাঁহার নিজের মনে তাঁহার অপরাধের গুরুত্ব কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে—মাধবীনাথ তাহা ভাবিতে পারেন নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—ছয় বৎসর পরে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের পত্র বিনিময়; মিলন আর হইল না।

গোবিন্দলাল খালাস পাইয়া প্রসাদপুর আসিলেন। প্রসাদপুরের বাড়ীর আসবাবপত্র লুণ্ঠিত হইয়াছিল। বাড়ীটি জলের দামে বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা পাইলেন। তাহা দিয়া অতি সামান্যভাবে কলিকাতায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সামান্য টাকা অল্পদিনেই ফুরাইয়া গেল। তখন বহু ইতস্ততঃ করিয়া ভ্রমরকে একখানা পত্র লিখিলেন। পত্রের মূল বক্তব্য—গোবিন্দলাল সম্পূর্ণ নিঃস্ব, অন্নাভাবে মারা যাওয়া ছাড়া তাঁহার সম্মুখে আর পথ নাই! ভ্রমরের আশ্রয় ব্যতীত তাঁহার আর কোন আশ্রয় নাই। পত্র পাইয়া ভ্রমর কাঁদিল। পত্রের উত্তরে ভ্রমর জানাইল—বিষয় গোবিন্দলালের; তিনি বাড়ীতে আসিয়া নির্বিঘ্নে সম্পত্তি ভোগ করিতে পারেন। গোবিন্দলালের সহিত ইহজন্মে ভ্রমরের সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। ভ্রমরের কোমলতাহীন পত্র পাইয়া গোবিন্দলাল আহত হইলেন। গোবিন্দলাল লিখিলেন—তিনিও হরিদ্রাগ্রামে আর যাইবেন না, মাসিক ভিক্ষা কিছু দিলেই তাঁহার চলিবে। ভ্রমর জানাইলেন মাসিক পাঁচশত টাকা তিনি পাইবেন তবে দেশে আসিয়া উপস্বত্ব ভোগ করিলেই ভাল হয়।

ভ্রমরের দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। গোবিন্দলাল কলিকাতায় রহিয়া গেলেন উভয়েই বুঝিলেন, সেই ভাল।

কি জন্য কাঁদিল, তাহা বলিতে পারি না—গোবিন্দলাল ভ্রমরের নিকট আসিলেন না বলিয়াই শুধু ভ্রমর কাঁদিল না। ভ্রমরের ক্রন্দনের কারণ এত সহজবোধ্য নয়। গোবিন্দলালের অধঃপতন ও দুর্দশা, গোবিন্দলালের সহিত ভ্রমরের পুনর্মিলনের অসম্ভাব্যতা, দাম্পত্য-জীবনের এই শোচনীয় পরিণতি—ইত্যাদি নানা কারণেই ভ্রমর কাঁদিল।

উভয়েই বুঝিলেন, সেই ভাল—গোবিন্দলাল ভ্রমরের কোমলতাহীন পত্র পাইয়া ভ্রমরকে নূতনভাবে চিনিয়াছে—ভ্রমরের সত্য ও ধর্মনিষ্ঠা উপলব্ধি করিয়া ইহজন্মে তাঁহাদের পুরাতন প্রেম ফিরিয়া পাওয়ার অসম্ভাব্যতা বুঝিয়া কলিকাতায় বাস করাই ভাল মনে করিলেন। ভ্রমরও বুঝিল, আন্তরিক ব্যবধান যখন গড়িয়া উঠিয়াছে তখন দূরে থাকাই ভাল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ—সাত বৎসর পরে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের সাক্ষাৎ এবং ভ্রমরের মৃত্যু।

ভ্রমরের রোগ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। সমস্ত চিকিৎসা, শুশ্রূষা, যত্ন ব্যর্থ হইল। মাধবীনাথ হরিদ্রাগ্রামে আসিলেন, যামিনী সেবা করিতে লাগিল। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ভ্রমর মরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল—ফাল্গুনী পূর্ণিমা যেন পার না হয়। ছয় বৎসর পরে ভ্রমর আবার হাসিতামাসা আরম্ভ করিল। ভ্রমর ক্রমশঃ প্রফুল্ল ও হাস্যময়ী হইল। অবশেষে শেষ দিন উপস্থিত হইল। ভ্রমর যামিনীকে জানালা খুলিয়া দিতে বলিল, সাত বৎসর পরে ভ্রমর ও গোবিন্দলাল যে জানালায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেন সেই জানালা খোলা হইল। বিছানায় রাশি রাশি ফুল ছড়াইয়া দেওয়া হইল। ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'একদিন বড় স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আবার একদিন দেখা হইবে কিন্তু দেখা হইল না।' একবার দেখা হইলে একদিনে সাত বৎসরের দুঃখ ভুলিতাম।

যামিনী জানাইল গোবিন্দলাল ভ্রমরকে দেখিতে বাড়ী আসিয়াছেন। ভ্রমর কাঁদিয়া একবার গোবিন্দলালকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। যামিনী উঠিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে নিঃশব্দে গোবিন্দলাল নিজ শয্যাগৃহে দীর্ঘ সাত বৎসর পরে প্রবেশ করিলেন। উভয়েই কাঁদিতে লাগিলেন। ভ্রমরের ইঙ্গিতে গোবিন্দলাল নিকটে আসিলেন, ভ্রমর স্বামীর চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পদরেণু মাথায় লইয়া সকল অপরাধের মার্জনা চাহিল এবং জন্মান্তরে সুখী হইবার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিল। গোবিন্দলালের হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া ভ্রমর নিঃশব্দে প্রাণত্যাগ করিল।

ভ্রমর তত স্থির, প্রফুল্ল, হাস্যমূর্তি—একটা আভ্যন্তরিক শক্তিতে ভ্রমরের দুঃখ-যন্ত্রণা-বোধ কমিয়া আসিতে লাগিল। জীবনে যত অশান্তি পাইয়াছে, যত বেদনা বোধ করিয়াছে, অন্তিমকাল যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল সে অশান্তি ও বেদনা ততই কম বোধ হইতে লাগিল। শরীর ও মনের নিস্তেজ অবস্থায় অনুভব করিবার শক্তির প্রখরতা কমিয়া যায়, কিন্তু ভ্রমরের এই শক্তি আসিয়াছে তাহার শুচিশুভ্র অন্তরজীবনের নির্মলতা হইতে।

আজি আমার ফুলশয্যা—মনে হয় শেষ দিনে অন্তরের আনন্দে ভ্রমর তাহার বিবাহিত জীবনে প্রথম মিলনকালের অনুরূপ কোন অনুভূতি লাভ করিয়াছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—ভ্রমরের মৃত্যুর পর তাহার যথারীতি সৎকার করিয়া আসিয়া গোবিন্দলাল গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া কাহারও সহিত কথা বলিলেন না। গোবিন্দলাল রোহিণী ও ভ্রমর দুইজন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়াছিলেন। রূপতৃষ্ণায় ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই বুঝিয়াছিলেন রোহিণী কেবল রূপতৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু ভ্রমরের মত হৃদয়ে অমৃতের প্লাবন বহাইতে পারে না। গোবিন্দলাল যদি তখন রোহিণীর যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া ভ্রমরের নিকট আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন তবে সম্ভবতঃ ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিতেন, কিন্তু অহংকার ও লজ্জায় তাহা সম্ভব হইল না। কিন্তু তিনি ভ্রমর-দর্শন লালসায় দিবারাত্রি অন্তর্দাহ অনুভব করিয়াছেন। ভ্রমর ও রোহিণী উভয়েরই মৃত্যুর কারণ স্বয়ং এই কথা ভাবিতে ভাবিতে গোবিন্দলাল অস্থিরচিত্ত হইয়া পুষ্পোদ্যানে আসিলেন। তারপর মধ্যাহ্নে বারুণী পুষ্করিণীর তীরে আসিলেন, পরে পুষ্পোদ্যানে আসিলেন। উদ্যান নষ্ট হইয়া গিয়াছে, প্রমোদভবনের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। প্রস্তরমূর্তিগুলিও ভগ্নাবস্থা-প্রাপ্ত। একটা ভগ্ন প্রস্তরমূর্তিতলে গোবিন্দলাল বসিলেন। সূর্যতেজে গোবিন্দলালের মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত দিন এক কথা চিন্তা করিতে করিতে গোবিন্দলালের চক্ষে সমস্ত জগৎ ভ্রমর-রোহিণীময় হইয়া উঠিল। গোবিন্দলাল উন্মাদগ্রস্ত হইয়া উঠিলেন। রোহিণী যেন স্পষ্টকণ্ঠে বলিতেছে—এইখানে বারুণী পুকুরে আমি ডুবিয়াছিলাম। তুমিও প্রায়শ্চিত্ত কর, মর। গোবিন্দলাল ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। রোহিণীর মূর্তি মিলাইয়া গেল—ভ্রমরের দিব্য জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দেখা দিল। ভ্রমর যেন বলিতেছে—মরিবে কেন? গোবিন্দলাল মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরদিন তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। অনেক দিন চিকিৎসার ফলে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। অতঃপর একদিন রাত্রিতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সাত বৎসর অপেক্ষা করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করা হইল।

এ মন্দারঘর্ষণপীড়িত···ধম্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে—এই উপমার সাহায্যে লেখক গোবিন্দলালের রোহিণীর সহিত প্রসাদপুর বাসকালীন জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিতেছেন। গোবিন্দলাল রোহিণীকে পাইয়া রূপতৃষ্ণা নিবারণ করিলেও অন্তরের প্রেমতৃষ্ণা তাহাতে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যথার্থ তৃপ্তি তিনি পান নাই। মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থন করা হয়।

বাসুকির মুখনির্গত বিষজ্বালা ত্রিজগৎ ধ্বংস করিবার উপক্রম করে। রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের আকর্ষণ এইরূপ তীব্র জ্বালাময়। সুধা ও অমৃতের যে শান্তি তাহা এখানে দুর্লভ।

ভ্রমর অন্তরে রোহিণী বাহিরে—রোহিণীর সঙ্গে ইন্দ্রিয়বিলাসের স্রোতে যখন গোবিন্দলাল ভাসমান তখনই গোবিন্দলালের মানসিক অবস্থা এইরূপ—গোবিন্দলালের হৃদয় রোহিণী অধিকার করিতে পারে নাই। ভ্রমরের উক্তিই সত্য হইয়াছে। গোবিন্দলাল ভ্রমরের, রোহিণীর নহে। তবুও মনের বহির্দিক্কুটায় যে রূপতৃষ্ণা ছিল সেখানে রোহিণী গোবিন্দলালের রূপোন্মত্ততাকে পোষণ করিতেছিল মাত্র

গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী—গোবিন্দলাল দিবানিশি বিবেকের তীব্র দংশনজ্বালা অনুভব করিয়াছেন। রোহিণীকে পাইয়াও অতৃপ্তিতে গোবিন্দলাল জ্বলিয়াছেন। তবুও তিনি রোহিণীকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা উদ্গীরণ করিবার কোন উপায় ছিল না। বিবে যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়া ব্যতীত তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু ভ্রমর ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সহায়তায় গোবিন্দলালের বিরহের দুঃখ শেষ পর্যন্ত একটা আভ্যন্তরিক শান্তিতে পরিণত করিয়াছেন।

শোকার্ত, উদ্‌ভ্রান্ত গোবিন্দলাল রোহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহার নির্দেশ অনুসারে বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবিতে যাইতেছিল। জ্যোতির্ময়ী ভ্রমরমূর্তি তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে নিষেধ করিয়া ভগবৎপাদপদ্মে মনপ্রাণ সমর্পণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। পূর্ববর্তী সংস্করণে গোবিন্দলালের আত্মহত্যায় গ্রন্থের সমাপ্তি হইয়াছিল; পরবর্তী সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র এই অংশটি পরিবর্তন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, গোবিন্দলালের এইভাবে মৃত্যুতে রোহিণীর বিজয়ই সূচিত হইত। ভ্রমরের নির্দেশ-পালনের মধ্য দিয়া গোবিন্দলালের জীবনে ভ্রমরের প্রভাবই শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে আত্মহত্যার শোচনীয় পরিণাম হইতে রক্ষা করিল, এই কথাই প্রমাণিত হইতেছে। গল্পের শেষাংশের এই পরিবর্তনটি প্রণিধানযোগ্য।